চাষীভাই

শীত সংখ্যা-১৪২০

ত্রয়োদশ বর্ষ , ৪৭তম সংখ্যা , ২৪-তম আন্তর্জাল সংখ্যা

সম্পাদকের বিপদ

সম্পাদকের অনেক শত্রুপক্ষ হয়। কে যেন জয়ঢাকের বুড়ো সম্পাদককে এই শাসাণি দেয়া ছড়াখানা দপ্তরে রেখে গেছে সেদিন চুপিচুপি। সেই থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। ভাবসাব দেখে তো মনে হচ্ছে **অমিতাভ প্রামাণিক** নামে সেই ভয়ানক লোকটার কাজ। তোমরা একবার দেখো দেখি!

জানিস কী হয়েছিল দেব্‌জ্যোতি ভট্টর?
উগ্রপন্থী এক ভয়ানক কট্টর
হঠাৎ বাগিয়ে ছুরি
বলল, "মশলামুড়ি
একা খাস? ভেঙে দেব মট করে ঘার তোর।"

শুনে ভয়ে দেবজ্যোতি থরহরি কম্প
তিনপোয়া দুধ খেতো আজ খেল কম পো।
বসে চিলেকোঠা ঘরে
গুগলে রিসার্চ করে
দরজা বন্ধ করে জ্বালিয়ে সে লম্পো

সেই শুনে বন্ধুরা ছুটে এলো বাড়িতে
বাসি মুখে, খালি গায়ে এত তাড়াতাড়িতে
আঙুলে পেস্ট লাগিয়ে
মুখটুখ ধুয়ে নিয়ে
ফ্রেশ হল, খিচুরিও চড়ে গেল হাঁড়িতে

শুরু হল ডাকাডাকি, "দেবজ্যোতি, দেবু ভাই
দরজাটা খোল বাবা, চা খাবি তো? নিচে আয়।
দ্যাখ বন্ধুরা তোর
এসে গেছে ভোর ভোর
ট্রেন মিস হয়ে গেলে অফিস হবে কামাই।"

পনের মিনিট ধরে ডেকে কন্টিনিউয়াস
ফল হল; দেবজ্যোতি চেঞ্জ করে বেশবাস
নেমে যা একটা দিলো!
"ওটা তো স্বপ্ন ছিলো!"
ট্রেন সেই মিস- ই হল, অগত্যা মিনিবাস

কাকু বলে, "তোর নাকি এত বেশি ভয়? ডাক
পিসিমাকে; ব্যস্ত কী? ডাকাডাকি নয় থাক।
তারচে' চাকদা গিয়ে
ভোঁতা কলম বাগিয়ে
পদ্যটদ্য লিখে ভরিয়ে দে জয়ঢাক।"

ছবিঃমৌসুমী

সূচিপত্র

জয়ঢাক ৪৭তম সংখ্যা, ২৪তম ইন্টারনেট সংখ্যাঃ (নির্দিষ্ট পাতায় যাবার জন্য আর্টিকলের নামের ওপর ক্লিক করুন।)

	বিষয়	লেখা		লেখক	ছবি/গ্রাফিক্স
১	জয়ঢাকের দলবল				ইন্দ্রশেখর
২	আমাদের কথা				ইন্দ্রশেখর
৩	সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল			
৪	কমিক্স				মৌসুমী
৫	গল্প	ক	ফ্ল্যাট নম্বর ৩০৪	অদিতি ভট্টাচার্য	সোমা চক্রবর্তী
		খ)	বিজয়ী	অর্ণব মন্ডল	অন্তরা চক্রবর্তী
		গ)	লস অ্যামিগোস শহরের কান্ড	আর্থার কোনান ডয়েল(অনুঃঅমিত দেবনাথ)	শিমূল সরকার
		ঘ)	তোমরাও ভালো থেকো	দীপক দাস	সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
		ঙ)	পটলের দুঃখ	জামাল ভর	সৌভিক
		চ)	পিঁপড়ের নাম টুকুস	রতনতনু ঘাটী	অর্ণব
		ছ)	গিরগিটি	সৈকত মুখোপাধ্যায়	পার্থ দাশ
		জ	আইসক্রিমওয়ালা	শিশির বিশ্বাস	শিবশংকর ভট্টাচার্য
৬	ভ্রমণ	পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো		ইন্দ্রনাথ	ইন্দ্রশেখর
৭	ভূতের আড্ডা	ক	ভূতুড়ে বাড়ি- ন্যাশনাল লাইব্রেরি	পিকলু	সংগৃহীত
		খ	ভূতের গল্প- শলকেনের ছবি	মহাশ্বেতা	ইন্দ্রশেখর
		গ	দেশবিদেশের ভূতেরা- শাঁকচুন্নি আরহোয়াইট লেডি	টুপুর	সংগৃহীত
৮	বিচিত্র দুনিয়া	মোবাইল ফোন- জানা অজানা কথা		অরিন্দম দেবনাথ	লেখক
৯	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	(ক)	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		(খ)	প্রতিবেশী গাছ- আমড়া	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়	সংগৃহীত
		(গ)	বিচিত্র জীবজগত –টারডিগ্রেড	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		(ঘ)	পাখির জগত- পাখির খোরাক,পর্ব ২	সৈকত মুখোপাধ্যায়	সংগৃহীত
		(ঙ)	চেনা পাখির অচেনা পরিচয়	কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগৃহীত
		(চ)	টেকনো টুকটাক- চ্যানেল টানেল	কিশোর ঘোষাল	সংগৃহীত
		(ছ)	মাথে মে ট্রিকস- অংক নিয়ে মজা	সূর্যনাথ ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
		(জ)	ভারতের বৈজ্ঞানিকঃ হংসদেব	সংহিতা	সংগৃহীত

১০	বনের ডায়েরি	(ক)	ভারতের বনাঞ্চল- আন্দামান ও নিকোবরের জীববৈচিত্র্য	সংহিতা	সংগৃহীত
		(খ)	চেন্দরু আর টেবু	স্বপ্না লাহিড়ি	সংগৃহীত
		(গ)	দন্ডকবনে বাঘ দর্শন	তাপসকিরণ রায়	অনুপম
১১		(ক)	যদি বন্ধু হতে চাও	অচিন্ত্য সুরাল	অরিঘ্ন
		(খ)	গুল	অমিতাভ প্রামাণিক	সৌভিক
		(গ)	পুরনো সেই দিনের কথা	আশুতোষ ভট্টাচার্য	ইন্দ্রশেখর
		(ঘ)	বিজ্ঞানী	প্রকল্প ভট্টাচার্য	ইন্দ্রশেখর
		(ঙ)	বাঘ আসত আমার বাড়ি	রতনতনু ঘাটী	অর্ণব
		(চ)	শীত	আবু হোসেন	অন্তরা
		(ছ)	রজব আলি	সৌম্যকান্তি জানা	অরিঘ্ন
		(জ)	দিদার বাংলা	তাপস মৌলিক	ইন্দ্রশেখর
		(ঝ)	ডিগরিডাঙার ফকিরবাবা	তরুণ সরখেল	সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
১২		(ক)	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(খ)	শব্দখেলা		
		(গ)	জানো কি		
		(ঘ)	কুইজ		
		(ঙ)	মজার ইন্টারনেট		
		(চ)	কীসের ফটো		
		(ছ)	ড্রুড্‌ল		
		(জ)	অবিশ্বাস্য		
			আশ্চর্য উলকি		
			গত সংখ্যার উত্তর		
১৩	ধারাবাহিক উপন্যাস	(ক)	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস	মৌসুমী, ইন্দ্রশেখর
		(খ)	পঞ্চা নামে ভালুকটি	চিত্ত ঘোষাল	মৌসুমী
১৪	কাতুকুতু		শার্লক হোমস	ডঃ রসিকলাল দাস	
১৫	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	(ক)	অজানা শিল্পীর ছবি	ইন্দ্রশেখর	অজানা
		(খ)	দুর্গাপুজোর অ্যালবাম	--	অহনা
		(গ)	নিলাদ্রী আর প্রান্তিকের ছবি	--	নিলাদ্রি ও প্রান্তিক
১৬	পুরাণ কথা		খান্ডবদাহ দ্বিতীয় পর্ব	সংহিতা	শিমুল
১৭	জাপানের গল্প		কাজুমার প্রতিশোধ (প্রথম পর্ব)	বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ড (অনুঃ সংহিতা)	সংগৃহীত
১৮	রাশিয়ান সাহিত্য		জাদু চশমা(কমিকস)	দায়াফিল্ম স্টুডিও।	ত.ইস্ত্রাতিয়েভা

		ল্যুকস আমার ল্যুক্স	অজানা	সংগৃহীত
১৯	পুরাতনী	ধূসর চাঁদ	দিলীপ রায়চৌধুরী	দীপংকর
২০	স্মরণীয় যাঁরা	পচাব্দী গাজি	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
২১	সুরঢাক	এসো গান শুনি	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	লেখক
২২	টাইম মেশিন	ভারতভ্রমণ — দীন মহম্মদ (অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়)		ইন্দ্রশেখর
		ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী	মৌসুমী
২৩	বই পড়া	জাদুমাছের গল্প	মহাশ্বেতা	মূল প্রচ্ছদ
২৪	লোককথা	বাবা আর ছেলে	মহাশ্বেতা	মৌসুমী
২৫	বিশ্বের জানালা	নাউরু দ্বীপের কথা	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
২৬	সেই মেয়েরা	নিশিডাকিনী	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
২৭	আমার শহর	ফেলে আসা কলকাতা	সুজয় রায়	সংগৃহীত
২৮	জয়ঢাকের কিচেন	ঋকবাবুর রান্নাখেলা	তনুশ্রী মুস্তাফি	লেখক
২৯	দেশ ও মানুষ	কিষাণী লীলাবাই কথা	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
৩০	সিনেমা হল	স্পিরিটেড অ্যাওয়ে	মহাশ্বেতা	সংগৃহীত

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী

উমাদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা

সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, ভারতের বনাঞ্চল, পুরাণ কথা, জাপানের গল্প

মহাশ্বেতা

বইপড়া, লোককথা, সিনেমা হল

তুলিতে, মাউসে, কি বোর্ডে, ক্যামেরায়

শিবশংকর ভট্টাচার্য

পিকলু

মৌসুমী

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে,তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

মহুল

অনুপম

অন্তরা

মুকুট

অরিঘ্ন

অর্ণব

দীপংকর

সুস্মিতা

সৌভিক

অদিতি

শিমুল

সোমা

আমাদের কথা

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন, আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

এ ছাড়াও ভবিষ্যতের সম্পাদক গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে নানা বয়সের সহসম্পাদকের একটি দল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বড়ো আর মাঝারিদের সস্নেহ প্রশ্রয়ের ছায়ায় বেড়ে উঠবে আগামিদিনের নবপ্রজন্মের পত্রিকা সম্পাদকের দল, এই আমাদের আশা।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য:

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:)

সহ-সম্পাদকমণ্ডলী: উমা, সংহিতা, মহাশ্বেতা, মহুল

অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়

আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুদুস।

ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, C/O দেবজ্যোতি। BH-159(গ্রাউন্ড ফ্লোর), সেক্টর-২, সল্ট লেক কলকাতা-৯১

মেইল যোগাযোগ: joydhak@gmail.com

জয়ঢাকি বোল

ওরা নতুন দিনের দিশারী

http://www.joydhak.com/joydhak/Article/20/desh.html

ওরা দলে আছে আটজন , স্কুল বা কলেজে পড়ার সময় থেকে বন্ধুত্ব ওদের। ওদের ইচ্ছা নিজেদের উন্নতির সাথে সমাজের দুঃস্থ ,অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করা। ওরা আমার ছেলেমেয়েরই বয়সী বা কিছুটা ছোট। ওদের মধ্যে ছজন বিভিন্ন জায়গায় থাকে গবেষণার জন্য। দুজন চাকরি করে। শুভ্রদীপ মিস্ত্রি রসায়ণশাস্ত্রের গবেষণা করে ব্যাঙ্গালোর আই আই এস সি তে, প্রীতম মন্ডল আর ভাস্বতী সেনগুপ্ত একই বিষয়ে গবেষণা করছে কানপুর আই আই টিতে, অরিত্র রায় পুণেতে চাকরি করে, আর এদের সঙ্গী মুর্শিদাবাদের প্রিয়দর্শিনী কর্মকার। এরা পাঁচজন এসেছিল মহাঅষ্টমীর দিন আমার শহর নৈহাটিতে। গরিফা রামঘাটের ঘাটের কাছে, হুগলি আর নৈহাটির সেতুবন্ধ শতাব্দি- প্রাচীন জুবিলি ব্রিজের নিচেই গঙ্গার তীরের চড়ায় অবস্থিত

জীর্ণদেহ বৃদ্ধাবাসটিতে এসেছিল ওরা, সেখানের আবাসিকদের দেখতে, তাদের কথা জানতে, আর এই বৃদ্ধাবাসের একমাত্র সৈনিক সুশান্তর সাথে দেখা করতে ।

সুশান্ত পাড়ুইয়ের কথা আমি লিখেছিলাম কয়েক সংখ্যা আগে জয়ঢাকের পাতায়। সে লেখার লিংক পাবে এই পাতার ওপরের দিকে। সুশান্ত একা নানাজনের কাছে সাহায্য নিয়ে, আর নিজের পরিশ্রমে চালাচ্ছে এই বৃদ্ধাবাসটি। ঝাঁ চকচকে কোনও বাড়ি নেই, নেই বিশেষ কিছু ভালমন্দ খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা, তবুও সারা বছরই ২৪ বা ২৫ জন মানুষ এখানেই খেয়েপরে বেঁচে আছে, আর মাথার উপর পেয়েছে একটুখানি ছাদ। হোকনা টালির ছাদ, তবু তো রাস্তায় থাকতে হয়না। দুবেলা সময়মত খাবার পায়, সকালে উঠেই আরামের চা টুকু পায় বিনা অশ্রদ্ধায়, সঙ্গে দুটি বিস্কুট। আর দুপুর আর রাতে পায় টাটকা ঘরে তৈরি খাবার। সে খাওয়ার বাহুল্য না থাকলেও তৃপ্তি আছে। সাদরে নিজে হাতে তৈরি খাবার সময়মত সকলকে পৌছে দেয় সুশান্ত। যে নিজে তুলে খেতে পারেনা তাকে নিজে হাতে খাইয়ে দেয়। অসুস্থ কেউ কাপড় নোংরা করে ফেললে সেটাও সুশান্ত নিজে হাতে কাচে। কারণ লোক রাখার মত টাকা পয়সা তো নেই তার। আবাসিকরা বলেন, “ভালো আছি আমরা আমাদের সুশান্তর আশ্রয়ে। খাবার কম দেবেনা আর কেউ অত্যাচারও করবেনা। নাম কেনার ইচ্ছা নেই সুশান্তর। তার ইচ্ছা শুধু এই অসহায় মানুষগুলোর সেবা করা।

এই নতুন ছেলেমেয়েরা সুশান্তর প্রয়াসকে যে গুরুত্ব দিয়ে বুঝেছিল আমার লেখাটা পড়ে, তা বোঝা গেল তাদের এই ছুটে আসা দেখে। ওরা প্রথমে জয়ঢাক পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখান থেকে আমার ঠিকানা নিয়ে তারা এখানে আসার দিন ঠিক করে অষ্টমী পুজোর দিন।

সেদিন সবাই যখন পুজো মন্ডপে মজা করছিল, ওরা তখন ঘুরে ঘুরে আশ্রমটিকে দেখছিল আমার সঙ্গে। আবাসিকদের সাথে কথা বলছিল, কথা বলছিল সুশান্তর সাথে। জেনে নিচ্ছিল অভাব অভিযোগ আর দিন গুজরাণের নানা কথা।

তারপর, যাবার আগে তাদের স্টাইপেন্ড থেকে জমানো কিছু অর্থ ,আঠারো হাজার টাকার একটি চেক তুলে দিয়ে গেছে তারা সুশান্তর হাতে। নিয়ে গেছে আশ্রমের ব্যাঙ্কের পাশবইয়ের নম্বর, পরে প্রয়োজনে যেন টাকা পাঠাতে পারে। এখানেই তারা থেমে থাকেনি ভবিষ্যতের জন্য কিছু ভাবতে বলেছে সুশান্তকে। দরকার জানালে তারা পাশে আছে এ আশ্বাসও দিয়ে গেছে যাবার বেলা।

সুশান্তও এর আগেও অনেকের কাছে আবেদন করেছে একটু সহায়তা করবার জন্য। কিন্তু নিজেকে প্রকাশিত আর প্রতিষ্ঠিত করার ইঁদুর দৌড়ে সবাই ব্যস্ত, তারা কেন আসবে এসব কাজে বোকার মত? কেউ সাড়া দেয়নি তেমনভাবে। এমন কি তার নিজের শহরের প্রতিষ্ঠিত মানুষরাও

প্রায় কেউই জানেন না তার এমন ভালো কাজ আর প্রাণপাত লড়াইয়ের কথা। যখন হতাশ হয়ে পড়ছিলা, ঠিক তখনই লেখাটা পড়ে এই সুন্দর মনের মেধাবি ছেলেমেয়েগুলোর এগিয়ে আসা আমাকে খানিকটা আশার আলো দেখিয়েছে। তাই তেষট্টি বছরের প্রবীণা আমি নতুন আশা নিয়ে এই "নতুন দিনের দিশারীদের" অবদানের কথাটুকু সবাইকে না জানিয়ে পারলামনা।

একটা কথা লেখা হয়নি ,যারা এই টিমের সদস্য কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য সেদিন আসতে পারেনি তাদের নামগুলি জানানো। তারা হল অর্ঘ্য দেব- বম্বে আই আই টি তে পি এইচ ডি করছে, রীতা দাস মহাপাত্র আই আই টি খড়গপুরে রিসার্চ করছে, পৃথ্বীশ চাকরিরত, আর আছে দেবলীনা বোস দমদম আদিত্য অ্যাকাডেমির শিক্ষিকা। আশা রাখি এরকমই আরও অনেক নতুনরা এগিয়ে আসবে সমাজসেবার সরল বাসনা নিয়ে, নাম ,যশ ইত্যাদি প্রাপ্তি যাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়।

কেমন লাগলো তোমাদের বল। এবারের জয়ঢাকের বোলে শুধুই শুভ্রদীপ, প্রীতম, ভাস্বতী,অরিত্র,প্রিয়দর্শিনী, অর্ঘ্য, রীতা, পৃথ্বীশ, দেবলীনাদের নাম। ভারি ভালো একখানা কাজ করে দেখিয়েছে এই বন্ধুরা। কাজের মত কাজ। ক্লাশে ফার্স্ট হওয়া কিংবা জয়েন্টে চান্স পেয়ে ফেলবার চেয়েও অনেক অ- নেক বড় মাপের কাজ। তোমরাও সবাই এমন কিছু করে দেখাও দেখি! ভালো থেকো এই শীতে। আর , পারো যদি , যতটুকু সাধ্য কোন দুঃখী মানুষের দুঃখ ঘুচিও সে যাওদি তোমার হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে পাঁচটা টাকা দিয়েও হয় তো তাই সই।

এই সংখ্যার জয়ঢাকি বোল লিখেছেন তোমাদের উমা দিদি।

ভালোবাসায়,

তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা

অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দাদের অ্যাবরিজিনালস বা আদিবাসী বলা হয়। প্রকৃতি ও আশ্চর্য জীবজন্তু, পোকামাকড়ের সঙ্গে মিলেমিশে তারা বেঁচে থাকে। তাই তাদের সব লোককথাতেই প্রকৃতি আর সেইসব প্রকৃতির সন্তানদের কথা থাকে। এবারের গল্পটা হল--

অনেক দিন আগে মস্ত এক দিঘীর ধারে সিলাগুরুন নামে এক জলোর ইঁদুর থাকত।

আর দিঘীর জলে সাঁতরে বেড়াত দারু নামে এক সুন্দরী হাঁস।

দারুকে দেখে সিলাগুরুন তো একেবারে কাত!

একদিন সিলাগুরুন করল কি, জলের তলা থেকে দারুর পাখনা ধরে টেনে নিয়ে গেল তার গর্তে।

তাকে যত্নআত্তি করে লুকিয়ে রাখল নিজের বাসায়। খাবার এনে খাওয়ালো, বিপদের হাত থেকে বাঁচালো আর দুজনেই দুজনকে বেজায় ভালোবেসে ফেললে--

অনেকদিন পরে সিলোগুরুন ও দারুর ছেলে হল। তার নাকটা হল মায়ের মতন চ্যাপ্টা, পায়ের পাতা জোড়া আর চ্যাটালো-

আর বাবার মতন লোমকুচকুচে গা আর মোটকা লেজ।

সেই ছেলের বংশধরদের আজও তুমি অস্ট্রেলিয়ার নদীতে, খাঁড়িতে দেখতে পাবে। তাদের বলা হয় প্ল্যাটিপাস।

প্ল্যাটিপাসেরা এখনো বিপদে পড়লে তাদের পুচ্ছ নাড়িয়ে সংকেত দেয়।

ফ্ল্যাট নম্বর ৩০৪

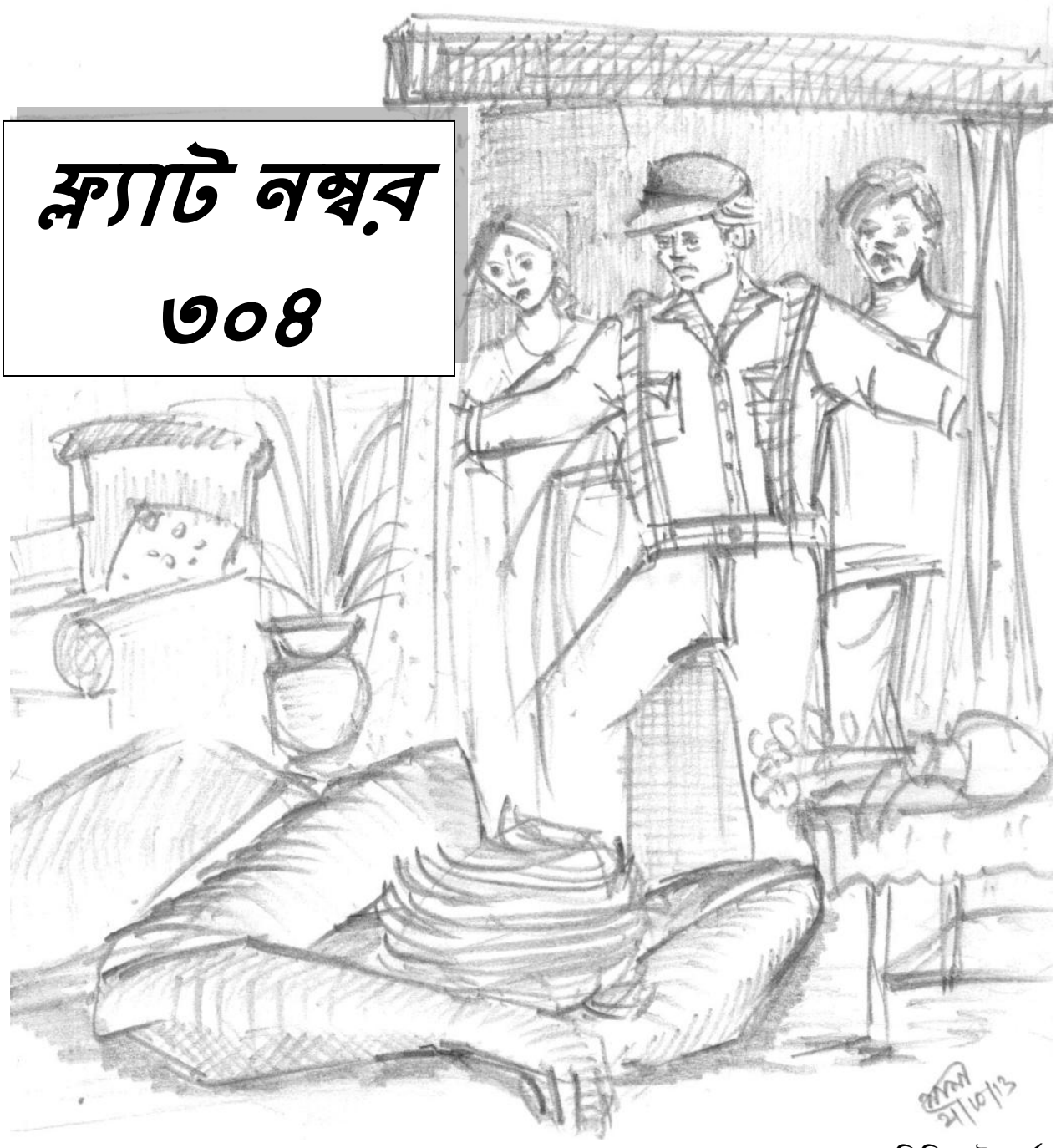

অদিতি ভট্টাচার্য্য

বিকেল চারটে। গরম কাল। গলফ গ্রিনের পুর্বাশা কমপ্লেক্স নিস্তব্ধ। কোনো কোনো ফ্ল্যাট থেকে শুধু হালকা টিভির আওয়াজ ভেসে আসছে। কমপ্লেক্সের ৩০৮ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে বছর

ষাটের নমিতা দে বেরিয়ে ৩০১ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে রওনা দিলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি চমকে উঠলেন, "এ কী? করিডোরে রক্ত কেন? রক্ত কোথা থেকে এল?"

লক্ষ্য করে দেখলেন ৩০৪ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজার তলা দিয়ে রক্তের একটা ধারা বেরিয়ে করিডোরে এসেছে। তিনি তাড়াতাড়ি দরজার সামনে গিয়ে ধাক্কা দিলেন, "কে আছ ভেতরে, দরজা খোলো, দরজা খোলো, সৌম্য, সৌম্য তুমি কি ভেতরে আছ?"

কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কিতেও কেউ খুলল না। নমিতা দ্রুত পায়ে তাঁর ফ্ল্যাটের দিকে গেলেন তাঁর স্বামীকে ডাকতে। ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো ছিল, নমিতা রূদ্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকে বললেন, "শোনো, সৌম্যর ফ্ল্যাটের দরজার তলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে করিডোরে এসেছে। আমি কত দরজা ধাক্কালাম, সৌম্যকে ডাকলাম, কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।"

প্রশান্তবাবু সোফায় বসে ম্যাগাজিন পড়ছিলেন, সব শুনে তিনি প্রথমেই একতলায় সিকিউরিটিকে ফোন করলেন। তারপর নমিতাকে বললেন, "চলো বাইরে গিয়ে অন্য সবাইকে ডাকি।"

"কিন্তু এখন তো বেশির ভাগ ফ্ল্যাটেই কেউ নেই। সবাই অফিসে, স্কুল, কলেজে," নমিতা বললেন।

ইতিমধ্যে নমিতার দরজা ধাক্কাধাক্কিতে ৩০৪ নম্বরের ঠিক উলটো দিকের ফ্ল্যাট থেকে বৃদ্ধ দামোদর পারেখ বেরিয়ে এসেছেন, তিনিও করিডোরে রক্ত দেখতে পেয়েছেন। নমিতারা ৩০৪ নম্বরের সামনে পৌঁছতে পৌঁছতে সিকিউরিটি গার্ড মদনও পৌঁছে গেল।

"দুপুর বেলাতেই তো দেখলাম দুজনকে নিয়ে লিফটের দিকে যেতে," মদন বলল।

"দুপুর বেলা দেখেছো তুমি সৌম্যকে? তার মানে আজ বাড়িতে আছে," প্রশান্ত বললেন।

এর মধ্যে মদন আবার দরজা ধাক্কাতে আরম্ভ করেছিল। যথারীতি কেউ খুলল না।

"পুলিশে খবর দিন। পুলিশ দরজা ভেঙে ঢুকুক। আমার ভালো লাগছে না। আজকাল কতো কিছুই তো ঘটে," দামোদর বললেন।

দেখা গেল সবারই তাই মত। ইতিমধ্যে দরজায় ধাক্কার আওয়াজ আর চেঁচামেচিতে আরো দু একজন বেরিয়ে এসেছে।

থানায় খবর দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইনস্পেক্টর শোভন বিশ্বাস তাঁর দলবল নিয়ে চলে এলেন। দরজার লক ভাঙা হল, দেখা গেল দরজা থেকে একটু দূরে লিভিং রুমের মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন পাজামা- পাঞ্জাবি পরা একজন লোক। ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, ঘরের সমস্ত জিনিস তছনছ করা হয়েছে।

"সবাই বাইরে যান। কেউ কোনো জিনিসে হাত দেবেন না," ইনস্পেক্টর বিশ্বাস সবাইকে সরিয়ে দিলেন।

তিনি আর একজন কনস্টেবল মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটির কাছে গেলেন, তার ডান হাত মেঝেতে প্রসারিত। হাতের তালু, আঙুল রক্তে মাখা।

"সৌম্যদীপ বলেই মনে হচ্ছে। দেখি আস্তে আস্তে সোজা করো।"

দুজনে মিলে তাকে সোজা করলেন। "হ্যাঁ সৌম্যদীপই," ইনস্পেক্টর বিশ্বাস নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে, পালস দেখে বললেন, "না ডেড। নিজের ফ্ল্যাটেই খুন হয়ে গেল! ঘরও তো দেখছি তছনছ করেছে। যাও তোমরা দেখো ভেতরের ঘরের কি অবস্থা। আমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা বলি।"

"শুনুন,সৌম্যদীপকে কেউ গুলি করে খুন করেছে, গুলি সোজা বুকে লেগেছে," তিনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সবার উদ্দেশ্যে বললেন।

"কি বলছেন কি? ফ্ল্যাটে ঢুকে গুলি করে গেছে?" দুপুর বেলাই হল এইসব?" স্তম্ভিত প্রশান্ত প্রশ্ন করলেন।

"ঠিক কখন হয়েছে সেটা ডাক্তার বলতে পারবে। আমাদের ডাক্তার এসে পড়লেন বলে। আমি ফোন করে দিয়েছি। দরকার হলে ফরেনসিক টিমও আসবে। আচ্ছা আপনিই তো থানায় ফোন করেছিলেন? ঠিক কী হয়েছিল? আপনি ঠিক কী দেখেছিলেন?"

প্রশান্ত প্রথম থেকে সব বললেন। শুনে ইনস্পেক্টর বিশ্বাস মদনকে ডাকলেন, "আজ কেউ এসেছিল সৌম্যর সঙ্গে দেখা করতে?"

"হ্যাঁ স্যার, দুজন এসেছিল। আজ দুপুরে সৌম্য স্যার নিচে নেমেছিলেন। উনি মাঝেমাঝেই সামনের দোকানে সিগারেট কিনতে যেতেন। তার কিছুক্ষণ বাদে দেড়টা নাগাদ, হ্যাঁ আমি তখন খাচ্ছিলাম, তখন উনি দুজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লিফটে উঠে গেলেন।"

"দু'জন এসেছিল? তাদের নাম লেখো নি খাতায়?"

"না স্যার, সৌম্য স্যার তো নিজেই ওদের নিয়ে গেলেন, তাই আমি আর..... . " মদন আমতা আমতা করতে থাকে।

"কীরকম দেখতে দুজনকে?" ইনস্পেক্টর বিশ্বাস মদনকে জেরা করতে লাগলেন।

"একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। বয়স্ক," বলল মদন।

"দেখতে কীরকম? লম্বা? বেঁটে? রোগা? মোটা? দেখে কি মনে হয়েছিল স্বামী স্ত্রী?"

"না মানে আমি তো তখন খাচ্ছিলাম, তাই কিছু লক্ষ্য করি নি।"

"কিছুই লক্ষ্য করো নি? তা কী করে হয়? কিছু তো দেখেছো। কি জামা কাপড় পরেছিল ওরা?"

"জামা কাপড়.....জামা কাপড়," মদন মনে করার চেষ্টা করে, "হ্যাঁ স্যার মনে পড়েছে, লোকটা প্যান্টশার্ট পড়েছিল। কালো প্যান্ট। আর মহিলা হলুদ শাড়ি।"

"বাঃ চমৎকার! অনেক কিছু মনে করে রেখেছ। কালো প্যান্ট আর হলুদ শাড়ি, হুঁ। হাতে কিছু ছিল ওদের? ব্যাগ? স্যুটকেস?"

"লোকটার হাতে একটা ব্যাগ ছিল বলে মনে হচ্ছে।"

"রাবিশ! কিছুই খেয়াল করো না। আচ্ছা ওরা গেল কখন?"

"ওদের যেতে তো দেখি নি। আসলে আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে গেছিলাম, হয়তো তখন চলে গেছে।"

"খুব ভালো করেছো। যাও, এখন যাও। এবার থেকে খাতায় নাম না লিখে কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না, বুঝেছো? যাও।"

মদন চলে গেল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্যান্য ফ্ল্যাটের যারা স্কুল, কলেজ, অফিসে বেরিয়েছিল তারা একে একে ফিরতে শুরু করেছে।

ইনস্পেক্টর বিশ্বাস আবার কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা সৌম্য সম্পর্কে কে কী জানেন? কেমন ছেলে ছিল? মিশত অন্যান্যদের সঙ্গে? কাদের যাতায়াত ছিল ওর ফ্ল্যাটে?"

"সৌম্য ছেলে ভালোই ছিল, বয়সও তো কম, ছাব্বিশ সাতাশ হবে," প্রশান্ত বললেন, "সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছে বলতো। ওই সব সংক্রান্তই ওর নিজস্ব কোনো ব্যবসা ছিল, টালিগঞ্জে অফিস, একবার বলেছিল। সবার সঙ্গে ভালোভাবেই মিশত। তবে ওর ফ্ল্যাটে বিশেষ কাউকে আসতে যেতে দেখিনি, বেশির ভাগ সময় ও বাইরেই থাকত।"

"আচ্ছা ওর বাবা, মা, ভাই, বোন কেউ আছে?" ইনস্পেক্টর বিশ্বাসের প্রশ্ন।

"সৌম্য তো বলতো বেলঘরিয়ায় ওদের বাড়ি। সেখানে ওর বাবা, মা, দাদা, বৌদি আর ভাইঝি থাকে," নমিতা উত্তর দিলেন।

"ঠিক আছে, ওর মোবাইল থেকে বার করা যায় কি না দেখছি।"

ইতিমধ্যে পুলিশের ডাক্তার এসে গেলেন। ইনস্পেক্টর বিশ্বাস তাঁকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন, "দুপুর দুটো থেকে তিনটের মধ্যে মারা গেছে বলে মনে হচ্ছে, বাকি ডিটেলস্ পোস্টমর্টেম করলে জানা যাবে।"

ডাক্তার যখন পরীক্ষা করার জন্যে সৌম্যর মৃতদেহ নাড়াচাড়া করছিলেন, তখন ইনস্পেক্টর বিশ্বাসের নজর গেল মেঝের একটা অংশে যেখানে সৌম্যর ডান হাতের তালু ছিল।

"আরে এ তো কিছু লেখার চেষ্টা করেছিল বলে মনে হচ্ছে। দেখুন ডঃ নাথ, এখানটা দেখুন। রক্ত দিয়ে কিছু লিখতে চেয়েছিল," ইনস্পেক্টর বিশ্বাস ডঃ নাথকে দেখালেন।

দেখা গেল মেঝেতে রক্ত দিয়ে কিছু লেখা রয়েছে। তার মধ্যে D এবং O পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে। কিন্তু তারপর কী লিখতে চেয়েছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে না, শুধু একটা ছোট সোজা লাইন। পুরো ব্যাপারটা এরকম " – DO"

"সৌম্যই কিছু লিখতে চেয়েছিল, O এর পরে আর লিখতে পারে নি। কী লিখতে চেয়েছিল?" ইনস্পেক্টর বিশ্বাস ভাবতে লাগলেন।

"আপনারা তো লক ভেঙে ঢুকেছেন দেখছি। দরজা লকড্ ছিল?" ডঃ নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"ডোর নব লক লাগানো ছিল। বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে," ইনস্পেক্টর বিশ্বাস বললেন।

এই সময় একজন কনস্টেবল এসে জানাল যে বেডরুমেরও একই অবস্থা, সারা ঘর লণ্ডভণ্ড। কিন্তু খানাতল্লাশিতে কোথাও কোনও সূত্র পাওয়া যায় নি। ইনস্পেক্টর বিশ্বাস উঠে ভেতরে গেলেন, দেখলেন কিচেন, ডাইনিং স্পেস, বেডরুম সব তছনছ করা হয়েছে, আলমারি থেকে জামাকাপড় সব বের করে দেখেছে।

"কিছু খুঁজতে এসেছিল, বিছানার তোশক অবধি উলটে ফেলেছে। খুনও খুব সম্ভব তার জন্যেই হয়েছে। তা নইলে গলার হার, আঙুলের আংটি নিয়ে যেত," সব দেখে শুনে ইনস্পেক্টর বিশ্বাস মন্তব্য করলেন।

ঠিক তখনই লিভিং রুমের সোফার ওপর পড়ে থাকা মোবাইলটা বেজে উঠল। ইনস্পেক্টর বিশ্বাস তাড়াতাড়ি এসে ফোনটা হাতে নিলেন। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে কোনো রাহুলের নাম।

"হ্যালো ইনস্পেক্টর বিশ্বাস স্পিকিং। সৌম্যদীপ পাঠক আজ তাঁর ফ্ল্যাটে দুপুরে খুন হয়েছেন। কেউ ফ্ল্যাটে ঢুকে গুলি করেছে। আপনি কে? সৌম্যকে ফোন করেছেন কেন?"

জবাবে ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসা কথাগুলো মনযোগ দিয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ফের বললেন, "ও আই সি। ঠিক আছে আপনি টালিগঞ্জ থানায় চলে আসুন। আমার জন্যে অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে," ইনস্পেক্টর বিশ্বাস ফোন ছেড়ে দিলেন।

তিনি আবার ফ্ল্যাটের বাইরে এসে প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "ফ্ল্যাটটা কি সৌম্যর নিজের না ভাড়া থাকত?"

"সৌম্য বছর খানেক হল ভাড়া এসেছে," প্রশান্ত জানালেন।

"ফ্ল্যাটের মালিকের নাম, ঠিকানা আপনারা জানেন?"

"হ্যাঁ, ফ্ল্যাটটা উমেশ চৌধুরীর। উনি আর ওনার স্ত্রী এখন মুম্বাইতে ছেলের কাছে থাকেন। আমার কাছে ফোন নম্বর আছে, দিচ্ছি," বললেন প্রশান্ত।

"শুনুন আমি ফ্ল্যাটটা আপাতত সিল করে দিয়ে যাচ্ছি। পরে ফরেনসিক টিম আসবে, আমাদের গোয়েন্দারাও আসতে পারেন। এটা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার বলেই আমার ধারণা," ইনস্পেক্টর বিশ্বাস কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সৌম্য একজন কম্পিউটার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ছিল। বেশ কিছু কোম্পানি নিজেদের কপিউটারের নিরাপত্তার ব্যাপারে ওর পরামর্শ নিত। শুধু তাই নয় হ্যাকিং আটকানো, হ্যাকারদের বা সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা এসব কাজ ও খুব দক্ষতার সঙ্গে করত। শেষ ক'টা কেসে ওর খুব নাম হয়েছিল।"

ইতিমধ্যে প্রশান্ত সৌম্যর ফ্ল্যাটের মালিকের ফোন নম্বর এনে ইনস্পেক্টর বিশ্বাসকে দিলেন। এই সময় তিনজন ভদ্রলোক ৩০৪ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। জানা গেল তাঁরা হলেন সৌম্যর বাবা সুশান্ত পাঠক, সৌম্যর দাদা শুভদীপ পাঠক আর শুভদীপের এক বন্ধু পরাগ। ইনস্পেক্টর বিশ্বাস সৌম্যর মোবাইল থেকে নম্বর খুঁজে বের করে আগেই ফোন করে দিয়েছিলেন। সুশান্ত, শুভদীপকে দেখে বলে দিতে হয় না যে তারা সৌম্যর বাবা আর দাদা, মুখের

মিল এতটাই স্পষ্ট। তাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর ইনস্পেক্টর বিশ্বাস মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।

●

টালিগঞ্জ থানায় রাহুল আর জিয়া এসেছে ইনস্পেক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে।

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের কাছে সৌম্যর কোম্পানি 'হোয়াইট হ্যাটস প্রাইভেট লিমিটেড' এর যে নিজস্ব অফিস আছে সেখানেই এই দুজন কাজ করে। জিয়া সেক্রেটারি আর রাহুল সৌম্যকে কাজে সাহায্য করত। রাহুলের কাছ থেকে জানা গেল যে সৌম্য সাধারণত তার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে

অফিসেই দেখা করত। কিন্তু আজ পরিচিত কেউ দেখা করতে চেয়েছিল তাই সে তার ফ্ল্যাটেই আসতে বলেছিল।

"আচ্ছা রাহুল, সৌম্য এখন কোনও কাজ করছিল কি না বা কোন কোম্পানির কাজ করছিল, সে সব কিছু বলতে পারবে?" ইনস্পেক্টর বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন।

"সৌম্যদা এখন ভিবজিওর পেইন্টস- এর কোনও কাজ করছিল। কিন্তু এই কাজটা সৌম্যদা একাই করত, একাই ওদের অফিসে যেত। ঠিক কী প্রবলেম ছিল বা কাজ কত দূর এগিয়েছিল আমি সেসব কিছুই বলতে পারব না," জানাল রাহুল।

"কেন? তুমি তো সৌম্যকে কাজে হেল্প করতে, তাহলে?"

"এই কাজটা খুব গোপনীয় ছিল, সৌম্যদা একবার বলেছিল।"

"আজ দুপুরে তোমরা কোথায় ছিলে?"

"আমরা সারাদিনই অফিসে ছিলাম। সৌম্যদা সকালে অফিসে এসেছিল, তারপরে ভিবজিওরের অফিসে যায়, সেখান থেকে ঘুরে অফিসে আবার অল্পক্ষণের জন্যে এসেছিল। তারপরে দুপুরে ফ্ল্যাটে চলে যায়। বিকালে আবার অফিসে আসার কথা ছিল।"

"ভিবজিওরের কন্ট্যাক্ট নম্বর আছে তমাদের কাছে?"

"হ্যাঁ, এই যে," রাহুল ভিবজিওর পেইন্টস- এর কলকাতা অফিসের নম্বর দিল।

"আমি এখন একবার তোমাদের অফিসে যাব, দেখি যদি কিছু পাওয়া যায়," বললেন ইনস্পেক্টর বিশ্বাস।

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের কাছেই সৌম্যর অফিস। ছোট কিন্তু পরিপাটি করে সাজানো। সি সি টিভির ক্যামেরা লাগানো আছে। ইনস্পেক্টর বিশ্বাস দুপুরবেলার ফুটেজে দেখতে পেলেন যে রাহুল আর জিয়া দুপুর দুটো থেকে তিনটের মধ্যে অফিসেই ছিল। অফিসে ফাইলপত্রর মধ্যে ভিবজিওর পেইন্টস- এর সঙ্গে এগ্রিমেন্টের পেপার পাওয়া গেল, দেখা গেল ভিবজিওর পেইন্টস- এর কম্পিউটার নিরাপত্তা ব্যবস্থার দেখভাল করা এবং প্রয়োজনে আরো উন্নত করার জন্যে হোয়াইট হ্যাটসকে দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কাজ কত দূর কি এগিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো তথ্যই পাওয়া গেল না।

"ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি, পরে দরকার হলে আবার আসব," ইনস্পেক্টর বিশ্বাস চলে গেলেন।

এদিকে ভিবজিওর পেইন্টস- এর কলকাতা শাখার এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার কমলেশ ত্রিপাঠীর তো মাথায় হাত ইনস্পেক্টর বিশ্বাসের ফোন পেয়ে। তিনি ইনস্পেক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন ফোনে সব কথা হবে না বলে।

পরের দিন সকাল। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার অনির্বাণ চক্রবর্তী সৌম্যর কেস নিয়ে ইনস্পেক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সব শুনে তিনি আগে ভিবজিওরের অফিসে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তারপরে সৌম্যর ফ্ল্যাটে।

বাইপাসের ধারে বিরাট জায়গা নিয়ে ভিবজিওর পেইন্টস- এর অফিস, ল্যাবরেটরি আর কারখানা। অনির্বাণ কথা বলছিলেন কমলেশ ত্রিপাঠীর চেম্বারে বসে।

"আমাদের কি ক্ষতি হয়ে গেল আপনি ভাবতে পারবেন না মিস্টার চক্রবর্তী," কমলেশ দৃশ্যতই আপসেট।

"আপনারা ঠিক কি কাজের জন্যে সৌম্যকে ডেকেছিলেন বা কাজ কতদূর হয়েছিল সে সব যদি ডিটেলসে বলেন," অনির্বাণ বললেন।

"কিছুদিন আগে আমাদের সন্দেহ হয় যে আমাদের ল্যাবের কম্পিউটার হ্যাকড হয়েছে। আমাদের গোপনীয় সব তথ্য বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই সৌম্যকে আমরা ডাকি আমাদের সিস্টেমের সিকিউরিটি চেক করতে। আপনাকে এই ব্যাপারে সব ডিটেলস্ ল্যাব ইন চার্জ মিস্টার বিমান সরকার দেবেন। আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলুন, আমি ডেকে দিচ্ছি। নাকি আপনি ল্যাবে যেতে চান?"

"হ্যাঁ ল্যাবে গিয়ে কথা বলতে পারলেই ভালো হত।"

কমলেশ ত্রিপাঠী বেল বাজিয়ে একজন চাপরাশিকে ডেকে অনির্বাণকে বিমান সরকারের কাছে নিয়ে যেতে বললেন।

"আসুন, দেখুন তো কি সর্বনাশ হয়ে গেল। সৌম্যর কাছে আমাদের কোম্পানির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস আছে, সেসব যে কোথায় রেখেছে কেউ বলতে জানে না। ওর অ্যাসিসট্যান্ট রাহুলও কিছু বলতে পারছে না," অনির্বাণ ঘরে ঢুকতেই বিমান বলে উঠলেন।

"আপনি পরিষ্কার করে সব বলুন, সব ডিটেলস্ আমাকে দিন," বললেন অনির্বাণ।

"ল্যাবে আমাদের যত কম্পিউটার আছে সব হ্যাকড হয়েছে বলে আমাদের সন্দেহ হয়। তাই আমরা সৌম্যকে ডাকি। সৌম্য এসে চেক করতে দেখা যায় সত্যি সত্যিই সব হ্যাকড হয়েছে। সৌম্য কাজ এর মধ্যে শুরু করে দিয়েছিল। ও হ্যাকারদের হদিশও বের করে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে আমাদের ল্যাবে একটা নতুন রঙ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল, আমাদের পরীক্ষা সফল বলা যায়। তার সমস্ত ডেটা যাতে আর কেউ হ্যাক না করতে পারে তার জন্যে সৌম্য সেটা একটা পেন ড্রাইভে কপি করে নিজের কাছে রেখেছিল। কথা ছিল কাল সব কাজ শেষ হয়ে যাবে, কাল সব আবার আমাদের হার্ড ডিস্কে কপি করে দেবে। হ্যাকারদের সম্পর্কে জরুরি কিছু তথ্যও সৌম্য ওই পেন ড্রাইভে কপি করে রেখেছিল। অথচ ওই পেন ড্রাইভ কোথায় আছে কেউ বলতে পারছে না। আপনি বুঝতে পারছেন ওই পেন ড্রাইভ যদি অন্য কারুর হাতে পড়ে তাহলে কী হবে?"

"কোনো কপি নেই? ওই একটাই?"

"যদি থেকেও থাকে তাহলেও ওই পেন ড্রাইভ আমাদের চাই। তা না হলে সর্বনাশ হবে। আপনাদের কি মনে হয় সৌম্যর খুনের কি কারণ? ওর পেশার কারণে না অন্য কোনো ইস্যু?"

"সবে তো তদন্ত শুরু হয়েছে মিস্টার সরকার। তবে আপনাকে একটা ইনফরমেশন দিতে পারি। সৌম্যকে শুধু খুনই করা হয় নি, তার পুরো ফ্ল্যাট তছনছও করা হয়েছে।"

"কি খুঁজতে ফ্ল্যাট তছনছ করেছে? পেন ড্রাইভটা নয়তো?"

"তাতো এখন বলা যাবে না। পেন ড্রাইভের খোঁজে না অন্য কিছুর খোঁজে," অনির্বাণ মাথা নাড়লেন।

"যা হোক করে ওই পেন ড্রাইভটা উদ্ধার করুন, ওটা আমাদের চাই," বিমান সরকার আবার বললেন, "আর এই হ্যাকারদেরই বা এখন কী করে হদিশ করা যাবে?"

"আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমাদের সাইবার ক্রাইম সেলের একজন অফিসার হ্যাকিং এর ব্যাপারটা দেখবেন। লেট'স হোপ ফর দ্য বেস্ট। ঠিক আছে, আমি এখন চলি," অনির্বাণ চলে গেলেন।

●

পূর্বাশা কমপ্লেক্সের ৩০৪ নম্বর ফ্ল্যাটে ফরেন্সিক টিম এসেছে, অনির্বাণও এসেছেন। পুরো ফ্ল্যাট আবার ভালো করে দেখা হচ্ছে, অনির্বাণ মেঝের লেখাটাই আবার ভালো করে দেখছিলেন।

ফরেন্সিক এক্সপার্টরা ততোক্ষণে পুরো ফ্ল্যাটে সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন। অনির্বাণ লিভিং রুম থেকে উঠে বেডরুমে গেলেন। বেডরুমের অবস্থাও তথৈবচ। পুরো ঘর লণ্ডভণ্ড, আলমারি খোলা, আলমারির পাল্লায় কি হোল থেকে চাবি ঝুলছে। চতুর্দিকে জামাকাপড়, কাগজপত্র সব ছড়ানো। অনির্বাণ আলমারির জিনিসপত্র দেখতে লাগলেন। আলমারির লকারে দেখলেন হাজার পনেরো টাকা রয়েছে, কিন্তু খুনি সেদিকে নজর দেয় নি।

"তার মানে কি ওই পেন ড্রাইভটাই খুঁজতে এসেছিল? খুনের মোটিভও কি সেটাই?" ভাবতে থাকেন অনির্বাণ।

সারা ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু হল, কিন্তু কোথাও কোনো পেন ড্রাইভ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না ভিবজিওর পেইন্টস- এর কাজ কর্ম সক্রান্ত কোনো কাগজপত্র। চলে যাওয়ার আগে অনির্বাণ খাটের তলাটা ভালো করে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল খাটের একটা পায়ার কাছে কি একটা চিকচিক করছে। তিনি একিটা ট্যুইজার নিয়ে পায়ার পাশ থেকে সাবধানে তুলে নিয়ে দেখলেন সেটা একটা খুব ছোট তিন কোণা সোনালী রঙের পাত। তার মাথার ওপর একটা ছোট গোল আংটা লাগানো।

"এটা কী হতে পারে? সোনার কিছু? সারা ফ্ল্যাটে তো সোনার কোনো কিছু দেখলাম না। দেখতে হবে এটা কী," অনির্বাণ তিন কোণা টুকরোটা এভিডেন্স ব্যাগে ভরতে ভরতে বললেন।

তারপর আবার হঠাৎ কী মনে হতে ট্যুইজার দিয়ে ওটা বার করে ধরে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে লাগলেন।

"আরে এতে তো SM লেখা রয়েছে, নিশ্চয়ই কোনো জুয়েলারের মোনোগ্রাম। এটা সৌম্যর জিনিসের সঙ্গে মেলাতে হবে, না মিললে বুঝতে হবে.....," তিনি আবার ওটাকে এভিডেন্স ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলেন।

ফরেন্সিক এক্সপার্টরা সৌম্যর মোবাইল, ল্যাপটপও নিয়ে গেল ক্লু- এর আশায়। অনির্বাণ ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সোজা সৌম্যর অফিসে গেলেন। রাহুল, জিয়াকে আগেই আসতে বলা হয়েছিল। অনির্বাণ আবার একবার সব কিছু দেখছিলেন। কিন্তু এগ্রিমেন্টের কাগজ ছাড়া

ভিবজিওর পেইন্টস- এর কাজের না কোনো হার্ড কপি না কোনো সফট কপির খোঁজ পাওয়া গেল। পেনড্রাইভটারও কোন হদিশ নেই।

"রাহুল, তুমি তো বলছো যে সৌম্য সাধারণত সব ক্লায়েন্টদের অফিসেই মিট করে। কিন্তু সেদিন যারা ওর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল তারা কারা? ক্লায়েন্ট? তুমি কিছু জানো?" অনির্বাণ প্রশ্ন করলেন।

সেদিন সকালে অফিসে ল্যাণ্ডলাইনে ফোন এসেছিল। আমরা তিনজনেই তখন জিয়ার কিউবিকলে ছিলাম। ফোন এলে সাধারণত জিয়াই রিসিভ করে প্রথমে, পরে সৌম্যদা বা আমাকে দেয়। সেদিন সৌম্যদাকে কেউ চেয়েছিল, জিয়া সৌম্যদাকে ফোন দেয়ে দেয়," রাহুল জানাল।

"জিয়া, কে চেয়েছিল সৌম্যকে? নাম বলেছিল?" অনির্বাণ জিজ্ঞেস করলেন।

"না, নাম বলে নি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু বলে নি। বলেছিল সৌম্যদার বিশেষ পরিচিত। সৌম্যদা এখানেই দাঁড়িয়েছিল, আমি ফোন দিয়ে দিয়েছিলাম," উত্তর দিল জিয়া।

"কী কথা হয়েছিল? কিছু তো নিশ্চয়ই শুনেছ তোমরা?"

"না, কী কথা হয়েছিল শুনি নি। ফোন দিয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম, রাহুলও নিজের কেবিনে চলে গিয়েছিল। সৌম্যদা পরে বলেছিল যে ওর কেউ পরিচিত দেখা করতে চাইছে, বলছে ফ্ল্যাটে গেলেই সুবিধে হবে।"

"এতে তো কলার আই ডি আছে দেখছি, তাহলে তো বের করা যাবে কার ফোন এসেছিল। নম্বরটা দাও তো।"

জিয়া নম্বরটা বার করে অনির্বাণকে দিল।

"হ্যালো রফিক, শোনো আমি একটা ফোন নম্বর তোমায় এসএমএস করছি। তুমি তাড়াতাড়ি বার করার চেষ্টা করো নম্বরটা কার," অনির্বাণ নম্বরটা এসএমএস করে দিলেন।

"রাহুল, জিয়া আমি আবার তোমাদের জিজ্ঞেস করছি ওই পেন ড্রাইভটা সম্পর্কে তোমরা কিছু জানো? সৌম্য খুন হয়েছে খুব সম্ভবত ওই পেন ড্রাইভটার জন্যেই, কারণ ওর গলার চেন, হাতের আংটি, টাকা সব যেমনকে তেমন আছে।"

"না আমরা কিছুই জানি না। আমাদের কোনো আইডিয়া নেই ওটা কোথায়," বলল রাহুল।

"ঠিক আছে, আমি এখন চলি। আমার কার্ড রইল, কোনো দরকার হলে ফোন কোরো," অনির্বাণ রাহুলকে ওনার কার্ড দিয় চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে রফিক জানাল যে ফোন নম্বরটা গড়িয়াহাট মোড়ের কাছের একটা পাবলিক বুথের।

"ভেরি ক্লেভার, পি সি ও থেকে ফোন করেছে," আপন মনেই বললেন অনির্বাণ।

●

আরও একদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে সৌম্যর দেহ পোষ্ট মর্টেমের পর ওর বেলঘড়িয়ার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে বুকে গুলি লাগার ফলেই সৌম্যর মৃত্যু হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলা। অনির্বাণ নিজের বাড়িতে লিভিং রুমে বসে ভাবছিলেন সৌম্য কী লিখতে চেয়েছিল। পাশে ডিভানে তাঁর ছ"বছরের মেয়ে আর তিন বছরের ছেলে খেলা করছে। অনির্বাণ একটা কাগজের ওপর লিখলেন ঠিক যেরকম সৌম্য লিখেছিল, DO' ।

"D O –এর পরে কী লিখতে গিয়েছিল? সোজা লাইন টানতে চেয়েছিল মনে হয়। সোজা লাইন টেনে আমরা কি কি অ্যালফাবেট লিখি?" নিজের মনে বলতে বলতে অনির্বাণ লিখতে শুরু করলেন – B, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R, T । এতোগুলো অক্ষরের মধ্যে যে কোনো একটা লিখতে চেয়েছিল। আবার সেটাই যে শেষ অক্ষর তারও তো কোনো মানে নেই, এর পরেও তো কিছু থাকতে পারে। লিখতেই বা কি চেয়েছিল? খুনীর নাম? একজন মহিলা, একজন পুরুষ এসেছিল। কার নাম লিখতে চেয়েছিল? Do দিয়ে শুরু কী কী নাম হতে পারে?" বিড়বিড় করতে করতে অনির্বাণ কাগজটা নিয়ে সোফা থেকে উঠে পড়ে হাঁটতে লাগলেন, যদিও দৃষ্টি তখনো কাগজটার দিকে। হঠাৎ তাঁর চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর মেয়ের চিৎকারে।

"কী করলি তুই? তুই কেন আমার ডলুকে ফেলে দিলি?" সে রেগে গিয়ে তার ভাইকে বলছে।

অনির্বাণ মেয়ের কাছে এলেন, "ডলু কী?"

"ডলু আমার মোস্ট ফেভারিট, আমার ডলফিন। দেখো না বাবা, ভাই ডলুকে ছুঁড়ে ফেলে দিল," মেয়ে কার্পেটের ওপর থেকে একটা বড় ডলফিন সফট টয় তুলতে তুলতে বলল।

বিদ্যুৎ চমকের মতো অনির্বাণের চোখের সামনে ভেসে উঠল সৌম্যর বেডরুমের ছবি। আলমারির পাল্লা খোলা, পাল্লার কি হোল থেকে চাবি ঝুলছে, চাবিটা কি রিং- এ আটকানো, কি রিংটায় লাগানো একটা ছোট ডলফিন। ডলফিনটা আসলে পেন ড্রাইভ নয় তো? সৌম্য DOLPHIN লিখতে চায় নি তো?

অনির্বাণ তক্ষুণি ইনস্পেক্টর বিশ্বাসকে ফোন করে সৌম্যর ফ্ল্যাটের দিকে রওনা দিলেন। ফ্ল্যাটে ঢুকে সোজা বেড রুমে চলে গেলেন, কি হোল থেকে চাবিটা বার করে নিলেন। ডলফিনটা ভালো করে দেখতে লাগলেন। খেয়াল করলেন ডলফিনটার মাঝখানে আড়াআড়ি একটা খাঁজ। আস্তে করে দুদিকে টান দিতেই ডলফিনটা খাঁজ বরাবর দুভাগ হয়ে গেল, একভাগের সঙ্গে লাগানো পেন ড্রাইভ উঁকি মারলো। পেন ড্রাইভটা ল্যাপটপে লাগাতে দেখা গেল তাতেই আছে হ্যাকারদের সম্পর্কে কিছু তথ্য আর ভিবজিওর পেইন্টস- এর ডেটা।

"আশ্চর্য এটা সবার চোখের সামনে ঝুলছিল অথচ কারুরই নজরে পড়ে নি। সারা ফ্ল্যাট লণ্ডভণ্ড করেছে, এটা দেখে নি। আমিও খেয়াল করি নি," বললেন অনির্বাণ।

পরের দিন সকালে ইনস্পেক্টর বিশ্বাস ফোন করে সৌম্যর দাদা শুভদীপ এবং ভিবজিওর পেইন্টস- এ জানিয়ে দিলেন যে খুনি ধরা পড়েছে এবং পেন ড্রাইভও উদ্ধার হয়েছে। সবাই যেন সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে অনির্বাণ চক্রবর্তীর অফিসে উপস্থিত থাকেন।

পরের দিন অনির্বাণের অফিসে উপস্থিত রয়েছেন সবাই, রয়েছেন পূর্বাশা কমপ্লেক্সের প্রশান্ত, নমিতাও।

অনির্বাণ বলতে শুরু করলেন, "একদম প্রথম থেকে সব ঘটনা পর পর মনে করা যাক। গত বারো তারিখ বিকাল চারটে নাগাদ মিসেস দে ৩০৪ নম্বর ফ্ল্যাট মানে সৌম্যর ফ্ল্যাটের দরজার তলা দিয়ে রক্তর ধারা বেরিয়ে আসতে দেখেন। দরজা ধাক্কাধাক্কি করেও কোনো আওয়াজ না পেয়ে ওনারা পুলিশে খবর দেন। ইনস্পেক্টর বিশ্বাস ওখানে যান এবং ডোর নব লক ভেঙে ঢুকে দেখেন যে সৌম্যকে কে বা কারা খুন করে গেছে। সারা ফ্ল্যাট লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে। খুন যে টাকা পয়সা নেবার জন্যে হয় নি তার প্রমাণ সৌম্যর চেন, আংটি বা আলমারিতে রাখা টাকা কেউ ধরেও নি। সৌম্যর প্রফেশন সম্পর্কে আমরা ভালো ভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলাম, যদিও ও প্রতবেশীদের কিছু জানায় নি। প্রথম বার সারা ফ্ল্যাট খুঁজেও কোনো ক্লু পাওয়া গেল না যার থেকে খুনীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা সৌম্যর অফিস হোয়াইট হ্যাটস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে..... "

"অফিসের নাম হোয়াইট হ্যাটস প্রাইভেট লিমিটেড? হোয়াইট হ্যাটস? এরকম অদ্ভুত নাম?" অনির্বাণের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন প্রশান্ত।

অনির্বাণ হাসলেন, "হোয়াইট হ্যাট বলা হয় এথিকাল হ্যাকারদের, যারা বিভিন্ন কোম্পানির অনুমতি নিয়ে তাদের ওয়েবসাইট হ্যাক করে সিকিউরিটির ফাঁকফোকরগুলো দেখিয়ে দেয়। তারপর সেগুলো ঠিকও করে দেয়। আসলে এরা সিকিউরিটি এক্সপার্ট। সৌম্যও ঠিক এই কাজই করত, সঙ্গে সঙ্গে ও হ্যাকারদের ট্রেস করার চেষ্টাও করত এবং কোম্পানিরই কেউ পাস ওয়ার্ড বলে দেওয়া বা অন্য কোনো ধরণের সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা তাও দেখত। তুখোড় বুদ্ধি ছিল ওর। কয়েকটা কেসে খুব নাম করেছিল।

যাক্ গে যা বলছিলাম। ওর অফিস থেকে আমরা জানতে পারি যে ও বিখ্যাত ভিবজিওর পেইন্টস- এ কিছু কাজ করছিল। কিন্তু কাজটা ও নিজে করত, অন্যান্য কাজের মতো ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট রাহুল ওকে হেল্প করত না। আমি ভিবজিওর পেইন্টস- এর অফিসে গেলাম, ওখানে কথা বলে অনেকগুলো তথ্য পেলাম। কিছুদিন আগে ভিবজিওর পেইন্টস- এর একটা নতুন এক্সটিরিয়র ওয়াল পেইন্ট 'ওয়াল কেয়ার' বাজারে ছাড়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে তার ঠিক দুদিন আগে একদম এক কোয়ালিটির, এক টাইপের পেইন্ট অজন্তা কালারস এণ্ড পেইন্টস নামে একটা কোম্পানি বাজারে লঞ্চ করে। ভিবজিওর পেইন্টস- এর খ্যাতি সারা ভারত জুড়ে, তাদের পেইন্টসের কোয়ালিটি একদম আলাদা, ভ্যারাইটিও অনেক বেশি। অজন্তার এই নতুন পেইন্টটা দেখে তারা স্তম্ভিত হইয়ে গেল। ওয়াল কেয়ার তো তারা বাজারে ছাড়ল কিন্তু সন্দেহ থেকে গেল।

তারা সৌম্যকে ডাকল তাদের ল্যাবের কম্পিউটার হ্যাকড হয়েছে কিনা জানতে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাকাওরদের ট্রেস করার দায়িত্বও সৌম্যকে দিয়াছিলেন মিস্টার ত্রিপাঠী, কী? আমি ঠিক বললছি তো?" অনির্বাণ কমলেশ ত্রিপাঠীর দিকে তাকালেন।

"একদম ঠিক," বললেন কমলেশ ত্রিপাঠী।

"সৌম্য খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিল। কাজ অনেক দূর এগিয়েও গিয়াছিল। এরই মধ্যে ভিবজিওর পেইন্টস- এর ল্যাবে আরেকটা নতুন পেইন্ট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছিল। তার তথ্য তখনো ল্যাবের কম্পিউটারে রাখা নিরাপদ ছিল না বলে সৌম্য সেগুলো এবং হ্যাকারদের সম্পর্কে কিছু তথ্য একটা পেন ড্রাইভে কপি করে রেখেছিল। যদিও এক্সপেরিমেন্টের ডেটার আর কোনো কপি আছে কিনা সেটা মিস্টার সরকার আমাকে পরিষ্কার করে বলেন নি।"

বিমান সরকার একটু অপ্রস্তুত হয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। অনির্বাণ আবার বলতে শুরু করলেন, "এর পরই সৌম্য খুন হয়ে গেল। রহস্য দুটো, এক খুন করল কে, কীউ কারণে, দুই পেন ড্রাইভটা কোথায় গেল?

দ্বিতীয় বার সৌম্যর ফ্ল্যাটে আমরা যখন যাই তখন আমি একটা খুব ছোট তিনকোণা সোনার পাত পাই যাতে SM জুয়েলার্সের মনোগ্রাম ছিল। SM জুয়েলার্সের শো রুমে ওটা নিয়ে গেলে জানা গেল যে ওটা তাদের তৈরি একদম নতুন একটা ডিজাইনের ব্রেসলেটের অংশ। ব্রেসলেটটা থেকে ওরকম এক সারি ছোট ছোট তিন কোণা পাত ঝোলে। ব্রেসলেটটা মাস তিনেক হল বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিনেছে যারা তাদের নামের লিস্ট আমার হাতে এল। গোটা কুড়ি নাম, একটা নামে আমার চোখ আটকে গেল – শ্রীমতি অজন্তা ঘোষ। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম অজন্তা ঘোষ, অজন্তা কালারস এণ্ড পেইন্টস- এর মালকিন।

সন্দেহ আরো ছিল। সারা ফ্ল্যাট কীসের জন্যে তছনছ করা হয়েছিল? হতে পারে ওই পেন ড্রাইভটাই অজন্তা ঘোষের খুব দরকার ছিল। হ্যাক তো ওরাই করিয়েছিল।"

"তার মানে আমাদের সন্দেহ নির্ভুল?" বললেন মিস্টার সরকার, "কিন্তু ওরা জানল কী করে যে সৌম্য আমাদের কাজ করছে?"

"অজন্তা আপনাদের কম্পিউটার হ্যাক করিয়াছে আর আপনাদের ওপর নজর রাখে না ভাবছেন? যাই হোক সৌম্য যে আপনাদের ওখানে কাজ করছে তা জানতে পারার পরই অজন্তা তার স্বামীকে নিয়ে সৌম্যর ফ্ল্যাটে দেখা করতে যায়। প্রথমে তারা ভালো কথায় সৌম্যকে বোঝানোর চেষ্টা করে, টাকা অফার করে, ভিবজিওর- এর কাজ বন্ধ করতে বলে, হ্যাকারদের ডিটেলস পুলিশকে দিতে বারণ করে। কিন্তু সৌম্য শোনে নি। তখনই অজন্তার হাজব্যাণ্ড সৌম্যকে গুলি করে কারণ সৌম্য ওদের ধরিয়ে দিতে পারত। তারপর সারা ফ্ল্যাট দুজনে মিলে খুঁজল কিন্তু কিছু পেল না। এসব কথা অজন্তা আর তার হাজব্যাণ্ড জেরায় স্বীকার করেছে। ওদের কসবার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে পিস্তলও পাওয়া গেছে। বাথরুমের ফ্লাশ ট্যাঙ্কে প্লাস্টিক মুড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। ওই পিস্তল থেকে পাওয়া গুলির সঙ্গে সৌম্যর শরীর থেকে পাওয়া গুলি মিলে গেছে। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো ছিল তাই কেউ আওয়াজ শুনতে পায় নি," অনির্বাণ থামলেন।

“কিন্তু রাহুল যে বলেছিল সৌম্য ওদের চিনত তাই ফ্ল্যাটে আসতে বলেছিল। সৌম্য অজন্তা ঘোষকে কি করে চিনত?” শুভদীপ প্রশ্ন করল।

“অজন্তা ঘোষকে চিনত না। তবে অজন্তা ঘোষের স্বামীকে চিনত ছোটবেলা থেকে। আপনিও চেনেন। তপন ঘোষকে মনে পড়ে? আপনারা ছোটবেলায় যে পাড়ায় থাকতেন সেখানে থাকত, বোধহয় আপনাদের পাশের বাড়িতেই, তাই না? আপনারা পরে অন্য পাড়ায় বাড়ি কিনে চলে যান, ওরাও ওদের কসবার ফ্ল্যাটে চলে আসে। ওদের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগও ছিল না, তাই জানেন না তপন ঘোষের প্রথম স্ত্রী মারা গেছে, অজন্তা ওর দ্বিতীয় স্ত্রী। অজন্তার নামেই পেইন্টসের কারখানা খোলে বছর দুয়েক আগে। তপন ঘোষই সৌম্যকে সকালবেলা ফোন করে দেখা করতে চায় ওর ফ্ল্যাটে, সৌম্যকে গুলিও করে তপন ঘোষই,” অনির্বাণ বললেন।

“তপন ঘোষ? আমরা তপন কাকু বলে ডাকতাম, সেই তপন কাকু সৌম্যকে.....” শুভদীপ দু হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

প্রশান্ত, নমিতা তাকে সামলালেন।

"আর পেন ড্রাইভটা? ওটা কোত্থেকে পেলেন?" জিজ্ঞেস করলেন কমলেশ ত্রিপাঠী।

"হ্যাঁ পেন ড্রাইভ, দু নম্বর রহস্য," অনির্বাণ বললেন, "এই রহস্য ভেদ করার কিছুটা কৃতিত্ব আমার ছ"বছরের মেয়ের। ও ওর খেলনা ডলফিনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে হয়তো আমার তখন মনেই পড়ত না যে সৌম্য বেড রুমের আলমারির কি হোল থেকে ঝোলা চাবির রিং-এ আমি একটা ছোট ডলফিন দেখেছিলাম। ওই ডলফিনটাই হচ্ছে সৌম্যর পেন ড্রাইভ। ও ওটাকে এমন ক্যাজুয়ালি রেখেছিল যে কারুরই নজরে পড়ে নি। গুলি লাগার পরও ওর মাথায় ছিল ওটার কথা। তাই মেঝেতে রক্ত দিয়ে DOLPHIN লিখতে চেষ্টা করেছিল। পেন ড্রাইভটা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তা ও জানত তাই শেষ সময়েও খুনির নাম না লিখে ও ডলফিন লেখার চেষ্টা করেছিল যাতে এটার খোঁজ পুলিশ পায়। সৌম্য নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আপনাদের কনফিডেন্সিয়াল ডেটা অন্য কারুর হাতে পড়তে দেয় নি। সেই সঙ্গে ধরিয়ে দিয়ে গেছে একটা বড় গ্যাংকে যারা নানা ধরণের সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত ছিল।"

ছবিঃ সোমা চক্রবর্তী

বিজয়ী

অর্ণব মন্ডল

ঘটনাটা যখন ঘটে আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। ইংরিজি অনার্স পড়ছি বিদ্যাসাগর কলেজে। দিনকে দিন তখন আমাদের কয়েকজনের মাথার যন্ত্রণার বিষয় হয়ে উঠছিল এই ইংরিজি অনার্স টা। কিন্তু কী আর করা যাবে। তখন আর বদল করার উপায় ছিল না। রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। সামনেই মিড টার্ম পরীক্ষা। আর তাছাড়া বিষয় বদল করার কথা বাড়িতে বললেই কৈফিয়ত দিতে হবে 'কেন ? কী অসুবিধে হচ্ছে? সবাই পারলে তুই পারবি না কেন?' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভয়েই আমরা কয়েকজন 'যা হবে দেখা যাবে' রকমের মনোভাব নিয়ে টিকে ছিলাম। একে তো এই চাপ তার ওপর আমাদের কলেজে ছিলেন রজতাভ দত্ত নামে একজন দজ্জাল প্রফেসর। ছাত্রের মনোবলকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার কাজে ওনার যেন ডক্টরেট করা ছিল। আমরা আড়ালে ওনাকে 'আর ডি এক্স' বলে ডাকতাম। আমাদের ডিপার্টমেন্টে জয় বলে একটা ছেলে পড়ত। ওই একমাত্র ছেলে ছিল যে ওনাকে খুব একটা পাত্তা দিতনা। বলা বাহুল্য আর ডি এক্স নামটা জয়েরই দেওয়া। কিন্তু সৌভাগ্যবশতই হোক বা দুর্ভাগ্যবশত জয়ের সাথেই সবথেকে বেশি শত্রুতা ছিল ইংরেজির। ও যে ইংরেজিতে কাঁচা ছিল তাও না। ভাল আর্টিকল লিখত। ইংরেজি গল্পের বই পড়ত অনেক। কিন্তু পড়াশুনো ও করত না। আমার সাথে একই মেসে থাকত তাই খুব কাছ থেকে চিনেছিলাম আমি ওকে। আজ এখানে কাল সেখানে খালি টো টো করে ঘুরে বেড়াত। কাজেই আর ডি এক্স এর (নাকি রজতাভবাবু বলব?) বকুনিও রোজ ওর জন্যেই বরাদ্দ থাকত। তাতে অবশ্য খুব একটা পরিবর্তন হত না। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' প্রবাদের সার্থক উদাহরণ আমরা রোজ দেখতাম।

জয়ের ভাল গুণ অবশ্য অনেক ছিল। ভালো গিটার বাজাত ও, গল্প লিখত ভাল। আর ও ওর বন্ধুদের খুব ভালবাসত। বিশেষ করে দেবার্ঘ্য কে। দেবার্ঘ্য আর জয় এই দু'জনের বন্ধুত্বও ছিল দেখার মত। সব সময় দু'জনে একসাথে থাকত। একজন কলেজ না এলে আর একজনেরও

পাত্তা পাওয়া যেতনা কলেজে। যদিও দেবার্ঘ্য তুলনামুলকভাবে পড়াশোনায় ভাল ছিল। কিন্তু পড়াশোনা ওদের বন্ধুত্বের মাঝে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

তারিখটা আমার মনে নেই। মনে রাখা সম্ভবও নয় যদিও। সময়টা যতদূর মনে পড়ে নভেম্বরের মাঝামাঝি। একদিন রজতাভবাবু ক্লাসে এসে বললেন যে সাতাশে নভেম্বর থেকে আমাদের মিড টার্ম পরীক্ষা শুরু হবে। আর আমাদের ফার্স্ট পেপার এর প্রশ্ন তৈরি করবেন উনি। অনেকেরই মাথায় হাত পড়ে গেল সেটা শোনার পর। 'আর ডি এক্স' কে কে না ভয় পায়। সবাই জানে ও প্রশ্ন করলে হাল খারাপ করে দেবে। স্যার যাবার পর জয় কে বললাম, "কীরে? কী হবে এবার? অবস্থা তো সঙ্কটজনক"। জয় তখন দেবার্ঘ্যর ফোনটা নিয়ে ফেসবুক করছিল। মাথা না তুলেই বলল, "কী আবার হবে? এই পরীক্ষার কিছু গুরুত্ব আছে নাকি? খাতাই দেখেনা শুনেছি। ও কিছু হবে না!" আমি আর কিছু বললাম না। এর পরে আর কীই বা বলার থাকে ওকে। গুরুত্ব থাকুক বা না থাকুক পরীক্ষাটা পরীক্ষার মত দেওয়াই ভাল বলে আমার মত। কলেজ থেকে ফিরে টিফিন করেই পড়তে বসে গেলাম। এক ঘন্টা পর উঠে জয়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি সে ব্যাটা হেডফোন কানে লাগিয়ে শুয়ে শুয়ে গান শুনছে। আমি থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, "হ্যাঁরে তোর কি ভয়ডর নেই? দু'সপ্তাহ পরে পরীক্ষা আর তুই এই ভরসন্ধ্যেবেলা পড়াশুনা বাদ দিয়ে গান শুনছিস?" ও আমার দিকে তাকিয়ে শুধু একটা শুকনো হাসি হাসল। আমি আর কিছু না বলে চলে এলাম নিজের ঘরে। ওকে কিছু বলাও বৃথা। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করাতে পারবেনা।

আস্তে আস্তে পরীক্ষার দিন এগিয়ে এল। দিনের আর কী দোষ। তার তো ওটাই কাজ। ফার্স্ট পেপার পরীক্ষার দু'দিন আগে দেখলাম জয় ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসের বইটা উলটে পালটে দেখছে। সেকেন্ড পেপার নিয়ে ওর খুব একটা চাপ নেই আমি জানি। কারণ ওটায় অত মুখস্থ করার ব্যাপারটা নেই। ওকে জিজ্ঞেস করলাম "কী রে? কতদূর হল?" ও বলল, "আরে এই তো বইটা খুললাম। কতদূর পরীক্ষা হবে একটু দাগ দিয়ে দে।"

"পরশুর পরের দিন পরীক্ষা আর তুই সিলেবাসটাই জানিস না?" ভীষণ অবাক হয়ে বললাম আমি।

জয় বলল, "আরে জানা হয়নি। দেবার্ঘ্যকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। কিন্তু ওকে ফোন করলে পড়াশুনার কথার থেকে অন্য কথা বেশি হয়"। আমি আর বাক্যব্যয় না করে ওর বইয়ে দাগ দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। আধঘন্টা পর শুনতে পেলাম জয় গিটারে বাজাচ্ছে 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে।' ছেলেটাকে দিয়ে আর সত্যি কিছু হবে না!

পরীক্ষার দিন অবশ্য আমার আগে কলেজে চলে গিয়েছিল জয়। গিয়ে দেখি ও আর দেবার্ঘ্য পর পর দুটো বেঞ্চে বসেছে। আমাকে দেখতে পেয়েই দেবার্ঘ্য ডাকল, "সুমিত, এখানে বসবি আয়।" আমি জানতাম দেবার্ঘ্য পড়াশোনাটা করে অন্তত। তাই কোনো অসুবিধে হলে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এই আশায় ওদের কাছে গিয়েই বসলাম আমি। দু' ঘন্টার পরীক্ষা ছিল। গার্ড খুব কড়া দিচ্ছিল। তাই সাহায্য আমার আর পাওয়া হয়নি। পরীক্ষার বাকি দুটো দিনও

কাটল কোনোরকমে। সেকেন্ড পেপারটা অবশ্য ফার্স্ট পেপারের থেকে ভাল হয়েছিল। যদিও সবারই তাই। আর সেটাই স্বাভাবিক।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় খাতা বেরোল। অনেকেই ফেল করল ফার্স্ট পেপারে। বলাই বাহুল্য জয়ও তাদের মধ্যে একজন। ওর অবশ্য খুব একটা হেলদোল দেখলাম না তাতে। ও হ্যাঁ! আমি পাশ করেছিলাম। মাথায় মাথায় প্রায়।

সেদিন একটা মারাত্মক ব্যাপার হল কলেজে। সেদিন লাইব্রেরিতে দেখলাম আমাদের ডিপার্টমেন্ট দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল হচ্ছে যারা ফেল করেছে মিড টার্ম এ। তারা একসাথে বসেছে। আর বাকিরা আর একজায়গায়। শুধু দেবার্ঘ্য ব্যাতিক্রম। ও জয়ের কাছেই বসেছিল। ওদের কাছে গিয়েই বসলাম আমি। জয় গিটার নিয়ে গিয়েছিল কলেজে। টুং টুং করে কী যেন সব বাজাচ্ছিল আর বাকিদের উপদেশ দিচ্ছিল, "পরের বার সবারই ভাল হবে। দেখে নিস। এই পরীক্ষার কোন মূল্য নেই। চাপ নিস না।" আমি শুধু ভাবছিলাম ছেলেটা কী ধাতু দিয়ে তৈরি? একটা পেপারে ফেল করেছে তাতেও কোনো বিকার নেই। দেবার্ঘ্য ওর কাঁধে হাত দিয়ে বসেছিল আর ওর কথায় কথায় মাথা নাড়ছিল। এমন সময় হঠাৎ 'আর ডি এক্স' লাইব্রেরিতে এলেন। জয়ের হাতে গিটারটা দেখেই চোখ যেন জ্বলে উঠল ওনার। চেঁচিয়ে বললেন, " একে তো ফেল করেছিস তার ওপর কলেজে গিটার নিয়ে এসে নাচানাচি করছিস? লজ্জা করছেনা তোর? এই ছেলেগুলোরও মাথা খাচ্ছিস?" জয় চুপ করেছিল। কীইবা বলবে ও। আমরাও সবাই থ বনে গেছি। দেবার্ঘ্য দেখলাম জয় কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লাইব্রেরির বাইরে। স্যার তখনো থামেননি, বলে চললেন "জানোয়ারগুলো সব জোটে এই কলেজে। বাবা মার কত জন্মের পাপের ফলে এরকম সন্তান হয় ভগবান জানেন"। এই কথাটা শোনার পরেই জয় দেবার্ঘ্যর হাত ছাড়িয়ে স্যারের সামনে এসে, সটান প্রশ্ন করল, "আপনার প্রবলেমটা কোথায়? আমার বাবা মা জানোয়ারের জন্ম দিয়েছে না মানুষের তাতে আপনার কি আসে যায়?" দেবার্ঘ্য আবার এসে জয়কে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। এবার আমিও গিয়ে জয়কে ধরলাম। রাগে ফুঁসছিল ও। স্যার এবার চুপ। দেবার্ঘ্য জয়কে কানে কানে বলল, "টেস্ট এও কি ফেল করার শখ হয়েছে? তুই থাম এবার।" জয় লাইব্রেরির বাইরে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল, "টেস্টে? টেস্টে ওই লোকটা আমার খাতায় পেনের দাগ বসাতে পারবেনা"। কথাটা স্যারের কানেও গিয়েছিল। তিনি এবার এগিয়ে এলেন জয়ের দিকে। এসে গুরুগম্ভীর গলায় বললেন, " টেস্টেও যদি তুই পাশ করতে না পারিস তাহলে তোকে অন্য কলেজ দেখতে হবে। শুধু তোকে নয়। যে ফেল করবে তাকেই। এটা মাথায় রাখিস।" বলে চলে গেলেন স্টাফ রুমের দিকে। আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলাম লাইব্রেরির দরজার সামনে।

****

সন্ধ্যেবেলা জয়ের রুমে উঁকি দিয়ে দেখলাম জয় পড়ছে। দু' মাস পর টেস্ট পরীক্ষা। যা হল কলেজে তারপর জয়ের পড়তে বসাটাই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হল। ওকে আর ঘাঁটালাম না। নিজের ঘরে এসে পড়তে বসলাম। যদিও পড়াতে মন বসছিল না। খালি কলেজের

ব্যাপারটা চোখের সামনে ভাসছিল। তবে একবারের জন্য মনে হয়নি দোষটা জয় এর। স্যার আজ খুব অভদ্র আচরণ করেছেন লাইব্রেরিতে। আমি সত্যি মনে মনে চাই জয় ভাল করে পরীক্ষা দিক। ভালো রেজাল্ট করুক। তবেই স্যারের মুখে ঝামাটা ঘষা হবে।

যাই হোক তারপর থেকে জয়ের মধ্যে সত্যি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আচার আচরণে নয়। ওই ব্যাপারটাতে জয় জয়ই ছিল। কিন্তু পড়াশোনার দিকে আস্তে আস্তে বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর ভাব ফুটে উঠছিল ওর মধ্যে। যাক! একটা 'পরিবর্তন' এ কেউ উপকৃত হবে ভেবে ভাল লাগল।

ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখ ছিল সেদিন। সবেমাত্র দেশের বাড়ি থেকে ফিরে মেসে ঢুকছি। হঠাৎ জয় দেখলাম রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে বেরিয়ে চলে গেল গেট দিয়ে। ডাকার সময়টুকুও পেলাম না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। খানিকটা অবাক হয়েই নিজের ঘরে গেলাম। সবথেকে অবাক লাগল যখন দেখলাম সেদিন রাতে ও ফিরল না মেসে। এবার চিন্তা হতে লাগল আমার। তিনবার ফোন করলাম। রিং হয়ে হয়ে কেটে গেল। ধরল না। খানিক পর রুমের বাইরে গিয়ে কি মনে হতে আবার ফোন করলাম। শুনতে পেলাম পাশের ঘরে ফোন বাজছে। অবাক কান্ড! অর্থাৎ ফোন নিয়ে যেতে ভুলে গেছে জয়। ব্যাপারটা অদ্ভূত লাগল। জয় ফোন নিয়ে যেতে ভুলে গেছে! ভাবা যায়! যাই হোক আর চেষ্টা করলাম না। নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। কাল আবার কলেজ যেতে হবে।

কলেজে গিয়ে দেখলাম দেবার্ঘ্যও কলেজ আসেনি। ক্লাসে এসে ম্যাডাম বলে গেলেন আমাদের পরীক্ষা চব্বিশে ফেব্রুয়ারি থেকে। অর্থাৎ হাতে আর মেরেকেটে পনেরো দিনের মত। যদিও সিলেবাস শেষ করে দিয়েছে কলেজে। কিন্তু আমার নিজের পড়া হয়নি। সেদিন বিকেলে টিউশন ছিল। কলেজে থেকেই সোজা চলে গিয়েছিলাম পড়তে। পড়ে ফিরলাম রাত ন'টায়। দেখলাম জয় তখনো ফেরেনি। গেল কোথায় ছেলেটা?

নিজের ঘরে বসে এটা সেটা ভাবছি। হঠাৎ মনে হল জয়ের রুম খোলা হল। আওয়াজ পেয়েই গেলাম ওর ঘরে। দেখলাম বাবুমশাই জুতোশুদ্ধ পা নিয়েই বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল ওকে। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় গিয়েছিলি কাল? কোথায় ছিলি কাল রাতে?" ধরা গলায় উত্তর এল, "দেবার্ঘ্যর বাড়ি গিয়েছিলাম।" বুঝলাম যে আড্ডা দিয়ে ফিরলেন বাবু। "ও! আচ্ছা।" বলে বেরিয়ে আসতে যাব, এমন সময় জয় বলল, "কাকু আর নেই রে! কাল সব শেষ হয়ে গেল।"

আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকালাম। হঠাৎ এরকম একটা ব্যাপার শুনব ভাবিনি। খানিক পর জোর করেই জিজ্ঞেস করলাম, "কীভাবে?" ও বলল, "অ্যাক্সিডেন্ট। টিউশন পড়িয়ে ফিরছিলেন। একটা বাস এর সাথে.... " আর কিছু বলতে পারলনা ও। আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। এটা জানতাম যে দেবার্ঘ্যর বাবা টিউশন করেই সংসার চালান। যদিও খুব একটা অভাবী ছিল না ওরা। কিন্তু এরপর? কীভাবে চলবে সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। একবার মনে হল একটা ফোন করি দেবার্ঘ্যকে। তারপরেই মনে হল কী বলব ফোন করে? এখন ওকে একা থাকতে দেওয়াই ভাল।

পরের দিন জয়কে শুধু জানালাম পরীক্ষার তারিখটা। কিছু বলল না। একটু বেলার দিকে দেবার্ঘ্যর বাড়ি চলে গেল। বলে গেল। তাই জানতে পারলাম। আমিও সারাদিন অনেক চেষ্টা করেও পড়ায় মন বসাতে পারলাম না। জয় ফিরল রাতে। জিজ্ঞেস করলাম "কেমন আছে দেবার্ঘ্য?" বলল "ভাল না।"

পরীক্ষার দিন এগিয়ে এল। জয়ও দেখলাম কয়েকদিন পর আবার ঠিকঠাক ভাবেই পড়া শুরু করেছে। যদিও মাঝে মাঝেই দেবার্ঘ্যর জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগছিল। ও যে কি পরীক্ষা দেবে জানিনা! জয় বলছিল, "ও ওর বাবার দু'টো টিউশন পেয়েছে। ওতেই চলছে ওদের সংসার। তবে টেস্টে ফেল করলে ওকে আর রাখবে বলে মনে হয়না।"

চব্বিশ তারিখ অর্থাৎ পরীক্ষার দিন জয় যথারীতি আমার আগেই কলেজে গেল। গিয়ে দেখলাম একসাথে বসে আছে ওরা। জয় কিছু বোঝাচ্ছে দেবার্ঘ্যকে। আর দেবার্ঘ্য চুপ করে শুনছে। ওদের কাছে বসার জায়গা ছিল না। তাই সেবার আমায় আলাদা বসতে হয়েছিল। চার ঘন্টার পরীক্ষা। প্রশ্ন খুব কঠিন হয়েছিল। বুঝতে পারলাম 'আর ডি এক্স' বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছেন জয়ের জন্যে। একবার তাকালাম জয়ের দিকে। দেখলাম মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হবার দশ মিনিট আগে খাতা দিয়ে বেরিয়ে গেল জয়। আমরা বাকিরা ঘণ্টা পড়ার পরেই জমা দিলাম।

সন্ধ্যেবেলা জয়কে জিজ্ঞেস করলাম, "কীরে? কেমন পরীক্ষা হল?" বলল, "ঠিকঠাক।" কাল আবার সেকেন্ড পেপার। তাই আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে এসে বই নিয়ে বসে গেলাম।

সেকেন্ড পেপার পরীক্ষাটা আগের বারের মতই ফার্স্ট পেপারের থেকে ভাল হল। দেখা যাক রেজাল্ট কি হয়। রেজাল্ট বেরোবে পনের দিন পর। এর মাঝে আর বিশেষ কিছু ঘটেনি।

****

সবাই ক্লাসে বসে আছি জড়সড় হয়ে। তারিখটা বোধহয় ছিল বারোই মার্চ। ফার্স্ট পেপার খাতা দেবার কথা আজ। জয় এর মুখে অবশ্য ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। দেবার্ঘ্য মাথা নিচু করে বসে আছে। আমার নিজের অবস্থাও খুব খারাপ। খুব টেনশন হচ্ছে। খানিক পরে ক্লাসে ঢুকলেন রজতাভবাবু (আজ আর আর ডি এক্স বলতে সাহস হচ্ছে না)। হাতে খাতার বান্ডিল। নাম প্রেজেন্ট করার পর দেবার্ঘ্যকে বললেন, "নিজের নামটা লেখার সময় কি ভুলে গিয়েছিলে? ওইভাবে কাটাকাটি করেছ কেন খাতায়?" দেবার্ঘ্য কিছু বললনা। মাথা নিচু করে রইল। স্যার বলে চললেন, "তবে এতবড় অ্যাক্সিডেন্ট সামলে তুমি যে এরকম পরীক্ষা দেবে আমি ভাবিনি। পড়াশুনো করে যাও। ফাইনালে খুব ভাল রেজাল্ট হবে তোমার।" এবার কেন জানিনা মনটা খুব ভাল লাগল। ওকে নিয়ে সত্যি খুব খারাপ লাগছিল। ওর পাশেই বসেছিলাম আমি। হঠাৎ নাক টানার আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারলাম দেবার্ঘ্য কাঁদছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না আমার। ভাল রেজাল্ট হয়েছে শোনার পর কেউ কাঁদে নাকি? তারপরেই মনে হল বাবার কথা মনে পড়ছে হয়ত ওর। জয় দেখলাম কাঁধে হাত দিয়ে শান্ত করছে ওকে। এরপর স্যার যে কথাটা বললেন তাতে বাকিদের কী হল জানিনা কিন্তু আমি একটা খুব বড় ধাক্কা খেলাম। স্যার বললেন, "মিস্টার জয়,

নতুন কলেজ দেখ। এখানে আর জায়গা হবে বলে মনে হয়না"। অবাক হয়ে জয়ের দিকে তাকালাম। দেখলাম শান্তভাবে তাকিয়ে আছে স্যারের দিকে। স্যার এবার ওর খাতাটা ক্লাসের সামনে তুলে ধরলেন আর বললেন, "কনগ্রাচুলেশন জয়কে! আবার ফেল করেছে ও।" সবাই তাকালাম ওর খাতার দিকে। দেখলাম লাল কালিতে ঊনিশ লেখা। একশোর মধ্যে ঊনিশ পেয়েছে ও। সবাই চুপ। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম খাতাটার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে সবার খাতা দিলেন স্যার। আমি পেলাম ছেচল্লিশ। দেবার্ঘ্য দেখলাম সাতান্ন পেয়েছে। তখনো কাঁদছে ও। স্যারের অবশ্য সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। উনি খাতা দিয়েই চলে গেলেন। যাবার আগে কঠিন গলায় জয়কে মনে করিয়ে গেলেন, "অন্য কলেজ!"

মনটা খুব ভারী ভারী লাগছিল। কেন জানিনা মনে হচ্ছিল কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। স্যার কি ইচ্ছে করে জয়কে কম নাম্বার দিয়েছেন? এসব ভাবতে ভাবতে লাইব্রেরিতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আর এক কান্ড! দেবার্ঘ্য চেঁচাচ্ছে, "না। এটা ঠিক হয়নি জয়। আমি স্যারের কাছে যাব"। জয় দেখলাম ওকে থামানোর চেষ্টা করছে। আমি ওদের কাছে গেলাম। বললাম, "কীরে কী হয়েছে?" জয় বলল "কিছু না! এই তুই বাড়ি চল তো!" বলে টানতে টানতে নিয়ে চলল দেবার্ঘ্যকে। সেদিন অনেক রাতে ফিরেছিল জয়। মনে হয় প্রিয় বন্ধুর বাড়িতেই ছিল বিকেল থেকে। ও ফিরতে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে রে? তখন কলেজে কি বলছিল দেবার্ঘ্য?" বলল, "কী আবার বলবে? আমার খাতা দেখে ওর মনে হয়েছে স্যার ইচ্ছে করে আমার বেশি নাম্বার কেটেছে। তাই রেগে গিয়েছিল। বাদ দে তো!" কেন জানিনা এই উত্তরটা আমার ঠিক পছন্দ হল না। আর কিছু না বলে আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। ঠিক করলাম কাল জিজ্ঞেস করব দেবার্ঘ্যকে। খুব কৌতূহল হচ্ছে আমার। তখনও ভাবিনি আমার জন্যে কতবড় বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে কাল।

পরের দিন কলেজে একটু তাড়াতাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখলাম দেবার্ঘ্য বারান্দায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওকেই দরকার ছিল আমার। সোজা ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপারটা কী আমায় একটু বলবি? কাল অত চেঁচামেচি করছিলি

কেন লাইব্রেরিতে?” ও চুপ করে রইল। আমি খানিক থেমে আবার বললাম, “কী রে?” ও এবার মাথা নিচু করেই বলল, “আমি অনেক বারণ করেছিলাম ওকে। ও শোনেনি।” “কী শোনেনি?” আমি একটু অধীর হয়েই জিজ্ঞেস করলাম। দেবার্ঘ্য বলল, “ও পরীক্ষা হলে আমার সাথে খাতা বদলাবদলি করেছিল। আমি কিচ্ছু লিখতে পারছিলাম না দেখে জোর করে ও নিজের খাতায় নিজের নাম কেটে আমার নাম লিখে আমাকে ওর খাতাটা দিয়ে দিয়েছিল”। আমি হতভম্ব। কী বলব কিছু বুঝতে পারছিলাম না। এরকমও ছেলে হয়! দেবার্ঘ্যর চোখে আবার জল চলে এল। ধরা গলায় বলল, “আমার নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। ভালো লাগছেনা কিছু!” আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম। এদিকে আর একজন কে আসতে দেখলাম। হাসিমুখে, হেলতে দুলতে, বিজয়ীর মত। সেই শান্ত চোখ, সেই নির্বিকার ভঙ্গী। এসেই বলল, “কীরে? এখানে কী করছিস? চল লাইব্রেরিতে যাই।”

ছবিঃ অন্তরা

মূল কাহিনীঃ সার আর্থার কোনান ডয়েলের দা লস অ্যামিগোস ফিয়াসকো

লস অ্যামিগোস শহরের কথা সবাই শুনেছেন। হ্যাঁ, সেই লস অ্যামিগোস শহর যেখানে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের জন্য একটা বিরাট জেনারেটিং সিস্টেম ছিল। লস অ্যামিগোস শহরে আমি ডাক্তারি করতাম এবং সেখানে, বলতে নেই, আপনাদের কৃপায় আমার পশার খুবই ভাল ছিল।

লস অ্যামিগোস শহরটা ছিল রীতিমত বড়, আশেপাশে ছিল বেশ কিছু শহরতলি আর গ্রাম। এবং এই পুরো এলাকাটারই ইলেকট্রিক সাপ্লাই হত লস অ্যামিগোসের এই ইলেকট্রিক জেনারেটিন সিস্টেম থেকে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে এখানে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হত। ললস অ্যামিগোসের বাসিন্দারা বলত, এই শহরটাই বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সেরা এবং সব দিক দিয়ে এগিয়ে। তবে পরে আমরা একটু সংশোধন করে বলতাম, সবদিক দিয়ে এগিয়ে ঠিকই, তবে দুটো জিনিস বাদ দিয়ে। এক হচ্ছে এর জেলখানা, এবং দুই হচ্ছে এখানকার মৃত্যুর হার। মৃত্যুর হার ছিল খুবই কম এবং জেলখানাটা ছিল খুবই ছোট। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানকার জলবায়ু ছিল খুবই স্বাস্থ্যকর এবং অপরাধ টপরাধ এখানে বিশেষ হত না।

এখন, যে শহরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা এত ভাল সেখানকার মৃত্যুদন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সেই পুরোন পদ্ধতিতে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর অর্থ দড়ির অপচয় করা। এর মধ্যে আবার খবর আসতে শুরু করল পুবদিকের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সেখানে অপরাধীদের পটলোৎপাদনের জন্য ইলেকট্রিক শক দেয়া হচ্ছে, যদিও সবসময়েই যে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে তা নয়। ফলে এদিককার ইঞ্জিনিয়ারদের চোখ সব কপালে উঠে গেল যখন তারা শুনল কত কম শক দিয়ে, কত সামান্য শক দিয়ে এইসব লোকগুলোকে খতম করা হয়েছে। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, লস অ্যামিগোসে যদি এমন কোন সংশোধনের অযোগ্য অপরাধী পাওয়া যায় যার প্রাণদন্ড হবে, তবে তাকে ইলেকট্রিক শক খাইয়েই মারতে হবে। এর ফলটা যে কী হবে সে সম্বন্ধে কারো ঠিক পরিষ্কার ধারণা ছিল না, শুধুমাত্র এটা ছাড়া যে ব্যাপারটা হবে বিস্ফোরক এবং প্রাণঘাতী। এর আগে কখনোই কাউকে ইলেকট্রিক শক খাইয়ে এখানে মারা হয় নি। কাজেই কাউকে যদি দশখানা বজ্রপাতের সমান শক দেওয়া হয় তাহলে কী হবে, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত শোনা

গেল। কেউ বলল, শক দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কেউ বলল মানুষটা একেবারে ভ্যানিশ হয়ে যাবে।

সবাই যখন হাতেকলমে ব্যাপারটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক সেই সময়েই রঙ্গমঞ্চে এসে উদয় হল কুখ্যাত অপরাধী ডানকান ওয়ার্নার। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ওয়ার্নারকে পুলিশ বহুদিন ধরেই খুঁজছিল। মনুষ্যসমাজে বসবাসের অযোগ্য এই ওয়ার্নার ছিল খুনি, ডাকাত, ট্রেন ছিনতাইনাজ, রাহাজান। ও যা যা অপরাধ করেছিল তাতে ওর বহুবার প্রাণদন্ড হওয়া উচিত ছিল। লস অ্যামিগোসের লোকেরাও তাই মনে করত।

ওয়ার্নার ছিল শক্তিশালী। পেশিবহুল চেহারা, মাথায় কালো চুলের গোছা, চৌকোণা মুখ, সেই মুখে একরাশ দাড়ি, যা নেমে এসে তার চওড়া বুকের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছিল। তার বিচার চলাকালীন ভিড়ে ঠাসা কোর্টে তার চেয়ে সুন্দর চেহারা আর একটাও ছিল না। কিন্তু তার চেহারা বা বিনম্র চাহনি দিয়ে সে তার অপরাধগুলোকে চাপা দিয়ে রাখতে পারে নি। তার উকিল যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ডানকান ওয়ার্নারের সাজা হয়ে গেল। কী সাজা? আবার কী? লস অ্যামিগোসের বৃহদাকার ডায়নামোর ইলেকট্রিক শক।

এ ব্যাপারটা নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, তখন আমি কমিটিতে ছিলাম। পুরো ব্যাপারটা দেখার জন্য টাউন কাউন্সিল চারজন বিশেষজ্ঞের একটা কমিটি গঠন করেছিল। তাদের মধ্যে তিনজন যথেষ্ট নামডাকওয়ালা। একজন হলেন জোসেফ এম কনর, যিনি এই ডায়নামোর ডিজাইন করেছিলেন, ছিলেন জোশুয়া ওয়েস্টম্যাকট, লস অ্যামিগোস ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান। আমি ছিলাম ডাক্তার হিসেবে। আর ছিলেন একজন বয়স্ক জার্মান, তাঁর নাম পিটার স্টালপনাজেন। লস অ্যামিগোসে প্রচুর জার্মান ছিল এবং তারা সবসময়েই তাদের নিজেদের লোককেই ভোট দিত। সেই কারণেই এই জার্মান ভদ্রলোকটি কমিটিতে জায়গা পেয়েছিলেন। এই ভদ্রলোক নাকি একজন চমৎকার ইলেকট্রিশিয়ান। তিনি বিদ্যুৎপরিবাহী তার, ইনসুলেটর, লেডন জার এসব নিয়ে বেশ ভালই কাজটাজ করেন, যদিও বড় কোন ক্ষেত্রে তাঁর কাজের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। যাহোক, তিনি এই কমিটিতে এসেছিলেন স্রেফ ভোটের জোরে, শখের বিজ্ঞানি এই পরিচয়ে। এহেন একজন লোক কমিটিতে আসায় আমরা হেসেই ফেললাম এবং তাঁকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে আমাদের কাজকর্ম সব ঠিকঠাক করে ফেললাম। তাঁর কানের একটু সমস্যা থাকায় তিনি কানে হাত দিয়ে আমাদের কথাবার্তাগুলোই শুধু শোনবার চেষ্টা করে গেলেন, পেছনে বসা সাংবাদিকদের মতই, যারা দ্রুতহাতে আমাদের আলোচনার নোট নিচ্ছিল।

সবকিছু ঠিকঠাক করতে বেশি সময় লাগল না। নিউ ইয়র্কে দুহাজার ভোল্টের শক দিয়েও মৃত্যু সঙ্গেসঙ্গে হয় নি। অতএব বোঝা গেল অত কম ভোল্টের শকে কাজ হবে না। কাজেই আমরা লস অ্যামিগোসের লোকেরা, সেই ভুলটা করতে পারি না। শকটা দেয়া উচিত ওর থেকে ছ গুণ বেশি হারে, যাতে ফলটাও তার চেয়ে ছ'গুণ বেশি হয়। কাজেই ঠিক হল, লস অ্যামিগোসের বিশাল ডায়নামোতে যত বিদ্যুৎ আছে তার পুরোটাই চার্জ করা হবে ওই ডানকান ওয়ার্নারের ওপরে।

সবকিছু ঠিকঠাক, মিটিং শেষ, আমরা তিনজন প্রায় উঠে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময়

আমাদের চতুর্থ সদস্য, সেই জার্মান ভদ্রলোক, এতক্ষণ ধরে যিনি চুপচাপ সবকিছু শুনে যাচ্ছিলেন, তিনি এই প্রথমবারের জন্য মুখ খুললেন।

"মশাইরা," তিনি বললেন, "ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে আপনাদের জ্ঞানগম্যি একটু কম আছে বলে মনে হচ্ছে। মনুষ্যদেহের ওপরে এর কী প্রভাব, সে ব্যাপারে তড়িৎপ্রবাহের প্রথম নীতিটাই তো আপনারা ভুলে যাচ্ছেন!"

সবাই স্তম্ভিত। কমিটির সবাই একযোগে এরকম বিশ্রী মন্তব্যের উত্তর দেবার জন্য ফেটে পড়তে যাচ্ছে, তখন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির চেয়ারম্যান সবাইকে থামিয়ে দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে বক্তার দিকে তাকালেন। "তাই নাকি? বললেন খিটকেল হেসে, "আমাদের বক্তব্যের কোন জায়গাটা আপনাদের গন্ডগোল লাগছে?"

"ওই যে আপনারা বললেন বেশি ভোল্টের শক দিলেই বেশি কাজ হবে? আপনাদের কি মনে হচ্ছে না যে এতে সম্পূর্ণ অন্যরকম ফল হতে পারে? আপনারা ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় এত বেশি পরিমাণ শক দিলে কী হয় সে সম্বন্ধে জানেন কিছু?"

"যুক্তিতে তাই বলে," তৎক্ষণাৎ বললেন চেয়ারম্যান, "ওষুধের ডোজ বাড়ালে যেমন হয়। এইযেমন ধরা যাক--

"হুইস্কি," বললেন জোসেফ এম কনর।

"ঠিক। হুইস্কি। এবার কী বলবেন?"

পিটার স্টালপনাজেন হেসে মাথা নাড়লেন, "আপনাদের যুক্তিটা বিশেষসুবিধের নয়," বললেন তিনি, "দেখা গেছে যে, এক গ্লাস হুইস্কি খেলে একটা চনমনে ভাব হয়। কিন্তু কেউ যদি দু গ্লাস একসাথে খায় সে সটান ঘুমিয়ে পড়বে, যেটা চনমনে ভাবের একেবারে উলটো। এখন ধরা যাক ইলেকট্রিসিটিতেও সেরকম উলটো ব্যাপার ঘটল। তখন?"

আমরা তিন সদস্য হাসিতে ফেটে পড়লাম। শুনেছিলাম আমাদের চতুর্থ সদস্যটি একটু খামখেয়ালি। কিন্তু উনি যে এ'রকম খ্যাপা তা তো জানতাম না!

"কীহল? কিছু বলছেন না যে?" আবার বললেন পিটার স্টালপনাজেন।

"বলার আবার কী আছে?" বললেন চেয়ারম্যান, "আমরা ওটাই করব।"

"ভেবে দেখুন,"বললেন পিটার, "যেসব লোকজন কাজ করতে গিয়ে তারে হাত ছুঁইয়ে ফেলে, বা সামান্য ভোল্টের শক খায়, তারা তক্ষুণি মারা যায়। এগুলো সবারই জানা। কিন্তু নিউ ইয়র্কে যখন একজন ক্রিমিনালের ওপর বেশি ভোল্টের শক দেয়া হল, সে খানিকক্ষণ ছটফট করে তারপর মরল। এর থেকে কি এটাই প্রমাণ হচ্ছে না যে কম ভোল্টের শক অনেক বেশি প্রাণঘাতী?"

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মনে হচ্ছে আমরা এই বিষয়টাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করছি," বললেন চেয়ারম্যান, "কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী ডানকান ওয়ার্নারকে মঙ্গলবার ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো হবে। লস অ্যামিগোসের ডায়নামোর পূর্ণশক্তির বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে। ঠিক আছে?"

"ঠিক", বললেন জোসেফ এম কলর।

"ঠিক",বললাম আমি।

"আমি বিরুদ্ধাচরণ করছি," বললেন পিটার স্টালপনাজেন।

"ঠিক আছে। পদ্ধতিটা চালু থাকল। আপনার আপত্তি কার্যবিবরণীতে লেখা থাকবে," বললেন চেয়ারম্যান। সভা ভেঙে গেল।

প্রাণদন্ডের দিন উপস্থিত হলাম আমরা মাত্র কয়েকজন। আমরা কমিটির চারজন ছিলাম অবশ্যই। ঘাতক ছিল, যে আমাদের আদেশ মান্য করবে। ইউনাইটেড স্টেটসের মার্শাল ছিলেন, জেনারেল গভর্নর ছিলেন, যাজক ছিলেন, আর ছিলেন জনাতিনেক সাংবাদিক। যে ঘরে প্রাণদন্ড কার্যকর করা হবে সে ঘরটা ছিল ইঁটের তৈরি ছোট্ট একটা কুঠুরি। সেন্ট্রাল ইলেকট্রিকাল স্টেশনের একপাশে। এটা একটা লন্ড্রি হিসেবে ব্যবহার করা হত। ঘরে একটা উনুন আর একটা পাত্রও রয়েছে। কিন্তু আর কোন আসবাবপত্র নেই একটা চেয়ার ছাড়া, যেখানে আসামীকে বসানো হবে। চেয়ারটার সামনে একটা তার জড়ানো ধাতুর প্লেট রয়েছে যেখানে আসামি পা রাখবে। ওপর থেকে একটা তার ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আসামির মাথায় যে টুপিটা পরানো হবে তার থেকে একটা ধাতব রড উঁচু করা আছে, এই তারটা যোগ করা হবে তার সঙ্গে। এই সংযোগটা করা হয়ে গেলেই বুঝতে হবে ডানকান ওয়ার্নারের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ঘরে নেমে এসেছিল একটা বিষণ্নতার ছায়া। যেসব ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছিল, তাদের মুখচোখ শুকনো লাগছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে তারা তারগুলো জোড়া লাগাচ্ছিল। এমনকি শক্তধাতের মার্শালকেও অস্থির মনে হচ্ছিল। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। কারণ গতানুগতিক ফাঁসিতে ঝোলানো এক জিনিস, আর বৈদ্যুতিক শক দিয়ে রক্তমাংসের বিস্ফোরণ আরেক জিনিস। সাংবাদিকদের হাল আরও খারাপ। তাদের চোখমুখের রং দেখাচ্ছিল তাদের সামনে রাখা কাগজের থেকেও সাদা। কেবলমাত্র একটি লোকেরই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখছিলাম না। তিনি হচ্ছেন সেই ছোটখাট জার্মান

ভদ্রলোক, যিনি এপাশ থেকে ওপাশে পায়চারি করছিলেন চোখে মজার আমেজ আর ঠোঁটের কোণায় হাসি ঝুলিয়ে। বেশ কয়েকবার তিনি এমন জোরে হেসে উঠলেন যে শেষপর্যন্ত যাজকমহাশয় তাঁকে ডেকে ধমকাতে বাধ্য হলেন।

"কী ব্যাপার মি স্টালপনাজেন? একজনের মৃত্যু হবে জেনে আপনার খুব মজা লাগছে মনে হচ্ছে?"

জার্মান ভদ্রলোক টসকালেন না। "যদি সত্যিই কারো মৃত্যু আসন্ন হত তাহলে আমি হাসতাম না," বললেন তিনি, "কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, তখন আমি যা খুশি করতে পারি।"

এর উত্তরে যাজক কড়া গলায় আরেকটা কি বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলে ভেতর ঢুকল দুই ওয়ার্ডার। তাদের মাঝখানে ডানকান ওয়ার্নার। সবার দিকে একঝলক দেখে নিয়ে গটগট করে হেঁটে গিয়ে সে বসে পড়ল চেয়ারে।

"চালিয়ে দাও," বলে উঠল সে।

তাকে শুধু শুধু বসিয়ে রাখা একটা জঘন্য ব্যাপার। যাজক তার কানের কাছে কিছু মন্ত্রবাক্য পাঠ করলেন। একজন লোক তার মাথায় টুপিটা বসিয়ে দিল এবং তারপর, আমাদের দমবন্ধ অবস্থায়, কারেন্ট চালিয়ে দেয়া হল সেই ধাতুর মধ্যে দিয়ে।

"বাবা গো!" চেঁচিয়ে উঠল ডানকান ওয়ার্নার। সেই ভয়ংকর শক তার শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ধড়ফড় করে উঠেছে চেয়ারের মধ্যে, কিন্তু মরে নি। বরং তার চোখের দৃষ্টি যেন একটু বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। পরিবর্তন একটা হয়েছে এবং সেটা আশ্চর্য। তার চুল আর দাড়ির ঘন কৃষ্ণবর্ণ কোথাও উধাও হয়ে গেছে। তার জায়গায় সেগুলো এখন বরফের মত সাদা। আর

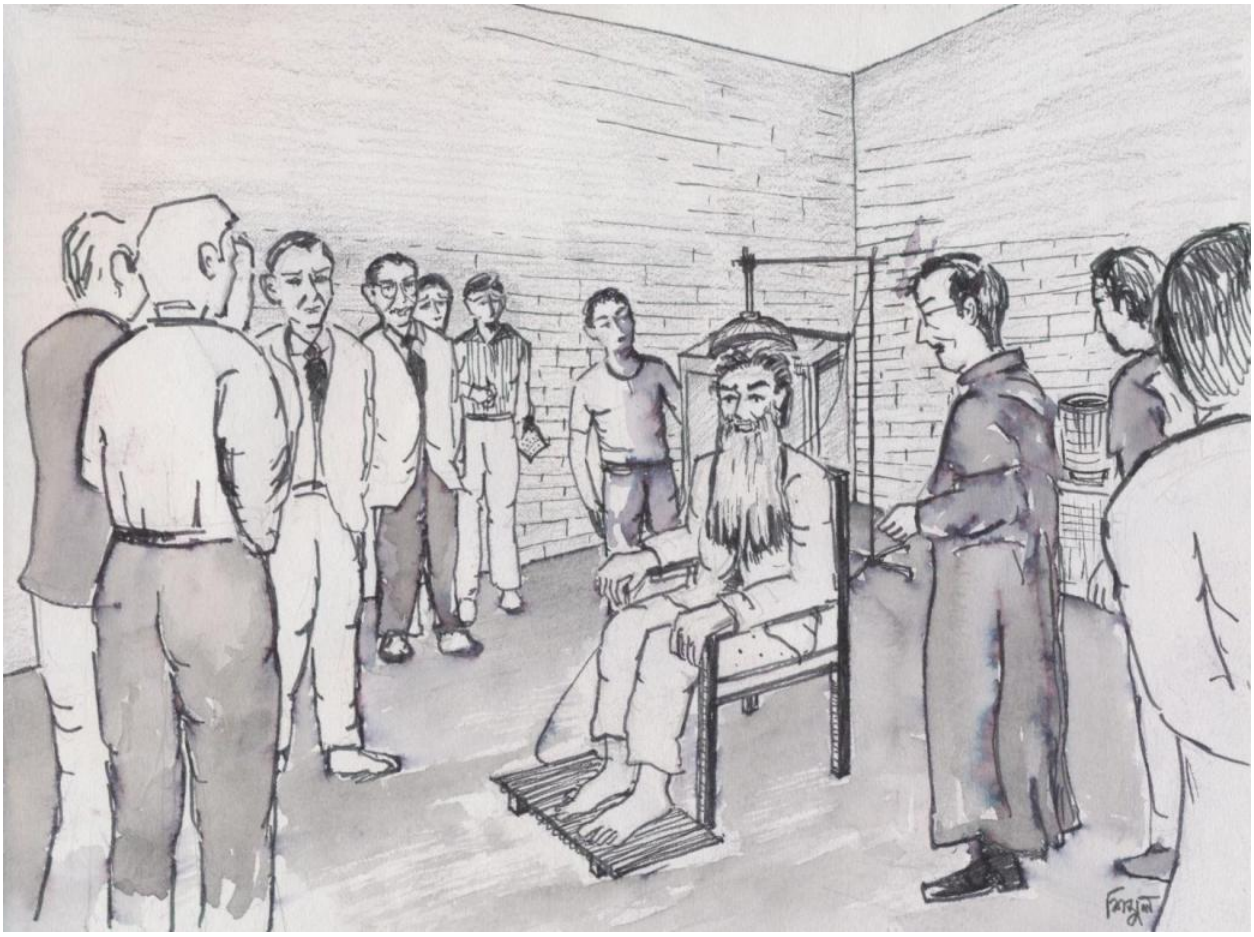

কোথাও কোন ক্ষয়ের চিহ্ন নেই। তার গায়ের চামড়া হয়ে গেছে শিশুদের মত মোলায়েম এবং মসৃণ।

মার্শাল, কমিটির সদস্যদের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন, "কিছু গন্ডগোল হয়েছে মনে হচ্ছে?"

আমরা তিনজন এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। পিটার স্টালপনাজেল মুচকি হাসলেন।

"আরেকটা শক দিলে কাজ হবে মনে হয়," আমি বললাম। আরেকবার শক দেয়া হল এবং যথারীতি ডানকান ওয়ার্নার একখানা চিৎকার ছেড়ে চেয়ারের মধ্যেই লাফিয়ে উঠল। কিন্তু এবারে যা ঘটল, তাতে সে যদি চেয়ারের মধ্যে না থাকত, তাহলে তাকে আমরা চিনতে পারতাম না। তার চুলদাড়ি সব খসে পড়েছে মেঝেতে, ঘরটা যেন মনে হচ্ছে শনিবারের নাপিতের দোকান। সে বসে আছে চেয়ারে, মাথায় সম্পূর্ণ টাক, গাল দেখে কোনদিন সেখানে দাড়ি ছিল বলে মনে হচ্ছে না। চোখ সেইরকম ঝকঝক করছে, চামড়া দারুণ উজ্জ্বল, যেন স্বাস্থ্যও দারুণ ভাল হয়ে গেছে। অবাকভাবে সে তার একটা হাত নাড়ল, প্রথমে ধীরে ধীরে, অবিশ্বাসে, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

"গাদা গাদা ওষুধ খেয়েও আমার এই গাঁটের ব্যথাটা কমে নি।" বলল সে, "এখন দেখছি ব্যথাটা ভ্যানিশ। আহা চমৎকার লাগছে।"

"তোমার শরীর ঠিক আছে?" জিজ্ঞেস করলেন জার্মান ভদ্রলোক।

"ঠিক আছে? এত সুস্থ জীবনে থাকিনি।" উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ডানকান ওয়ার্নার।

"এ কী কান্ড?" মার্শাল কমিটির সদস্যদের দিকে তাকালেন। পিটার স্টালপনাজেন দাঁত বের করে হাত কচলাতে লাগলেন। ইঞ্জিনিয়াররা ক্যাবলার মত মাথা চুলকোচ্ছে। কেশশূন্য আসামী খুশিতে হাত নাড়তে লাগল।

"আরেকবার শক দিয়ে দেখলে হয়না?" চেয়ারম্যান বললেন।

"নো স্যার," বললেন মার্শাল, "অনেক হয়েছে। যথেষ্ট বোকা বনেছি আমরা। এখানে আমরা এসেছি একটা প্রাণদন্ড কার্যকর করতে, সে কাজটা তো আমাদের করতে হবে!"

"তাহলে এখন আপনি কী করতে বলেন?"

"সিলিং- এ একটা হুক আছে। দড়ির ফাঁস দিয়ে ব্যাটাকে ঝুলিয়ে দিন। ল্যাঠা চুকে যাক।"

দড়ি খুঁজতে গিয়ে বেশ খানিকটা সময় গেল। সেই ফাঁকে পিটার স্টালপনাজেন ডানকান ওয়ার্নারের দিকে ঝুঁকে তার কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। দুর্বৃত্ত ওয়ার্নার অবাক হয়ে তাকাল।

"বলেন কী?" বলল সে। জার্মান ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

"সত্যি? কোন উপায় নেই?"

পিটার ঘাড় নাড়লেন এবং পরমুহূর্তেই দুজনে হাসিতে ফেটে পড়ল, যেন বিরাট কোন মজার ব্যাপার হয়েছে।

দড়ি আনার পর মার্শাল নিজে ফাঁস পরিয়ে দিলেন ওয়ার্নারের গলায়, তারপর দুজন সহকারী এবং মার্শাল- সবাই মিলে তাকে ঝুলিয়ে দিল সিলিং থেকে। আধঘন্টার ওপর ঝুলে রইল সে। ঘরে সবার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল এই বিভৎস দৃশ্য দেখে। তারপর তাকে নামিয়ে আনা হল মেঝেতে। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, মেঝে ছোঁয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ডানকান ওয়ার্নার নিজেই হাত দিয়ে তার গলার দড়ি খুলে ফেলল, একটা শ্বাস নিল বড় করে।

"পল জেফারসনের বিক্রিবাটা বেশ ভালই চলছে," বলল সে, "ওপর থেকে ভিড়ভাট্টা বেশ ভালই দেখলাম," সে সিলিং- এর দিকে তাকাল।

"ওকে আবার ঝোলাও!" চিৎকার করে উঠলেন মার্শাল, "ওর প্রাণ বের করে নাও।"

সঙ্গেসঙ্গেই আবার ওয়ার্নারকে ঝুলিয়ে দেয়া হল। এবারে ওকে একঘন্টা ঝুলিয়ে রাখা হল। কিন্তু যখন ওকে আবার নামানো হল, সে আগের মতই চাঙ্গা।

"প্লাংকেট বুড়ো ঘন ঘন আর্কাডি সেলুনে যাচ্ছে দেখছি," বলল সে, "একঘন্টার মধ্যে তিনবার

গেল পরিবার নিয়ে। এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি।"

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। যে লোকটার মরে যাওয়ার কথা, সে দিব্যি কথা বলছে। আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে আছি, কিন্তু মার্শাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তিনি এবার আমাদের সবাইকে একপাশে সরিয়ে দিলেন। ডানকান ওয়ার্নার রইল আরেকপাশে।

"ডানকান ওয়ার্নার," চিবিয়ে চিবিয়ে ধীরে ধীরে বললেন তিনি, "তুমি এখানে এসেছ তোমার খেলা খেলতে, আমি আমার। তুমি চাইছ যতক্ষণ পারো বেঁচে থাকতে, আমি চাইছি আইনের নামে তোমার প্রাণদন্ড দিতে। ইলেকট্রিক শকে তোমার কিছু হয় নি। তুমি আমাদের ফাঁকি দিয়েছ। ফাঁসির দড়িতে তোমার কিছু হয় নি। দড়িতে ঝোলানোয় তোমার ফুর্তি যেন আরো বেড়ে গেছে। কিন্তু এবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, কারণ আমার কর্তব্য আমায় করতেই হবে।"

বলার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি কোটের পকেট থেকে একটা ছ ঘরার বন্দুক বের করে সবক'টা গুলি চালিয়ে দিলেন তার দিকে তাক করে। ধোঁয়ায় ভরে গেল ঘর আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে। কিন্তু যখন ধোঁয়া কেটে গেল, দেখলাম বন্দি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তার কোটের সামনের দিকটা অবিশ্বাসের চোখে দেখছে।

"আপনাদের ওখানে কোট সস্তা হতে পারে," বলল সে, "কিন্তু আমাকে তো তিরিশটা ডলার খরচ করে কোটটা কিনতে হয়েছে! দেখুন এর অবস্থাটা! সামনে ছটা ফুটো হয়ে গেল। অবশ্য পেছন দিয়ে চারটে গুলি বেরিয়েছে। কাজেই পেছনদিকের অবস্থাটা বোধ হয় এতটা খারাপ নয়।"

মার্শালের হাত থেকে রিভলভার খসে পড়ল। হাতদুটো ঝুলে পড়ল দুপাশে, রামধোলাই খাওয়া মানুষের মত।

"এসবের মানে কী? বলতে পারবেন কেউ?" কমিটির সদস্যদের দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বললেন তিনি।

পিটার স্টালপনাজেন একটু এগিয়ে এলেন।

"আমি বলতে পারি," বললেন তিনি।

"মনে হচ্ছে আপনিই এই ঘটনার পুরো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।"

"ঠিক তাই। আমি পুরো ব্যাপারটাই জানি। এবং সে কারণেই আমি এই ভদ্রমহোদয়গণকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু ওঁরা শুনলেন না। তখন আমি ভাবলাম, "ঠিক আছে, ওঁরা নিজেরাই পরখ করে দেখুন। আপনারা ইলেকট্রিক শক দিয়ে এ লোকটার যা করলেন তাতে ওর জীবনীশক্তি এত বেড়ে গেল যে ও কয়েকশো বছরেও মরবে না।"

"কয়েকশো বছর!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দুরন্ত এনার্জি ওর স্নায়ুমন্ডল থেকে বেরোতে কয়েকশো বছর লেগে যাবে। বিদ্যুৎ হল জীবন। আর সেটাই আপনারা ওর শরীরে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। হয়ত বছর পঞ্চাশ বাদে আপনারা ওকে মারতে পারবেন। তবে আমি নিশ্চিত নই।"

"যাচ্চলে! তাহলে ওকে নিয়ে এখন আমি কী করব?" মার্শাল প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি।

পিটার স্টালপনাজেন কাঁধ ঝাঁকালেন, "ওকে নিয়ে কী করবেন তা ভেবে এখন আর কী হবে?"

"আচ্ছা ওকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিলে হয় না? যদি তাতে ওই এনার্জিটা বেরিয়ে যায়?"

"না না, তার কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

"ঠিক আছে। ও যাতে লস অ্যামিগোসের আর কোনও ক্ষতি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করছি," মার্শাল সিদ্ধান্ত নিলেন,"ওকে নতুন জেলে পাঠাতে হবে। এখানকার কয়েদখানা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়।"

"অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটাই সম্ভব যে ও- ই কয়েদখানার পক্ষে নিরাপদ নয়, কারণ কয়েদখানা ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু ও নয়," বললেন পিটার স্টালপনজেন।

এই প্রহেলিকার কথা আমরা দীর্ঘদিন আলোচনা করিনি, কিন্তু এখন আর এটা গোপন নেই, তাই আপনাদেরও এটা জানা উচিৎ।

ছবিঃ শিমুল সরকার

সম্পাদকের দফতর থেকেঃ ব্যাপারটা সত্যিই প্রহেলিকা কিন্তু। সাধারণ মানুষের পক্ষে অমন ইলেকট্রিক শক খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। লোকটা বোধ হয় ভিনগ্রহীটহী কিছু ছিল। কী বলো?।

তোমরাও ভালো থেকো

দীপক দাস

'তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে' গানটার দুটো মাত্র চরণ গেয়েছে সৃজ, অমনি মেজদা চেঁচিয়ে উঠল, "তুমিটা কে রে সৃজ? মন্ত্রীমশাই নাকি? বাব্বা! এতো রীতিমত জমিদারতন্ত্র যুগের ব্যবস্থা! জমিদার গ্রাম দর্শনে এলে এই রকম গানটান গেয়ে স্তোত্র পাঠ করে স্বাগত জানানো হত। মন্ত্রীরা এখন জমিদারের জায়গা নিয়েছে নাকি রে?"

মেজদা খোঁচাচ্ছে দেখে বড়দাও এসে যোগ দিল। বলল, "নিয়েছে মানে! তোর কি কোনও সন্দেহ আছে মেজ? তবে এখন আর জমিদারি আমলের মত স্তোত্রপাঠ হয় না। চক্ষুলজ্জার একটা ব্যাপার আছে তো! কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রবি ঠাকুর বা অতুলপ্রসাদী গানের মোড়কে সেই বন্দনাই করা হয়। কী বলিস সৃজ?"

"সৃজ, মন্ত্রীমশাই কী করে নির্মল করবেন রে গাছ লাগিয়ে?" মেজদা আবার খোঁচায়। এবার রেগে যায় সৃজ, "গানটা মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে গাওয়া নাকি? বনসৃজনের অনুষ্ঠানে 'তুমি নির্মল কর' গানটার মত সুন্দর গান আছে?"

জবাবে দুই দাদা সমস্বরে এমনভাবে 'ও তাই' বলে যে সৃজ রেগেমেগে উঠে পড়ে।

পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গ্রামের দুটো স্কুল পাতিহাল দামোদর আর পাতিহাল বালিকা বিদ্যালয় যৌথভাবে বনসৃজনের উদ্যোগ নিয়েছে। ওই দিন একটা অনুষ্ঠান হবে। তারপর প্রধান অতিথি পরিবেশ মন্ত্রী মোহন্ত সরকার নতুন তৈরি হওয়া বড়গাছিয়া ফিডার রোডের দু'পাশে বনসৃজন কর্মসূচির উদ্যোগ করবেন। অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীত গাওয়ার দলে সৃজ অষ্টম শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি। তাই স্কুল যাওয়ার আগে একটু রেওয়াজ করে নিচ্ছিল। দাদাদের জ্বালায় উঠে পড়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করে।

স্কুলের যাওয়ার পথে মিলির সঙ্গে দেখা। মিলিও আছে গানের দলে। সৃজ মিলিকে জিজ্ঞাসা করে, "আজ রেওয়াজে আসছিস তো?" মিলি হ্যাঁ বলল। রেওয়াজটা একদিন মেয়েদের স্কুলে হয় আর একদিন ছেলেদের স্কুলে। কালকেই ৫ জুন। চূড়ান্ত রেওয়াজটা হবে সৃজদের স্কুলে। কিন্তু মূল অনুষ্ঠানটা হবে বালিকা বিদ্যালয়ে। মিলিদের স্কুলটা ফিডার রোডের একদম গায়ে।

সৃজ স্কুলে গিয়ে দেখে সুনীলবাবু উত্তেজিত হয়ে মোবাইলে কার সঙ্গে কথা বলছেন। টুকরো কিছু কথা কানে এল। কোনও বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন স্যার, "না না ইউক্যালিপটাস গাছ একদমই চলবে না। আমি যে তালিকা দিয়েছিলাম সেই গাছগুলিই চাই।" সৃজ বুঝল নার্সারির সঙ্গে কথা হচ্ছে। সুনীলবাবুই পুরো অনুষ্ঠানটার মূল দায়িত্বে।

স্যারের ফোন করা হয়ে গিয়েছিল। সৃজ জিজ্ঞাসা করল, "ইউক্যালিপটাস গাছ আনতে বারণ করলেন কেন? রাস্তার পাশে তো ওই গাছই লাগানো থাকে।" সুনীলবাবু হেসে বললেন, "ইউক্যালিপটাস গাছ মাটি থেকে প্রচুর জল শোষণ করে মাটি শুকনো করে দেয়। আশেপাশের অন্য গাছগুলির বাঁচা খুব মুশকিল। তুই কি তোর কাজগুলো গুছিয়ে রেখেছিস?" সৃজ মাথা নেড়ে ক্লাসের দিকে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে ভাবে স্যারের কতোদিকে নজর। অন্যরা বলেছিলেন ইউক্যালিপটাস, বাবলা, আকাশমণি লাগাতে। স্যারের যুক্তি ছিল, এই গাছগুলির ব্যবহারিক বা সৌন্দর্যের দিকে কোনও ভূমিকা নেই। তেমন ছায়াও হয় না। বাবলা কাঁটাগাছ। পরে পথচারীদের অসুবিধা হতে পারে। আমার মত, পলাশ, সোনাঝুরি, সপ্তপর্ণী, বকুল, কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগানো হোক। এদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ আছে। গাছগুলোর ফাঁকে কিছু বকফুল আর সজনে গাছ লাগানো যেতে পারে। এই গাছগুলি লাগানো হবে সর্দারপাড়া আর হাড়িপাড়ার কাছে। ওদের চরম দুরবস্থা। বকফুল বা সজনের ফুল- ফল দুটোই তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ওদের সবজির কিছুটা অভাব মিটবে। সকলে মেনে নিয়েছিলেন।

যারা অনুষ্ঠানে অংশ নেবে তাদের টিফিনের পরে ছুটি হয়ে গেল। সৃজ হলঘরে এসে দেখে মিলি, পিকা, টিনারা হারমোনিয়াম নিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে। মিলির গান ছাড়া নাচও আছে। ও প্রকৃতিদেবী সাজবে। ওদের তত্ত্বাবধায়ক মৌসুমীদিও এসেছেন।

ঘন্টা তিনেক অনুশীলন চলল।

একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিল সবাই। কাল কে কী পরবে তাই নিয়ে আলোচনা। মিলি বলছিল একেবারে নাচের পোশাক পরেই চলে আসবে। পিকা বলল, "তোর তো গান আগে। নাচের পোশাক পরেই গান গাইবি? ভালো লাগবে?"

মাঠে দুরন্ত ফুটবল শুরু হয়েছে বিকালবেলা। রোজ বিকেলে নবারুণ ক্লাবের মাঠে দাপাদাপি করে সৃজরা। ক্রিকেটের সময় ক্রিকেট, ফুটবলের সময় ফুটবল। আজ দু'দলে ভাগ হয়ে ফুটবল চলছিল। এক গোলে পিছিয়ে ছিল বলে তেড়েফুঁড়ে খেলছিল চিরঞ্জিত। কাউকে বল পাস করতে চাইছিল না। হঠাৎ গোলমুখের কাছে গিয়ে এমন জোরে একটা শট নিল, বলটা উড়ে গিয়ে পড়ল একটা বনে। ওই বনটা পঞ্চায়েতের জায়গা। বছর তিনেক আগে কালকে যিনি আসবেন সেই পরিবেশ মন্ত্রীকেই আনিয়ে বনসৃজন করা হয়েছিল। এখন জঙ্গল হয়ে গিয়েছে জায়গাটা। সৃজদের কতো ক্রিকেট বল হারিয়েছে ওর মধ্যে!

একটা গাছের গোড়ার ঝোপে বল খুঁজছিল সৃজ। হঠাৎ যেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার মত শব্দ কানে এল সৃজর। প্রচন্ড পরিশ্রমে আর বেদনায় মানুষ যেমন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই রকম। মনে হল, গাছটাই যেন শ্বাস ফেলল। চমকে উঠে সৃজ গাছের গোড়া থেকে সরে এল। ঝোপে কেউ লুকিয়ে আছে নাকি? ঠিক তখনই পাশের ঝোপ থেকে চিৎকার করে উঠল দীপু। কাঁটা ঝোপে পড়ে বলটা লিক হয়ে গিয়েছে। হু হু করে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। দীপু বলটা ঝোপ থেকে বের করতেই শব্দটা কানে এল সৃজর। যাঃ! আজকের মত খেলা শেষ। মন খারাপ হয়ে গেল সবার।

মাঠে ফিরে এসে গোল হয়ে বসে পড়ল সবাই। এবার গল্প জমবে। কেতো সদ্য 'লর্ড অব দ্য রিং' সিনেমাটা দেখেছে। ও বেশ জমিয়ে শুরু করল। গাছেদের মানুষের মত হেঁটে বেড়ানো, কথা বলা। সৃজ চুপ করে বসে রইল। ওর কানে শব্দ ঢুকছে না। শুধু বলের হাওয়া পড়ার শব্দ পাচ্ছে। সত্যিই কি বলের হাওয়া পড়ার শব্দ? কিন্তু. . .

রাতে খাওয়ার সময় দুই দাদা আবার পেছনে লাগল সৃজর। বড়দা মাকে বলল, "জান তো মা, আমরা যদি সত্য বা ত্রেতা যুগে জন্মাতাম তাহলে কালকেই বড়লোক হয়ে যেতাম।" মা অবাক হলেন। সত্যযুগের সঙ্গে বড়লোক হওয়ার সম্পর্ক কী? দাদা হাসতে হাসতে বলল, "তাও জান না? সৃজ যেভাবে গাছেদের সেবা অনুষ্ঠানে ক্ষেপে উঠেছে তাতে কোনও বৃদ্ধ গাছ হয়ত খুশি হয়ে বলত, 'আমার কোটরে মোহর ভরা থলে আছে, নিয়ে যাও।' ব্যস! আমরা বড়লোক।"

মেজদা সঙ্গে সঙ্গে যোগ দেয়, "কলিযুগে গাছেরা কথা বলতে ভুলে গিয়েছে তো, তাই আমরা মোহর পাচ্ছি না।" শুনেই সৃজ রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর খাবার ছেড়ে উঠে পড়তে যায়। মা এতক্ষণ তিন ছেলের কথার খেলার মজা দেখছিল। সৃজকে উঠে পড়তে দেখে বুঝল বিষয়টি আর মজার নেই। মা তাড়াতাড়ি ওকে আটকাল। হেসে বলল, "আরে পাগলা, কেউ রাগলে যত রাগবি ততই তোকে আরও বেশি রাগাবে।" সৃজ রাগে থমথমে হয়ে খেয়ে নেয়।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বেই বলে ভাবছিল। কাল তাড়াতাড়ি উঠে কিছু কাজ সেরে রাখতে হবে। কিন্তু শুতেও ইচ্ছা করছে না। একবার ভাবল, 'লর্ড অব দ্য রিং' ছবিটা দেখবে। সিডিটা যে আবার মেজদার কাছে। দুই দাদার উপরে যা রাগ জমেছে সকাল থেকে, সিডি চাইতে যেতে ইচ্ছা করল না। র‍্যাক থেকে জ্যাক লন্ডনের 'কল অব দ্য ওয়াইল্ড' বইটা টেনে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। একসময় মশগুল হয়ে গেল গল্পে। প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল গল্পটা। বাক নামের কুকুরটা জঙ্গলে চলে গিয়েছে। ঠিক তখনই কানে এল আওয়াজটা। সেই দীর্ঘশ্বাস। চমকে উঠল সৃজ। আওয়াজ মনে হল জানালার দিক থেকে এল। জানলার দিকে তাকাতে অবাক হয়ে গেল সৃজ। একটা ভাঙা ডাল। ওর পড়ার টেবিলে চলে এসেছে প্রায়। ডালটা কেমন যেন ফেটে ছড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু জানলার পাশে তো কোনও গাছ নেই! সৃজর ভয় ভয় করতে লাগল। বইয়ের আড়াল দিয়ে উঁকি মেরে জানলার দিকে তাকাল।

"কি যন্ত্রণা! উফ—"

এবার আর দীর্ঘশ্বাস নয়, স্পষ্ট কথা শুনতে পেল সৃজ। কেউ যেন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। গাছটা? তা কী করে হয়?

"সৃজ, আমাদের বড় কষ্ট!"

এ কী? নাম ধরে ডাকছে যে! বিস্ময়ের মাত্রা কাটতে না কাটতেই আবার ডাক, "আমাদের বাঁচাও সৃজ। ভয় পেও না, জানলার কাছে এস। সৃজ সাহস করে এগিয়ে গেল। একটা আকাশমণি গাছ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতেই গাছটা বলে উঠল, "আমাদের বাঁচাও সৃজ। আমরা আর পারছি না।"

"কীসের কষ্ট তোমাদের?"

"বেঁচে থাকার কষ্ট। আর বাঁচা যাবে না সৃজ। জল নেই। যে যখন খুশি পারছে কাটছে। চারপাশটা কি নোংরা। ছাগলে মুড়োচ্ছে। আমার ওই প্রতিবেশীকে দেখ। ছোটবেলায় ছাগলে খেয়ে নিয়েছিল। তারপর থেকে আর বাড়েইনি। ডাল- পাতাই তো মেলতে পারেনি। কীভাবে বেঁচে আছে নিজের চোখেই দেখ তুমি।"

সৃজ আকাশমণি গাছটার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। কিন্তু গাছটাকে খুঁজে পায় না। জানলার বাইরে গাছে গাছে ছয়লাপ। জঙ্গলের মতো ছায়া হয়ে আছে। গাছেরা বোধহয় সৃজর অসবিধা বুঝতে পারে। সবাই সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা করে দেয়। একটা বেঁটে মতো ডালপালা ছাঁটা গাছ এগিয়ে আসে। বাইরেটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। তবুও সৃজ বুঝতে পারল না,

কী গাছ ওটা। আকাশমণি গাছটা বলে, "ওটা বাক্স বাদাম গাছ। কতো বড় বড় হয় বাদাম গাছেরা, দেখেছ তো? ও কিন্তু তিন বছরে এতটুকুও বাড়েনি।"

"কিন্তু আমার কাছে এসেছ কেন তোমরা?"

"আমরা বাঁচতে চাই। জান তো একদিন খুব ধুমধাম করে আমাদের লাগানো হয়েছিল। মন্ত্রী এল। শাঁখ বাজল। মেয়েরা লাল সাদা শাড়ি পরে নাচগান করল। তারপরে কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। এক জায়গায় কতো গাছ। তার ওপরে ডাঙা জমি। জলের জন্য ছটফট করি। যে যখন পারে ডাল ভাঙে। দেখ, কালকেই এক বদ ছোকরা আমার একটা ডাল মুচড়ে ভেঙে নিয়েছে। আমাদের বাঁচাও সৃজ। আমাদের বাঁচাও।"

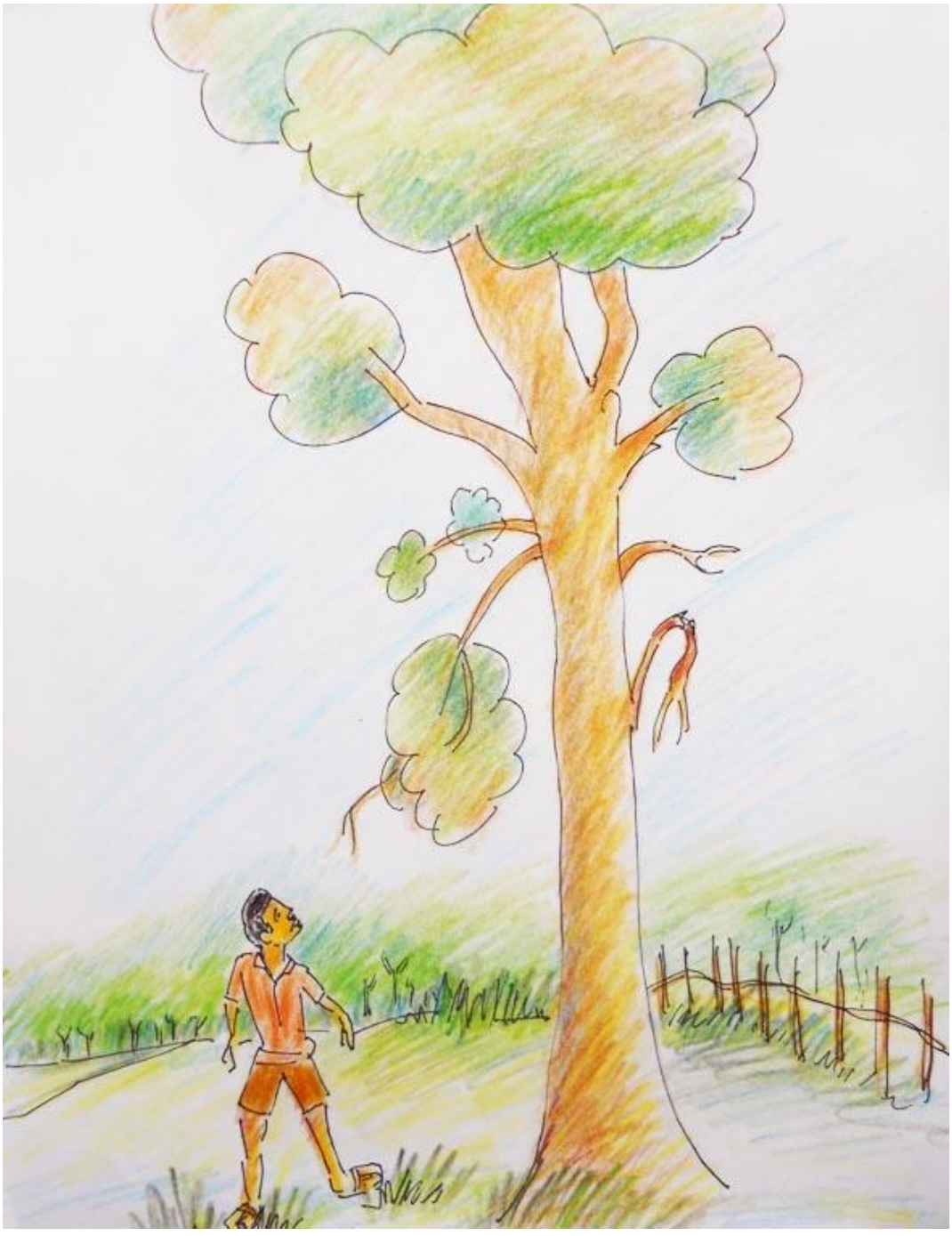

হঠাৎ মড়মড় শব্দে গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। আতর্নাদ করে উঠল গাছটা। ধড়মড় করে উঠে বসল সৃজ। তখনই দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা শুনতে পেল সে। তারপরেই মায়ের গলা, "আলো জ্বেলেই ঘুমিয়ে পড়েছিস। উঠে পড়, সৃজ। বেলা হয়ে গিয়েছে।"

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল নাকি? ছুটে জানলা কাছে গিয়ে দাঁড়াল সৃজ। টেবিলের উপরে আকাশমণির কতোগুলো পাতা পড়ে আছে। হাওয়াতেও আসতে পারে। কিন্তু আশেপাশে তো আকাশমণির গাছ নেই! মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল

সৃজর। গম্ভীর মুখে তৈরি হয়ে নিল ও। মা ভাবল, দাদাদের সঙ্গে ঝগড়ার ফল। দাদারা অবশ্য পড়তে চলে গিয়েছে। দাঁত মেজে আসার পরে বাবা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, "কি রে? রোজ দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া চলছে নাকি?" সৃজ সাড়াই দিল না। বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল।

অনুষ্ঠানে গিয়েও মন ভালো হল না। গাছগুলোর করুণ আতর্নাদ মনে পড়ছে। মিলি কী যেন বলতে এসেছিল। সৃজকে গম্ভীর দেখে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই চলে গেল। তখন মন্ত্রীমশাই এসে গিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা গান গাইল। বারবার তাল কেটে যাচ্ছিল বলে সৃজ শুধু ঠোঁট নেড়ে গেল। দুই স্কুলের প্রধান শিক্ষক- শিক্ষিকা বক্তব্য রাখলেন। সৃজর কানে একটা শব্দও ঢুকল না। গাছগুলোর আতর্নাদ ওর মন কুরে কুরে খাচ্ছে। হোক না স্বপ্ন। নিজের চোখেও তো দেখেছে মাঠে গিয়ে। মন্ত্রীমশাইয়ের বক্তৃতা শেষ হল। মিলিদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মন্ত্রীর হাতে একটা গাছের চারা তুলে দিলেন। মন্ত্রী চারা হাতে মঞ্চ থেকে নামতে যেতেই সৃজ চিৎকার করে উঠল, "আপনি আগে যে গাছগুলো লাগিয়েছিলেন তাদের কী হবে?"

একটা প্রশ্নতেই পুরো অনুষ্ঠানটার ছন্দপতন ঘটে গেল। মন্ত্রী থমকে গেলেন। হেডস্যারও অবাক। সৃজ ভাল ছেলে বলেই পরিচিত। ও যে এরকম আচরণ করতে পারে বিশ্বাস হচ্ছিল না স্যারের। সুনীলবাবু সৃজকে খুব ভালোবাসেন। উনিও ধমক দিলেন, "সৃজ বসে পড়।" কিন্তু মন্ত্রীমশাই নিজেই বাধা দিলেন সুনীলবাবুকে, "ওকে বলতে দিন স্যার। ভাই তুমি এদিকে এস।"

সৃজ মঞ্চে উঠে মন্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়াল। মোহন্তবাবু বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ সেটা আমি বুঝতে পারিনি ভাই। একটু বুঝিয়ে বলবে?"

"বছর তিনেক আগে আপনি এই পরিবেশ দিবসেই নবারুণ মাঠের পাশে বনসৃজন করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে ওই গাছগুলোর দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। গাছগুলো খুব কষ্টে আছে। ওদের না বাঁচিয়ে আবার গাছ লাগালে এই গাছগুলোরও তো একই অবস্থা হবে স্যার।"

মোহন্তবাবু চুপ থাকলেন কিছুক্ষণ। উপস্থিত দশর্করা কিছু বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে আছেন। যাঁরা সৃজকে চেনেন তাঁরা ফিসফিসিয়ে আলোচনা করছে, ও তো এমন বেয়াদব ছেলে নয়।

মন্ত্রীমশাই হেডস্যার আর পিকাদের হেডদির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেটি যে জায়গাটার কথা বলছে সেখানে যেতে চাই। আপনারা একটু সবাইকে বলবেন যে, বনসৃজন অনুষ্ঠানটা আজ সেখানেই করা হবে?"

পিকাদের হেডদি মাইকে ঘোষণা করলেন, "উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা দয়া করে নবারুণ মাঠের পাশে উপস্থিত হন। মন্ত্রীমশাই চান এবারের বনসৃজন অনুষ্ঠানটা সেখানেই হোক।"

****

অসাধারণ দৃশ্য দেখা গেল নবারুণ মাঠে। মন্ত্রী নিজেই কাটারি দিয়ে নোংরা সাফ করছেন গাছগুলোর পাশ থেকে। মাঠে উপস্থিত সবাই কিছু না কিছু করছে। কেউ বাঁশ দিয়ে বেড়া বানাচ্ছে, কেউ গাছের গোড়ায় জল এনে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জায়গাটা তকতকে হয়ে গেল। মোহন্তবাবু সৃজর কাঁধে হাত রেখে ঘোষণা করলেন, "এই গাছগুলো আর বড়গাছিয়া ফিডার রোডের ধারে যে গাছগুলো লাগানো হবে সেগুলোর দায়িত্ব থাকবে সৃজ আর ওর বন্ধুদের ওপরে। গাছ গরুতে খেলে বা কেউ কাটলে ওদের ক্ষমতা থাকবে জরিমানা করার।"

অনুষ্ঠানে এসেছিলেন পাতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানও। তাঁকে কাছে ডেকে মন্ত্রী নির্দেশ দিলেন, "সৃজদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার কথা যেন সারা গ্রামে একটা নোটিশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সৃজ একদম ঠিক কথা বলেছে, পুরোনোকে না রক্ষা করে নতুনকে এনে কিছু লাভ নেই।" উনি সৃজকে কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন। সুনীলবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

আর সৃজ? ও তখন আকাশমণি গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে। গাছটাকে খুব হাসিখুশি মনে হল ওর। সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে। দুলছে গাছগুলোর ডালপালা। সৃজর মনে হল, আকাশমণি গাছটা ওর মুচড়ে নেওয়া ডালটা নাড়ছে। ঠিক হাত নাড়ার মতো। যেন বলছে, ভালো থেকো সৃজ, ভালো থেকো।

ছবিঃ সোমা

পটলের দুঃখ

জামাল ভড়

পটলের একটাই দুঃখ। ওর নাম কে বা কারা পটল রেখেছে। ও যখন বুঝতে শিখলো তখন থেকেই একটা হীনমন্যতায় ভুগছে। প্রথম প্রথম পটল বাবামাকেই দোষারোপ করতো। মা জানিয়েছিল, "না রে পটল! তোর ঠাম্মাই এই নাম রেখেছে। তুই তো ছোটবেলায় বেশ গোলগাল ছিলি! তাই তোর ঠাম্মাই আদর করে বলতো পটল।"

ঠাম্মা তো মরে বেঁচে গেছে। কার সাথে এখন ঝগড়া করে? নাও, এখন সারা জীবন ঠ্যালা সামলাও। একদিন মাকে বলেছিল, "তা তোমরা তো স্কুলে ভর্তির সময় আমার নামটা পালটাতে পারতে?"

"মাস্টার যখন তোর নাম জিজ্ঞাসা করলো তুইই তো বললি পটল। আর মাস্টার তো সেই নামটাই লিখে নিল। আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিল না। জন্মতারিখটাও আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। মাস্টার আন্দাজমতো একটা বসিয়ে দিয়েছিল।"

"কেন জন্মসার্টিফিকেট দেখতে চায়নি?"

"আরে তখন কি ওসব লাগতো? লাগতো না। এখন তো ওসব লাগে শুনেছি।"

মুশকিলটা হলো যেদিন পড়া হতো না সেদিন স্যার রেগে গিয়ে বললেন, "তুই পটল না, তুই একটা মুলো, রাঙামুলো।" একথা শুনে অন্য ছেলেমেয়েরা না হেসে পারল না।

প্যাঙা মাস্টার কানে একটু কম শুনতেন। একদিন হয়েছে কি, অফিসঘরটার সামনে যে ছোট্ট ফুলবাগান আছে তা থেকে কেউ একজন একটা বড় গাঁদাফুল তুলেছে। প্যাঙা স্যার কানে কম শুনলে কি হবে শকুনের মতো চোখ। ব্যাস্ নজরে পড়লো প্যাঙা স্যারের। হাতে কঞ্চির ছড়ি নিয়ে হাওয়ায় সপাৎ সপাৎ করতে করতে বললেন, "কে রে ফুল তুলেছে?"

পটল একদিন নন্টেকে আইসক্রিম দেয়নি বলে নন্টের রাগ ছিল। সে ফস করে বললো, "পটল তুলেছে।"

প্যাঙা স্যার বললেন, "কে আবার পটল তুললো?"

"না স্যার ফুলটা পটল তুলেছে," নন্টে ব্যাখ্যা করে বললো।

"হ্যাঁরে ফুল আবার পটল তোলে নাকি?" বলেই নন্টেকে দু'ঘা কষিয়ে দিলেন।

পটল ভাবে ওর নামটা যদি পটল না রেখে পাটল রাখতো তাহলে একটা নতুনত্ব আনা হতো। পটলের মতো রঙবিশিষ্ট। পাটলবর্ণ বলে না! কিন্তু সরাসরি সবজির নাম পটল যার আবার ইংরিজি হয় না। আলু মুলো বেগুনের ইংরিজি থাকলেও পটলের ইংরিজি নেই। পটলের ইংরিজি পটলই। তাছাড়া পটলের তরকারিটা ও দু'চোখে দেখতে পারে না। মা আলুপটল রাঁধলে ও পটলগুলো বাদ দিয়েই খায়।

অনেকের আবার আলিবাবা গল্পের কাশিমের মতো অবস্থা হয়। কাশিম চিচিং ফাঁক ভুলে গিয়ে আলু ফাঁক উচ্ছে ফাঁক ঝিঙে ফাঁক ইত্যাদি কীসব বলেছিল। আর পটলের সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ইচ্ছে করে বলে ঢ্যাঁড়শ বা মুলো। এই তো সেদিন ক্লাসে ঢুকে চোখলাল স্যার দেখেন তাঁর বসার চেয়ারটা টেবিল থেকে বেশ দূরে রাখা রয়েছে। চোখলাল স্যার চোখ পাকিয়ে বললেন, "কে রে চেয়ারটা সরিয়েছে?"

বুল্টন সঙ্গে সঙ্গে বললো, "স্যার মুলো।"

"কী বললি?" স্যার হুঙ্কার ছাড়লেন।

তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে বুল্টন জানালো, "স্যার চেয়ারটা আলু সরিয়েছে।"

"কীসব আবোলতাবোল আলু মুলো বকছিস," বলেই স্যার বুল্টনকে নিল ডাউন করিয়ে দিলেন।

সে যাত্রায়ও পটল রেহাই পেয়ে গেল।

পটলের স্মৃতিশক্তিটা একটু দুর্বল। এত চেষ্টা করে তবুও সব কিছু মনে রাখতে পারে না। এজন্য তার দুঃখ কম নয়। মা হয়তো দোকানে পাঠিয়ে একশ' গ্রাম চা ও এক কিলোগ্রাম লবণ আনতে বলেছে, ও নিয়ে এলো একশ' লবণ ও এক কিলোগ্রাম চা।

পটল এত চেষ্টা করে সাবধানে সব কিছু করবে কিন্তু কেমন যেন গুলিয়ে যায়। এই তো সেদিনকার কথা। ইতিহাস ক্লাসে স্যার জিজ্ঞাসা করলেন,

“আকবরের বাবার নাম কী?”

পটল কোন কিছু না ভেবেই ফস করে বললো, “স্যার আকবরের বাবার নাম রহিম।”

স্যার কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে উত্তরটা শোধরানোর সুযোগ দিলেন।

ও দৃঢ়তার সাথে ফের জানাল, “হ্যাঁ স্যার আকবরের বাবার নাম রহিম।”

“কী বললি?”

“আকবরের বাড়ি আমাদের পাড়ায়। ওর বাবাকে আমরা রহিমকাকু বলেই ডাকি।”

পাক্কা পঞ্চাশবার উঠবোস করতে হয়েছিল এজন্য। আর একদিন এক স্যার জানতে চাইলেন, “সূর্য কোন্ দিকে অস্ত যায় রে?”

“রাজুদের আমবাগানের দিকে, ” পটলের চটজলদি উত্তর।

এসব কারণেই ওকে বকাঝকা খেতে হয় সে জানে। খুব সাবধানী হয় তবুও শেষ মুহূর্তে কেমন যেন ওলট-পালট কেন হয়ে যায় সে ভেবে পায় না। একদিন অঙ্কের ক্লাসে লম্বু স্যার জানতে চাইলেন, “বলতো পটল একটা ঘরে তিনটে

মোমবাতি জ্বলছিল। হঠাৎ হাওয়ায় একটা নিভে গেল। ঘরে মোট ক'টা মোমবাতি রইলো?"

"একটাও না স্যার।"

লম্বুস্যার কাউকে মারেন না। শুধু বললেন, "তোর হবে না।"

তবে ঐ কথাটা পটল কখনো ভুলবে না।একদিন এক স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, একটা রসাল ফলের নাম বলতো পটল।

"রসগোল্লা স্যার।"

উত্তর শুনে স্যার নিজেই হেসে ফেলেন বলে সে যাত্রায় শাস্তিটা পেতে হয়নি। পটল ভাল হওয়ার চেষ্টা করে, সতর্ক হয়, তবু পারে না। তবে এবারে সে প্রতিজ্ঞা করেছে আরো পড়বে, আরো জানবে, ভাল তাকে হতেই হবে।

ছবিঃ সৌভিক

পিঁপড়ের নাম টুকুস

রতনতনু ঘাটী

সকালে একটা কিছু খেয়েই টং টং করে বেরিয়ে পড়ল টুকুস। আজ সে একটা মস্ত পাহাড় পেরিয়ে যাবে তার বন্ধুর বাড়ি। হাঁটতে- হাঁটতে যদি সারাটা দিন যায় তো যাক না! তার আর অত ঝামেলা কী? তার না আছে বইয়ের ব্যাগ পিঠে নিয়ে স্কুলে যাবার তাড়া! না আছে তবলা বা আবৃত্তির ক্লাশে যাওয়ার ঝক্কি। আর না আছে সাঁতার শেখার মতো মন- না- চাওয়া কাজ। খেলার মাঠে যাওয়ারও তার তাড়া নেই। ওসব থাকবে কেন টুকুসের? টুকুস তো একটা পুঁচকে লাল পিঁপড়ের নাম।

তার এ নামটা আর কেউ রাখেনি। নামটা রেখেছিল সেনবাবুদের মরমী। যেদিন মা রান্নাঘর থেকে সোজা স্নানের ঘরে ঢুকলেন, অমনি মরমী ওকে দেখতে পেল রান্নাঘরের চৌকাঠের পাশে ঘুরঘুর করতে। সেদিনই 'টুকুস' নামটা হঠাৎ মরমীর ঠোঁটে এসে গিয়েছিল। তক্ষুণি ওর কাছে গিয়ে "অ্যাই টুকুস," বলে ডাকতেই ও মরমীর দিকে তাকিয়েছিল মুখটা হাঁ করে। হ্যাঁ, অবাক হয়েছিল বইকি।

কেন, অবাক হয়েছিল কেন? অবাক হওয়ার কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়। এই প্রথম কেউ তার অমন একটা সুন্দর নাম রাখল কিনা, তাই। টুকুস বলল, "আমার নাম যদি টুকুস হল, তাহলে তোমার নাম কী গো?"

"আমার নাম তো মরমী সেন।"

পিঁপড়েদের রাজ্যে অমন নাম রাখার কোনও চল নেই। তাই কারও কোনও নামই নেই। টিঙ্কি নয়, টুরা নয়, দেবলি, কিচ্ছু না। মরমীকে এ কথাটা সেদিন বলেওছিল টুকুস। কথাটা শুনে মরমী তো হাঁ। তাই আবার হয় নাকি? ইশকুলে ভর্তি হতে হবেনা? নাম না হলে ইশকুলে মিস নাম কল করবেন কী করে? নাম না হলেও পিঁপড়েদের ইশকুলে হয়তো নাম কল করা যায়? কে জানে!

তখনই ওর মনের কথাটা জানতে পেরে টুকুস বলল, "ও মরমী দিদি, তুমি জানো না, আমাদের কোনও ইশকুল নেই, তোমাদের মত সেখানে ভর্তিও হতে হয় না।"

মরমী মনে মনে ভাবল, আমি তো মুখে ওকে কিছু বলিনি! তাহলে টুকুস ওই কথাটা জানতে পারল কী করে? ও কি মনের কথা পড়তে পারে নাকি? বলল, "ভর্তি হতে হয় না তো তোরা লেখাপড়া করিস কী করে?"

"আমার তো আর তোমার মত অত পড়াও নেই, আমার ইশকুলে যাওয়াও নেই। আমার শুধু কাজ, আর কাজ।"

মরমী হাত উলটে বলল, "ও মা! তুই তো ওইটুকুনি! তুই আবার কী কাজ করিস?"

ঠোঁট উলটে টুকুস বলল, "কাজের কথা বোলো না গো মরমী দিদি। এই দলবেঁধে খাবার খুঁজতে চলো রে, এই কোথাও খাবারের খোঁজ পেয়েছ কি সব্বাইকে খবর পাঠাও রে। তারপর সবাই মিলে খাবার বয়ে আনতে চলো রে।"

মরমী বলল, "ওমা, তুই অত কাজ করিস? আমার দিদা শুনলে খুব খুশি হবে! আমি লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু কাজ পারিনা বলে আমায় দিদা কী বলে জানিস?"

ছোট ছোট ছ'টা পা কে একটু বিশ্রাম দিল টুকুস। তারপর একটু আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে বলল, "কী বলে গো?"

মরমী বলল, দিদা আমাকে বলে, "তুই একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি।"

"আমড়া কাঠ কী গো মরমী দিদি?" বলল, টুকুস।

মরমী ঠোঁট উলটে বলল, "আমি আমড়া কাঠও চিনি না। তা দিয়ে কী কাজ হয় তাও জানিনা। তবে, দিদা একথা বলে ফিকফিক করে হাসে। এই আমি তোকে জানিয়ে রাখলাম। তারপর? তারপর তুই কী করিস?"

"তারপর? দিন- রাত সে খাবার বয়ে এনে বাসায় জড়ো করো রে! শীতকালে তো ওই জমা করা খাবার খেয়ে দিন কাটাতে হয় আমাদের।"

"শীতকালের খাবার গরমকালেই জোগাড় করে নিস? বাঃ তোর কাছ থেকে বেশ একটা ভালো কথা শিখলাম রে! তা আজ তো বেশ সেজেগুজে বেরিয়েছিস। আজ আবার কোথায় খাবারের খবর আছে রে টুকুস? বোসকাকুদের রান্নাঘরে?"

"না গো মরমী দিদি, আজ যাচ্ছি এক বন্ধুর বাড়ি। ওই যে দূরে অত্ত উঁচু পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ, ওই পাহাড়টা পেরিয়ে। ওখানে নাকি অনেক খাবার জমে আছে একটা দোকানের ময়লা ফেলার জায়গায়। তারই খোঁজ নিতে আমাদের রানিমা'র কাছ থেকে একটা দিনের ছুটি পেয়েছি গো।"

মরমী চোখ তুলে দেখল, কোথায় পাহাড়? ও তো একটা ছোট্ট মাটির ঢিবি। টুকুস ওই পুঁচকে পুঁচকে পায়ে হাঁটবে তো! তাই ওটা ওর কাছে পাহাড়ই বটে!

মরমী উঠোনে একটা ছোট কাঞ্চন ফুলের গাছের কাছে বসেছিল। বসে বসে একটা লাল-ফড়িংয়ের সঙ্গে ভাব করছিল। যদি ওর কাছ থকে ফড়িং- রাজ্যের কোন খবর পাওয়া যায়। কিন্তু লাল- ফড়িংটা বড্ড ব্যস্ততা দেখিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। যাওয়ার সময় বলল, "আমার হাতে এখন মোটেও সময় নেই। তোমার সময় থাকলে কাল এসে এইখানটায় থেকো। অনেক কথা বলে যাব।"

মরমী তাতেই রাজি। ঘাড় নাড়ল লালফড়িংটার কথায়। আর তক্ষুণি টুকুস ওর পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। তার পরই তো তাই দেখা হয়ে গেল টুকুসের সঙ্গে।

মরমী হেসে বলল, "তা তুই রানিমাকে ছুটি চাইলি, আর রানিমা তক্ষুণি তোর ছুটি ইয়েস করে দিলেন? তোদের রানিমা তো বেশ ভালো রে। আমাদের ইশকুলের মিস কিন্তু খুব রাগী। ছুটি দেবেনই না।"

টুকুস হেসে বলল, "এই যে বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, এটাও তো একটা কাজের মধ্যেই পড়ে গো মরমী দিদি। তা হোক, তবু তোমার ইশকুলে না পড়াই ভালো গো মরমী দিদি। এক- আধদিন ছুটি যদি না- ই পেলে, অমন ইশকুলে পড়া কেন?"

মরমী চোখ বড়- বড় করে বলল, "ইশকুলে না পড়লে পাশ করব কী করে? আর পাশ না করলে চাকরি পাব কী করে? আর চাকরি না পেলে কাজ করব কোথায়? আর কাজ না করলে খাব কী? আমার মা তো তাই বলে!"

টুকুস হাসল ফিক করে, "আমি যেমন কাজ করি, তুমিও তেমন কাজ করবে। আমরা তো ইশকুলে পড়ি না, তার পাশ করার বালাই নেই।" আর পাশ করার বালাই নেই বলে চাকরিরও অত ঘটাপটা নেই। তবু আমাদের কি কাজের অভাব না খাওয়ার অভাব, বলো?"

মনে মনে ভাবল মরমী, কথাটা কি ঠিক বলল টুকুস? মনে ধরল না যেন টুকুসের কথাটা।

মরমীকে চুপ করে থাকতে দেখে টুকুস বলল, "তা হলে একটা কাজ করতে পার মরমী দিদি।"

মরমী ভাবনা- মাখা মুখটা তুলে বলল, "কী?"

টুকুস বেশ সবজান্তার মত ভাব দেখিয়ে বলল, "তুমি বরং একদিন আমার সঙ্গে চলো আমাদের রানিমার কাছে। তাঁকে বলে তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিই।"

মরমী বলল, "তাহলে চল না, আজই তোর সঙ্গে গিয়ে তোর রানিমার সঙ্গে দেখা করি? আজ আমার দিদিমণি আসবে না তো পড়াতে।"

টুকুস বলল, "না না, তা কি হয় মরমী দিদি?" যে কাজ নিয়ে আজ বেরিয়েছি, আজ সে কাজটা ফেলে রাখা কি ঠিক? তার চেয়ে চলো, কাল না হয় তোমাকে নিয়ে যাবো রানিমার কাছে।"

বলেই হনহন করে হাঁটতে লাগল টুকুস। টুকটুক করে হাঁটতে- হাঁটতে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি পেরোল সে। তারপর উঠতে লাগল ঢিবিটার চূড়োর দিকে।

মরমী একটু পরেই চোখে হারিয়ে ফেলল টুকুসকে।

পরদিন সকালবেলা আপন মনে মরমী বসেছিল ওদের উঠোনে, বকুল গাছটার তলায়। আজ দুটো মৌমাছি এসেছে হলদে জবার গাছে। ওরা উড়ছে তো উড়ছেই। একটুও থামছে না তো! ও মা, ওদের কি একটুও কষ্ট হয় না? তক্ষুণি মনে পড়ে গেল টুকুসের কথা। সকাল থেকে টুকুসের কথা ওর মনেই ছিল না।

হঠাৎ দেখল, ওইতো একটা শুকনো বকুল পাতার বাঁক ঘুরে গুটগুট করে এদিকেই তো আসছে টুকুস। ভাল করে দেখল মরমী, হ্যাঁ, টুকুসই তো!

কাছে এসে টুকুস একটু যেন হাঁফ ছেড়ে দাঁড়াল। একটু যেন দমও নিল। তারপর বলল, "কই গো মরমী দিদি, আমাদের রানিমার কাছে যাবে যে?"

মরমী যেন আকাশ থেকে পড়ল, "তোদের রানিমার কাছে? আমি যাব? কেন?"

টুকুস চোখ বড়- বড় করে বলল, "ও মা, কালি তো কথা হল? তোমার জন্যে একটা কাজের কথা বলে দেব যে আমাদের রানিমাকে। তাইতো কথা হল কাল!"

মরমী ভুলেই গিয়েছিল টুকুসের রানিমার কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু টুকুস তো কথাটা ভোলেনি? মনে- মনে বেশ খুশি হল মরমী। টুকুসের রানিমা মানে তো রানি পিঁপড়ে। মা'র মুখে এই রানি পিঁপড়ের কথা আগে শুনেছে মরমী।

মরমী বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "দ্যাখ টুকুস, আমার তো কাল ইশকুল আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে। এখনও দু'পাতা হাতের লেখা বাকি। আর রাইমসটা তো মুখস্তই হয় নি। তোদের রানিমার সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব। বড় হয়ে যখন পাশ করব, তখন যদি একটাও কাজ না পাই, তখন ফের যাব রানিমার কাছে কাজের খোঁজে। আজ শুধু দেখা করেই চলে আসব, কেমন?"

টুকুস একটু কেমন আনমনা হল যেন। তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, "সে তুমি যা ভাল মনে হয় কোরো মরমী দিদি। তোমার সঙ্গে আমাদের রানিমার তো একটা কথা আগেভাগেই হয়ে থাকল। ক্ষতি কী?"

মরমী হেসে বলল, "তোর রানিমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। এই পোশাকে কি আর যাওয়া যায়? তুই এখানে দাঁড়া। আমি মাকে বলে ফ্রকটা চেঞ্জ করে এক্ষুণি আসছি। কোথাও যাস না কিন্তু!"

অনেক হলদে ফুল আর একটা প্রজাপতি আঁকা একটা লাল টুকটুকে ফ্রক পরে চটপট ফিরে এল মরমী। এসে দেখল, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে টুকুস।

মরমীকে দেখেই হই হই করে উঠল টুকুস, "ও মা, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে গো মরমী দিদি! চলো, চলো! আমাদের রানিমা আবার যখন- তখন যার- তার সঙ্গে দেখা করে না!"

বেশ কিছুটা আগে আগে যাচ্ছে টুকুস। তার পিছনে মরমী। কোথায় যে যাচ্ছে তা তালেগোলে ঠিকঠাক করে উঠতে পারল না মরমী।

তবে টুকুসের সঙ্গে মরমী যে যাচ্ছে, একথাটা ঠিক।

ছবিঃ অর্ণব

গিরগিটি

সৈকত মুখোপাধ্যায়

শেষ অবধি বাগানের কোণায় টালির চাল দেওয়া ঘরটার মধ্যেই কাবুলকে পাওয়া গেল। ঘরটার একদিকে বাগান করার যন্ত্রপাতি, সারের বস্তা, টব এইসব ডাঁই করে রাখা আছে। অন্য দিকে সারি সারি কাচের জার, প্যাকিং –বাক্স, তারের খাঁচা। সারা ঘরটাতেই কেমন যেন একটা চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানা গন্ধ। তাছাড়া কান পাতলেই শোনা যাবে হিস হিস, ফ্যাঁসফ্যাঁস কিচমিচ গরগর – নানারকম শব্দ। একটা বড় টেবিলের ওপর কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির মতন বুনসেন বার্নার, টেস্ট টিউব, লাল নীল কেমিক্যাল ভর্তি বোতল এইসব সাজানো আছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাবুল চোখের কাছে একটা ঢাকনা আঁটা কাচের শিশি নিয়ে মন দিয়ে কি যেন দেখছিল। দরজা খুলে সাবধানে মুখ বাড়াল ওর ছোটকাকা।

ছোটকাকা আর কাবুলের বয়সের ব্যবধান বেশি নয়, মাত্র পাঁচ বছরের। কাবুলের চোদ্দ আর তার ছোটকাকা, মানে শ্যামলের ঊনিশ। কাবুলের শখ নানারকমের জন্তুজানোয়ার পাখি টাখি নিয়ে রিসার্চ করা আর শ্যামলের ধ্যানজ্ঞান যোগাসন। দুজনেই দুজনের হবি নিয়ে সারাক্ষণ নাক সিঁটকোয় অথচ একজনের ছাড়া অন্যজন বেশিক্ষণ থাকতেও পারে না। আজকেও শ্যামল অনেকক্ষণ থেকেই ওদের মোহনপুরের বিরাট তিনতলা বাড়ির এখানে ওখানে আদরের ভাইপোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কোথাও না পেয়ে বাগানের মালির ঘরে, মানে কাবুলের ল্যাবরেটরিতে ঢুঁ মেরেছে। এই ঘরটার দিকে শ্যামল পারতপক্ষে আসতে চায় না। এলেও ভেতরে ঢুকতে চায় না। তার অবশ্য যথেষ্ট জোরালো কারণ আছে।

আজকেও শ্যামল বাইরে থেকে অনেকক্ষণ কাবুল কাবুল বলে ডাকাডাকি করল। তারপর কাবুলের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেরে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল “দ্যাখ কাবুল, তুই যদি স্বেচ্ছায় বাইরে না আসিস তাহলে আমি বাধ্য হব ... ওরে বাবা হাঁউ মাঁউ ইয়াপ্পি হেল্প হেল্প মার্ডাআআর!”

শেষের কথাগুলো অবশ্য ঠিক কাবুলকে উদ্দেশ্য করে বলা নয়। ওগুলো শ্যামল বলতে বাধ্য হল, কারণ একটা সবুজ লাউডগা সাপ দরজার মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে তার চশমার কাচটা চেটে দিয়েছিল। চ্যাঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে কাবুল ধীরেসুস্থে দরজার দিকে এগিয়ে এল। তারপর সাপটাকে দরজার ফ্রেম থেকে ছাড়িয়ে নিজের বুকপকেটে পুরে গম্ভীরভাবে বলল, "ছোটকা, তোমাকে হাজারবার বলেছি দুর্বল চরিত্রের লোকজনের এ ঘরে না ঢোকাই ভালো। তা তুমি কিছুতেই শুনবে না।"

শ্যামল কিছুক্ষণ বুক ভর্তি করে শ্বাস টেনে আর ছেড়ে নিজেকে সামলালো। তারপর রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলল "আকস্মিক ঘটনা তো, তাই একটু ইয়ে হয়ে পড়েছিলাম। গত বারো বছর ধরে কুম্ভক আরে রেচক করে আসছি, আর তার ফলে কেউটে সাপের বিষও হজম করতে পারি সেটা জানিস নিশ্চয়ই।"

কাবুল বলল, "কেউটের বিষের ব্যাপারটা ঠিক বলতে পারব না। তবে ভাত যে নরম না হলে হজম করতে পারো না সেটা দেখেছি।"

শ্যামল তক্ষুণি কোনো জবাব না দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ঘরে ঢুকল। তারপর কাবুলের মোড়ার পাশে আরেকটা মোড়া টেনে নিয়ে বসতে গিয়ে হঠাৎ কী একটা মনে পড়ে যাওয়ায় ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। যেটা তার মনে পড়ে গিয়েছিল সেটা আর কিছুই না, মাত্র গতমাসেই ওই মোড়াটার ওপর কাবুলের পোষা একটা শজারুর ছানা কুন্ডলি পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। সে বেখেয়ালে সেই শজারুটার ওপরেই বসে পড়েছিল । তারপর দিনদশেক আর কোথাওই বসতে পারেনি।

যাইহোক, আজকে মোড়াটা সবদিক থেকে শ্যামলের নিরাপদ বলেই মনে হল । সে ওটার ওপর বসতে গিয়ে কিছক্ষণ এদিক ওদিক তাকালো। তাকে বসতে দেখে একটা প্যাকিং বাক্সের মধ্যে থেকে দুটো বাঁদরের বাচ্চা ভেংচি কাটলো, খাঁচার মধ্যে থেকে একটা গো- বক ঠোঁট বাড়িয়ে ঠোকরাবার চেষ্টা করল, এমন কি একটা বেজি অবধি গলায় শিকলি টান মেরে ছিঁড়ে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্যে অপ্রাণ কসরত করতে লাগল।

শ্যামল বলল, "তোর পোষ্যগুলো আমায় দেখলে এমন হিংস্র ব্যবহার করে কেন বল তো কাবুল?"

কাবুল বলল, "ভালোমানুষি কোরো না ছোটকা। আমি সব জানি।"

"কী জানিস?"

“যদু আর বংশীধরের চোখে তুমি আয়না দিয়ে আলোর ফোকাস মারো, বক্রেশ্বরের জলের মধ্যে নস্যি ঢেলে দিয়েছিলে আরে নকুল...”

কাবুলের কথা শেষ করতে না দিয়েই শ্যামল বলল, “বাব্বাঃ, বাঁদরছানার নাম যদু আর বংশীধর! বকের নাম বক্রেশ্বর! বেজিটার নাম বুঝি নকুল? তা ও ওরকম লাফাচ্ছে কেন? ওকে তো আমি কিছুই করেছি বলে মনে পড়ছে না।”

“না ও তোমাকে দেখে লাফাচ্ছে না। আসলে ও অলাবুকে ধরতে চাইছে। সে আবার কখন যেন আমার পকেট থেকে বেরিয়ে তোমার পেছনে ওই তাকটার ওপর গিয়ে উঠেছে দেখছি।”

“আলবু! সে আবার কে? বলে পেছন দিকে আড়চোখে চাইতেই শ্যামল প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল। সেই লাউডগা সাপটা!”

মোড়া থেকে লাফিয়ে উঠে শ্যামল ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “নাঃ । শান্তিতে দুটো কথা বলতে দিবি না দেখছি। তবে কি জানিস তো কাবুল , কথাগুলো শুনলে তোরই উপকার হত। ওরা ফার্স্ট প্রাইজ দিচ্ছে ল্যাপটপ।”

কাবুল যতই বৈজ্ঞানিক- মার্কা গম্ভীর হাবভাব করে থাকুক, বয়স তো আসলে মাত্রই চোদ্দ। তাই ল্যাপটপের কথা শুনে হাতের কাঁকড়াবিছে ভর্তি কাচের শিশিটা ঠকাস করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ছোটকাকার দিকে ঘুরে বসল। বলল, “কারা ল্যাপটপ দিচ্ছে গো ছোটকা? কেন দিচ্ছে? বল না ,বল না।”

“দিচ্ছে মিলন সংঘ। ওদের বাৎসরিক প্রতিযোগিতার ফার্স্ট প্রাইজ হচ্ছে ল্যাপটপ, সেকেন্ড প্রাইজ ডিজিটাল ক্যামেরা, থার্ড প্রাইজ...”

“আহা আর বলতে হবে না, আর বলতে হবে না” কাবুল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে দিল। “ওই ল্যাপটপটা আমার চাই। এই দ্যাখো না, একবছর একটানা পরিশ্রম করে গিরগিটি লোশন বানিয়েছিলাম। তার ফরমুলা লেখা খাতাটা আজ সকালেই চন্দ্রভানু চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তার ওপরে যেটুকু লোশন বানিয়েছিলাম সেটাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই চন্দ্রভানু ওটাও খেয়ে ফেলেছে। জিনিসটা ঠিকঠাক কাজ করবে কিনা সেটাও কারুর ওপর আপ্লাই করে দেখতে পারলাম না।”

কাবুলের মুখে নিজের নাম শুনে ঘরের কোন থেকে চন্দ্রভানু, মানে নেড়ি কুকুরের ছানাটা আনন্দে ভৌওওও করে আহ্লাদি ডাক ছাড়ল। তার দিকে একটা বিষদৃষ্টি হেনে কাবুল বলল, “ল্যাপটপে যদি ফরমুলাটা লোড করে রাখতাম তাহলে আজ এইভাবে সব পরিশ্রম জলে যেত না। তা, মিলন সঙ্ঘের প্রতিযোগিতাটা কীসের ওপর? ক্যুইজ না অঙ্ক?”

অঙ্কে আর ক্যুইজে শুধু মোহনপুর নয় , কলকাতা থেকেও কাবুল ঝুরি ঝুরি প্রাইজ নিয়ে এসেছে। উল্টোদিকে, দৌড় কিম্বা লাফানো কিম্বা ক্রিকেট অথবা ফুটবল- ওসবে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তাই কাবুল ধরেই নিয়েছিল ওই দুটো ইভেন্টের মধ্যে কোনো একটার কম্পিটিশন হবে। না হলে ছোটকা তাকে খবর দিতে আসবেই বা কেন? তাই ছোটকার জবাব শুনে সে ভীষণ অবাক হল। ছোটকা বলল, "না রে , কাবুল ওসব কিছু নয়।"

"তাহলে? ক্রিকেট?"

"না , না। ক্রিকেট হলে কি আর তোকে বলতে আসি ? ওঁরা এবার ভারি অদ্ভূত জিনিস বের করেছেন মাথা থেকে। লুকোচুরি প্রতিযোগিতা।"

"লুকোচুরি!" কাবুল এমন ভয়ঙ্কর নাক সিঁটকালো যে তাই দেখে হিংস্র গো- বকটা অবধি ভয়ের চোটে খাঁচার কোণায় বসে পড়ল। "তুমি আমাকে লুকোচুরি খেলার কথা বলতে এখানে এসেছ ছোটকা! আমি কি একটা বাচ্চা মেয়ে? ছি ছি ছি। শিগগির বেরোও ঘর থেকে নাহলে গায়ে বাঘা মাকড়শা ছেড়ে দেব। "

শ্যামল দু হাত তুলে রে রে করে উঠল। বলল "আগে পুরোটা বলতে দিবি তো। ওঁরা মোটেই লুকোচুরি বলছেন না। বলছেন ক্যা ক্যা ক্যা..."

"ক্যামুফ্লেজিং?" কাবুল ছোটকাকার কথার খেই ধরিয়ে দিল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যামুফ্লাজিং। আর বাচ্চা মেয়ে পাবি কোথায়? প্রতিযোগিতাটা কেবল বারো বছরের ওপরের ছেলেদের জন্যে। তাছাড়া খেলাটাকে ওঁরা ভয়ঙ্কর শক্ত করেছেন। পুরানো গির্জার মাঠটা দেখেছিস তো, গাছপালা, ইঁটের পাঁজা, ভাঙা কবর এইসবে ভর্তি? ওই মাঠেই প্রতিযোগীদের লুকোতে হবে। তারা লুকোনোর জন্যে সময় পাবে সাত মিনিট। তারপরেই এক্স মিলিটারি কর্নেল হাম্বীর সাক্সেনার নেতৃত্বে পাঁচজনের একটা দল তাদের খুঁজতে বেরোবে। যে সবচেয়ে বেশি সময় লুকিয়ে থাকতে পারবে সেই হবে ফার্স্ট।"

কাবুল বলল "হুঁ, ব্যাপারটা শুনে ইন্টেরেস্টিং মনে হচ্ছে। তা তুমি নাম দিচ্ছ না কেন?"

"কে বলল দিচ্ছি না ? তবে দুজন থাকলে জেতার চান্সটা ডবল হয় না?"

"ঠিক আছে ছোটকা। দেব নাম । এই যে মাঠ ঘাট বনবাদাড় থেকে এত পাখি প্রজাপতি মাকড়শা টাকড়শা ধরে আনি, ক্যামুফ্লেজিং না জানলে তা কি পারতাম? ওরা দূর থেকে আমাকে দেখেই লুকিয়ে পড়ত না? আমার এমন সব খয়েরি সবুজ ছাপ ছোপ দাওয়া জামা প্যান্ট আছে না, যে গাছপালার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি দু হাত দূর থেকেও আমাকে দেখতে পাবে না। মনে হচ্ছে ল্যাপটপটা আমারই কপালে নাচছে।" এই বলে কাবুল খাঁচার ফাঁক দিয়ে চামচিকেদের কলা খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ভারি বিতৃষ্ণা নিয়ে কাবুলের কান্ডকারখানা দেখতে দেখতে শ্যামল পিছু হেঁটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। অবশ্য সম্পূর্ণ নিরাপদে বেরোতে পারল না। চন্দ্রভানুর লেজে পা পড়ে গিয়েছিল । সে ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে তাড়া করে শ্যামলকে বাগান পার করে দিয়ে এল।

পনেরোই আগস্ট দুপুর বারোটায় মোহনপরের সাড়ে তিনশো বছরের পুরানো ডাচ গির্জার মাঠে মিলন সংঘের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা শুরু হল। বারো থেকে বাহাত্তর বছর বয়সী কুড়িজন

প্রতিযোগী লুকোচুরি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে। তাদের মধ্যে শ্যামল আর কাবুলও রয়েছে। কাবুলের পরণে তার সেই জংলাছাপ মিলিটারি মার্কা ফুলহাতা জামা আর ফুলপ্যান্ট। তার ওপর সে কম্যান্ডোদের কায়দায় চোখের নিচে, গালে গলায় কালো রঙ- ও মেখেছে। সব মিলিয়ে যদিও তাকে আস্ত মামদো ভূতের মত দেখতে লাগছে, তবু এক্স মিলিটারি অফিসার হাম্বীর সাক্সেনা অবধি প্রতিযোগিতার আগে প্রতিযোগীদের সঙ্গে হাত মেলাতে এসে স্বীকার করেছেন যে, এই বাচ্চা ছেলেটার ফার্স্ট হবার সম্ভবনা উজ্জ্বল।

অন্যদিকে কাবুলের ছোটকাকা শ্যামলের পরণে খালি একটা ছোট সাঁতার কাটার প্যান্ট। তার যুক্তি খুব পরিষ্কার। সে কাবুলকে বুঝিয়ে বলল, "দ্যাখ একটু বাদেই আলো কমে যাবে। তখন আমার গায়ের এই কুচকুচে কালো চামড়ার থেকে ভালো ক্যা ক্যা ক্যামুফ্লেজ আর কী হতে পারে? তারপরে যোগাসন করে আমার কেমন ইলাস্টিক বডি তা তো তুই ভালই জানিস। গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালার মধ্যে ঠিক ওই স্টাইলে এমন এঁকেবেঁকে দাঁড়িয়ে থাকব যে হাম্বীর সাক্সেনা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববে – ছেলেটা গেল কোথায়?"

তাই শুনে কাবুল চিন্তিত মুখে বলল, "সে তো বুঝলাম ছোটকা। কিন্তু আমি তো এই কবরখানার মাঠে প্রায়ই সাপ টাপ ধরতে আসি। আর সেটাও আসি সন্ধেবেলায়। বিশ্বাস কর, সুর্য ডোবার পর ওই সব খানাখন্দের মধ্যে থেকে কোটি কোটি মশা বেরিয়ে আসে । মেঘের মতন মশার ঝাঁকের আড়ালে আকাশ ঢাকা পড়ে যায়। মশাদের ডানার শব্দে মনে হয় মাথার ওপর দিয়ে জেটপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। তুমি যে খালিগায়ে এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে, ওই মশারাই তো তোমাকে কামড়ে অস্থির করে দেবে। তখন তুমি দুহাত তুলে নাচতে নাচতে নিজে থেকেই মাঠের বাইরে বেরিয়ে আসবে। কাউকে কষ্ট করে আর তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে না।"

"হুঃ , আমাকে তুই অত কাঁচা ছেলে পেয়েছিস? আমি এত বড় এক কৌটো মশা তাড়ানোর ক্রিম পকেটে নিয়ে এসেছি।"

"আমিও অবশ্য তাই করি , মানে মশার ক্রিম মেখেই এখানে আসি। মানে আসতাম, সেই কৌটোটা যে কোথায় হারিয়ে ফেললাম! আসবার সময় খুঁজেই পেলাম না।"

কাবুল আর ছোটকার কাছ থেকে মশা তাড়ানোর ক্রিমের ভাগ চাইবার সময় পেল না। তার আগেই ফুররররর করে হুইসল বেজে গেল। শুরু হয়ে গেল লুকোচুরি প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগীদের লুকোনোর জন্য ঠিক সাত মিনিট সময় দিয়ে বিচারকরা মাঠে ঢুকলেন। ডাচ গির্জার পাঁচিলের ওপাশে ততক্ষণে হাজার হাজার কৌতুহলী মানুষের ভিড়। মাঠের ভেতরে অবশ্য প্রতিযোগী আর বিচারক ছাড়া আর কারুর ঢুকবার আনুমতি নেই। তবু বাইরে থেকে জোড়া জোড়া চোখ তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ করে চলেছে। তারাই চেঁচিয়ে বলে দিচ্ছে, "ও স্যার, ও স্যার ওই যে ব্যাচা মান্না ওই ভাঙা সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে রয়েছে। বদন দাদুকে দেখতে পাচ্ছেন না ? ওই যে তালগাছের পেছনে।"

এমনিতে বিচারকদের অথষ্ট চোখকান খোলা ছিল। তার ওপর দর্শকদের এরকম সহযোগিতা! খেলা শুরু হবার পনেরো মিনিটের মধ্যে কুড়িজনের মধ্যে পনেরোজন প্রতিযোগী

ধরা পড়ে গেল। কিন্তু বাকি পাঁচজন বোঝা গেল যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেই খেলতে নেমেছে। তাদের ধরতে বিচারকদের যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

ওই পাঁচজনের মধ্যে প্রথম ধরা পড়ল হালদারপাড়ার শ্রীপতি হালদার। সে দারুণ বুদ্ধি বের করেছিল। পকেটে করে চুন নিয়ে এসেছিল। সারা গায়ে সেই চুন মেখে, গির্জার দালানে ভাঙা শ্বেতপাথরের স্ট্যাচুগুলোর মধ্যে স্ট্যাচু সেজে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ডোবালো কাবুল যাদের কথা বলেছিল তারাই, মানে মশায়। বিচারকরা হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলেন, একটা স্ট্যাচু হাত তুলে নিজের বাঁ গালে ঠাঁই করে চাপড় মারল। ব্যস, শ্রীপতি হালদার আউট।

তারপর ধরা পড়ল অর্কপ্রভ স্যান্যাল। টাউন স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র। সে সবুজ জামাপ্যান্ট পরে সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। তাকে ধরা খুব কঠিন হত, যদি না কবরখানার মাঠে অতগুলো গরু চরত। একটা গরু ঘাস ভেবে অর্কপ্রভর জামার কলার মুখে পুরে হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। অর্কর আর বাবাগো মাগো বলে উঠে না পড়ে উপায় কী?

তার পরে ধরা পড়ল হীরে ওস্তাদ। হীরের প্রতিযোগিতায় নাম দেয়া নিয়ে অনেকে আপত্তি তুলেছিল। ক্লাবের কর্মকর্তারা তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, "দ্যাখ হীরে, তুই তো দাগি চোর। লুকিয়ে বেড়ানোটা বলতে গেলে তোর প্রফেশন। আমরা তো প্রতিযোগিতাটা করছি অ্যামেচারদের জন্য। তোর মতন প্রফেশনাল লোক এর মধ্যে ঢুকে পড়লে হবে কেমন করে?"

হীরে ফোঁস করে উঠেছিল। বলেছিল, "লুকোনোটা মোটেই আমার প্রোফেশন নয়, চুরিটা প্রফেশন। তাছাড়া ল্যাপটপের আমার বড্ড দরকার। তোমরা যদি আমাকে নাম না দিতে দাও তাহলে ক্লাবঘরে সিঁদ কাটব, এই বলে রাখলুম।"

এই কথার পরে আর কেউ হীরেকে ঘাঁটায়নি।

সেই হীরে দাঁতের ফাঁকে সরু রবারের পাইপ কামড়ে পুকুরের তলায় ডুবে বসে ছিল। শ্রীপতি হালদারকে এমন ধরিয়ে দিয়েছিল মশা, অর্কপ্রভকে গরু, তেমনি হীরেক ধরিয়ে দিল ভূত। ঘন্টাখানেক ওইভাবে পুকুরে ডুবে বসে থাকার পর হঠাৎ হীরে ওস্তাদ নিজেই ভুস্‌স্‌ করে জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর প্রাণপণে সাঁতরে পাড়ে উঠে "ও সাক্সেনা সাহেব গো, আমাকে বাঁচাও গো" বলে হাম্বীর সাক্সেনার গলা ধরে ঝুলে পড়ল। হাম্বীর সাক্সেনা অনেক করে তার গায়েপিঠে হাতটাত বুলিয়ে জানতে পারলেন, খানিকক্ষণ আগে হীরে জলের নিচে তাকিয়ে দেখে, বেশ কয়েকজন সাহেব-মেম তার আশেপাশেই ওই পুকুরের গভীর জলের নিচে বসে তাস খেলছে আর রুপোর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে। এরপরেও কেউ ওখানে ডুবে বসে থাকতে পারে? হীরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "কোন কুক্ষণে যে তোমাদের ক্যাঞ্জুফেলিং-এ নাম দিতে গিয়েছিলুম! এর পরে কি আর রাতদুপুরে একা একা চুরি করতে বেরোতে পারব?"

মিলন সংঘের অনারারি প্রেসিডেন্ট হলেন মোহনপুর থানার দারোগা অভয়নাথ সিংহ। তিনি ক্লাবের সম্মান বাঁচাবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলে ফেললেন, "কাঁদিস না হীরে, কাঁদিস না। যদি তোর সত্যিই অন্ধকার দেখে ভয় করে, তাহলে চুরি করার সময় আমি তোর সঙ্গে বেরোব।" ভাগ্যিস খবরের কাগজের লোকেদের কানে খবরটা যায়নি!

যাই হোক, হীরে ওস্তাদ ধরা পড়ে যাওয়ার পরে সেকেন্ড আর ফার্স্ট প্লেসের জন্য বাকি রয়ে গেল কাকা আর ভাইপো- শ্যামল আর কাবুল।

আরো আধঘন্টা খোঁজাখুঁজি করবার পর ধরা পড়ে গেল কাবুল। হ্যাঁ অবাক কান্ড কিন্তু সত্যি। আসলে ততক্ষণে সকালের মেঘলা কেটে বেশ চড়া রোদ উঠে গেছে। গির্জার বাগানের প্রতিটা গাছের ডাল, প্রত্যেকটা সমাধির কোণ, ভাঙা বারান্দা, আকন্দের ঝোপ, সমস্ত কিছু সেই রোদ্দুরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আড়াল বলে কোথাও কিছু নেই। কাজেই কাবুলের ক্যামুফ্লেজিং ইউনিফর্মও কাজে লাগল না। হাম্বীর সাক্সেনা আর তার দলবল একটা রঙ্গন গাছের পেছন থেকে কাবুলকে টেনে বের করল। তারপর তার হাত ধরে শূন্যে তুলে তাকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ঘোষণাও করে দিল।

এই সঙ্গেই কাবুলের কাকা শ্যামলের লুকিয়ে থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। এখন যদি সে তার লুকনোর জায়গা ছেড়ে বেরিয়েও আসে তাহলেও সে ফার্স্ট হবে। কারণ তার বেশি সময় ধরে আর কেউই লুকিয়ে থাকতে পারে নি। সেই কথাটাই মুখের কাছে মাইক ধরে তারস্বরে বারবার বোঝাতে লাগলেন হাম্বীর সাক্সেনা, "ওহে শ্যামল বসু, তোমার আর লুকিয়ে থাকার দরকার নেই। তুমি বেরিয়ে এসো। আমরা এখুনি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান শুরু করব।"

কাবুলও বেশ কয়েকবার খালি গলাতেই চেঁচালো, "ছোটকা বেরিয়ে এসো, এখনও তোমার লুকিয়ে থাকবার দরকারটা কী?"

কিন্তু কোন ফল হল না। শ্যামল বেরোল না।

ততক্ষণে বাইরে থাকা দর্শকেরা হুড়মুড় করে বাগানে ঢুকে পড়েছে। বিচারকদের সঙ্গে তারাও আঁতিপাঁতি করে বাগানে শ্যামলকে খুঁজতে শুরু করল। খোঁজার চোটে পুকুরের ব্যাঙগুলো সব লাফিয়ে পাড়ে উঠে পড়ল। বাগানের বহুদিনের বাসিন্দা হনুমানরা "উফ্ কী আপদ, উফ্!" বলে বাগান ছেড়ে পালাল। এমনকি গির্জার বাগানে ভাঙা ফোয়ারার নিচে লুকিয়ে রাখা ওলন্দাজ জলদস্যুদের একটা গুপ্তধনের বাক্স অবধি বেরিয়ে এল। বেরোল না শুধু শ্যামল বসু।

কেউ কেউ বলল, শ্যামল নিশ্চয় কোন এক ফাঁকে ভাঙা পাঁচিলের ফোকড় গলে বাইরে বেরিয়ে গেছে। এতক্ষণে সে হয়ত বাড়িতে পৌঁছে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বাড়িতে ফোন করে দেখা গেল শ্যামল বাড়িতেও নেই।

কী আর করা যাবে! ফার্স্ট প্রাইজটা বাকি রেখেই বাকি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান হয়ে গেল। দর্শকরা সব বাড়ি চলে গেল। বিচারক আর মিলন সংঘের কর্মকর্তারাও কাবুলের পিঠে হাতটাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে একে একে গাড়িতে উঠে পড়লেন। ফাঁকা গির্জার বাগানে বসে রইল একা কাবুল। ছোটকাকে না নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে কেমন করে? তার ভারি কান্না পাচ্ছিল। তার মন বলছিল ছোটকা নিশ্চয় বড় কোন একটা বিপদে পড়েছে। একটা পেয়ারা গাছের ভাঙা ডাল হাতে নিয়ে কাবুল এবার একাএকাই বাগানে ঘুরতে শুরু করল। এদিক দ্যাখে, ওদিক দ্যাখে, আর মাঝেমাঝে জোর গলায় ডেকে ওঠে, "ছোটকা আ আ আ !"

হঠাৎ একটা আমড়াগাছের পাতার আড়াল থেকে উত্তর ভেসে এল, "এই কাবুল, আমি এইখানে।"

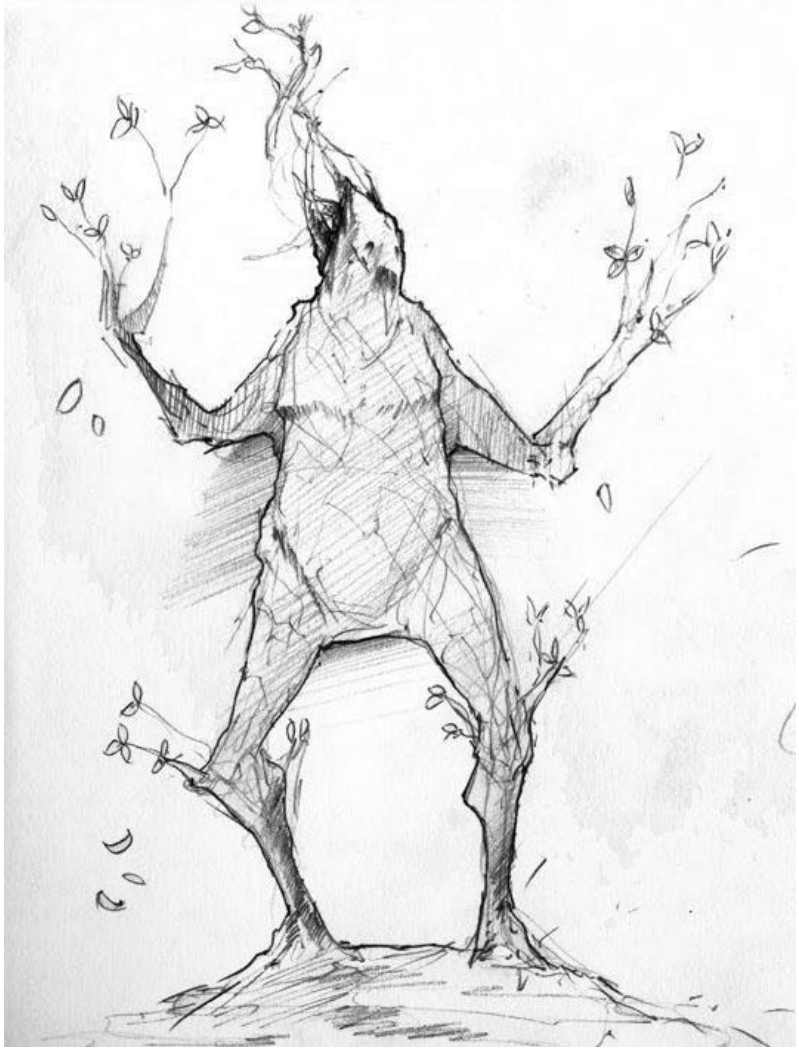

কাবুল একসঙ্গে অবাক এবং উল্লসিত হয়ে উঠল। এ যে ছোটকার গলা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়? আমড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কাবুল ডালপালার ফাঁকে তন্নতন্ন করে তার দৃষ্টিকে মেলে দিয়েও ছোটকার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না।

"কীরে? দেখতে পাচ্ছিস না? দাঁড়া আমি নামছি। বাগানে তুই ছাড়া আর কেউ নেই তো?"

কাবুলের বুকটা একবার কেঁপে উঠল ভয়ে। ছোটকা মরে যায়নি তো? মরে গিয়ে ভূত হয়ে যায়নি তো? তা না হলে সে ওকে দেখতে পাচ্ছে না কেন? যাই হোক, ছোটকার প্রশ্নের উত্তরে সে আমতা আমতা করে বলল, "না ছোটকা, আর কেউ নেই।"

কাবুলের কথা শেষ হওয়ামাত্র ঘন সবুজ আমড়াপাতার স্তূপের মধ্যে থেকে সবুজ রঙেরই একটা অংশ আলাদা হয়ে সড়সড় করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে নেমে এল। কাবুল অবাক হয়ে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটকা। তার গায়ের রঙ আদ্যোপান্ত গাঢ় সবুজ।

কাবুল হাঁ হয়ে দেখছিল ছোটকার এই অপরূপ রূপ। কিন্তু তার মুখের হাঁ বন্ধ হওয়ার আগেই ছোটকার গায়ের রঙ আবার পালটাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে তার গায়ের রঙ যে গাছের গুঁড়িটার সামনে ছোটকা দাঁড়িয়েছিল সেই গুঁড়িটার মত ঘন খয়েরি হয়ে গেল। কাবুল বলল, "ছোটকা, এ কী হচ্ছে?"

শ্যামল বলল, "কী হচ্ছে সে তো তুই বলবি। আমি তো তোর ল্যাবরেটরির টেবিল থেকে মশার ক্রিমের কৌটো নিয়ে এসেছিলাম। সেই ক্রিম গায়ে মেখে একটা শ্বেতপাথরের মূর্তির পেছনে লুকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার গায়ের রঙ শ্বেতপাথরের মত ধবধবে সাদা হয়ে গেল। ভয়ের চোটে সেখান থেকে বেরিয়ে গাছে উঠলাম। গায়ের রঙ হয়ে গেল গাছের পাতার মত ঘন সবুজ। তোরা যখন ফার্স্ট প্রাইজ নেবার জন্য আমাদের ডাকাডাকি করছিলিস তখন আমি তোদের থেকে ঠিক দু'হাত দূরে বুগেনভিলিয়ার ঝোপের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, তোরা আমাকে দেখতে পেলি না। অবশ্য আমি তোদের দোষও দিই না। তখন তো আমার গায়ের রঙ বুগেনভিলিয়ার টকটকে লাল ফুলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।"

কাবুল বলল, "আমাকে ডাকলে না কেন?

"ক্ষেপেছিস?" বলল ছোটকা, "তারপর সারা শহর আমাকে খাঁচায় ভরে টিকিট করে দেখতে আসত না? এখন তুই বল তো কাবুল, ওই মশার ক্রিমের কৌটোয় কী রেখেছিলিস?"

কাবুল বলল, "গিরগিটি লোশন রেখেছিলাম গো ছোটকা। ওই খালি কৌটোর মধ্যে আমার নব- আবিষ্কৃত লোশন রেখে তারপর নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম জিনিসটা কোথায় রেখেছি। শুধুমুদু চন্দ্রভানুকে দোষ দিচ্ছিলাম ও খেয়ে ফেলেছে ভেবে।"

"গিরগিটি লোশন মানে?"

"জ্যান্ত গিরগিটি নিয়ে ছ'মাস ধরে গবেষণার পর বানিয়েছিলাম ওই লোশন। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাইনি। অবশ্য পরীক্ষা করার আর দরকারও নেই। তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি অপারেশান সাকসেসফুল। ওই লোশন গায়ে মাখলে মানুষও গিরগিটির মতন রঙ পালটাবে।"

"খুব মজা, না?" খেঁকিয়ে উঠল শ্যামল। "অপারেশান সাকসেসফুল! এখন আমি কীভাবে রাস্তায় বেরোব বলে দে।"

কাবুল মুখে কিছু না বলে ছোটকার হাত ধরে টানতে টানতে পুকুরের ধারে নিয়ে গেল। এখানে আচ্ছা করে ধোলাই করার পরে শ্যামলের গা থেকে সবটা গিরগিটি লোশন ধুয়ে গেল। আস্তে আস্তে শ্যামলের অরিজিনাল কালো গায়ের রঙ ফুটে উঠল। তখন তার মুখে আর হাসি ধরে না। কিন্তু হঠাৎ ভাইপোর মুখের দিকে চোখ পড়তে সে তো বেজায় অপ্রস্তুত। কাবুলের দু চোখ জলে ছলছল করছে।

"কী হল রে কাবুল? কাঁদছিস কেন?" জিজ্ঞেস করল শ্যামল।

"ছোটকা, এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার করেও ধরে রাখতে পারলাম না। ফরমুলাটা তো আগেই চন্দ্রভানু খেয়ে ফেলছে। যেটুকু স্যাম্পল ছিল সেটুকুও এখন পুকুরের জলে ধুয়ে গেল। কী কী মিশিয়ে, কতক্ষণ ফুটিয়ে যে ওটা বানিয়েছিলাম সে'সব কিচ্ছু মনে পড়ছে না।"

ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে শ্যামল বলল, "কাঁদিস না রে কাবুল, ল্যাপটপটা তোকেই দিয়ে দেব। আর কেউ না জানুক, আমি তো হাতেনাতে প্রমান পেলাম তুই কতবড় বৈজ্ঞানিক! ও পুরষ্কার তোরই প্রাপ্য। আরেব্বাপ—হেল্প হেল্প মার্ডা- আ- আ- র!!"

আর কোন কথা না বলে ছোটকা দৌড় লাগাতে বাধ্য হল, কারণ কাবুলের পকেট থেকে অলাবু নামে সেই লাউডগা সাপটা জিভ বের করে তার নাক চেটে দিয়েছিল।

আইসক্রিমওয়ালা

শিশির বিশ্বাস

বছরের একটা সময় সূর্যটা গনগনে হয়ে ওঠে। সেই দারুণ আঁচে ওদের এই দুর্গাপুর শহর তখন ফুটিফাটা হয়ে যায়। দুপুরের আগেই পথে কমে আসে মানুষ। ধুঁকতে থাকে শহরটা। কেন এমন হয়, সূর্য কেনও এমন ভয়ানক হয়ে ওঠে, বুঝে উঠতে পারে না ছেলেটা। আসলে কোনও কিছুই তেমন সহজে বুঝে উঠতে পারে না বেচারা। সহজে কিছু করেও উঠতে পারে না। ঢিলেঢালা গোছের ছেলেটা হামেশাই খোঁচায় বেধে ছিঁড়ে ফেলে জামা–প্যান্ট। বই–খাতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে কখনও। ক্লাসে সারাটা সময় কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকে লাস্ট বেঞ্চে। দ্রুতপাঠের পিরিয়ডে যখন ওর পালা আসে, ঘেমে–নেয়ে বই হাতে কোনওমতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর তোতলাতে শুরু করে। হেসে ওঠে সারা ক্লাস। এক লাইনের বেশি আর পড়া হয়ে ওঠে না। মাস্টারমশাই চলে যান পরের জনের কাছে।

দিনকয়েক আগে ক্লাসে ওই শীত–গ্রীষ্মের ব্যাপারটাই বোঝাচ্ছিলেন মাস্টারমশাই। পৃথিবীর বার্ষিক গতি। বেচারা বুঝতে পারেনি তেমন। গোড়ার দিকে বেশ আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা

করেছিল। কিন্তু যত এগোতে লাগল, ক্রমশ গুলিয়ে আসতে লাগল। প্রশ্ন করে হয়তা জেনে নেওয়া যেত। কিন্তু সাহস করে উঠতে পারেনি। বরং ওর মাথায় তখন পাক খাচ্ছিল অন্য এক ব্যাপার। সেই অদ্ভূত মানুষটার কথা। একমাথা রুক্ষ চুল। তেল পড়েনি অনেক দিন। পরনে তালি দেওয়া বিবর্ণ একটা হাফ প্যান্টের সঙ্গে আধছেঁড়া শার্ট। দুপুরে দারুণ রোদ আর গরমে যখন হাঁফাতে থাকে ওদের গলিটা, শীর্ণ মানুষটাকে তখন দেখা যায় পথে। পিঠে বড় একটা বাক্স ঝুলিয়ে ঈষত্ কুঁজো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে আসে। গনগনে রাস্তায় খালি পায়ে চলতে চলতে সুরেলা গলায় হাঁক পাড়ে, 'আইক্রিম, আইসক্রিম চাই।'

পিঠের ওই বাক্সে এক চমৎকার জগত্ বয়ে আনে মানুষটা। এই দারুণ গরমে স্বপ্নের মতো এক টুকরো শীতল মনোরম পরিবেশ। এক একটা আইসক্রিমের দাম পঁচিশ পয়সা। তাও থাকে না ওদের এই গলির অনেকের কাছেই। তবু ওই ডাক শুনলেই হইহই করে বের হয়ে আসে ছোটরা। খদ্দের জুটলে লোকটা ধীরেসুস্থে নামায় বাক্সটা। কাঁধের তেলচিটে গামছায় মুখের জবজবে ঘাম মুছে ঢাকনা খোলে। দ্রুত একটা আইসক্রিম বের করে মুহূর্তে বন্ধ করে দেয় আবার। এই সময়টার জন্যই হাঁ করে থাকে ছেলেটা। ঘেঁসে আসে বাক্সটার কাছে। মুহূর্তের জন্য হলেও ওই সময় এক টুকরো হিমেল ছোঁয়া পাওয়া যায়। পয়সা জোটেনা রোজ। আর জুটলেও আরামে আইসক্রিম চাটতে চাটতে ঘেঁসে থাকে লোকটার অদ্ভূত ওই বাক্সটার কাছে। ফের ঢাকনা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাথার ভেতর কত কিছু ঘুরে বেড়ায় তখন। মনে হয়, লোকটার ওই বাক্স যদি আরও অনেক, অনেক বড় হত, ওদের এই দুর্গাপুর শহরটাকে যদি ভরে ফেলা যেত তার ভেতর, কী ভালই না হত তা হলে! হাঁফ ছেড়ে বাঁচত সবাই। সাহস করে একদিন সেকথা বলেও ফেলেছিল লোকটাকে।

শুনে মানুষটা ম্লান হেসে বলেছিল, 'সে যে অনেক মেহনতের ব্যাপার খোকাবাবু! অত শক্তি যে আমার নেই ভাই।'

একটু লজ্জাই পেয়েছিল ছেলেটা। সত্যিই তো! ওই ছোট বাক্স বইতেই শীর্ণ মানুষটা নুয়ে পড়ে। পায়ে একজোড়া জুতোও নেই। দুপুরের রোদে তেতে ওঠা এই ভয়ানক রাস্তায় ওইভাবে কি হাঁটা যায়! অনেক ভেবে ঠিক করেছিল নিজের চটিজোড়া দিয়ে দেবে ওকে। সকালে স্কুল। কয়েকটা মাস খালি পায়ে ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে। মা জিজ্ঞাসাও করবেন না। ভাববেন, বই–খাতার মতো এবার জুতোও হারিয়ে ফেলেছে তার হাবাগোবা ছেলেটা। তবু মুশকিল ওই মা'কে নিয়েই। ছোট এক কারখানায় ঠিকে কাজ করেন। মা–ছেলের কোনমতে চলে যায়। দুপুরের টিফিন বাঁচিয়ে মা ঠিক কিনে আনবেন নতুন একজোড়া জুতো। ও কিছুতেই বোঝাতে পারবে না, কয়েকটা মাস খালি পায়ে ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু আরও অনেক কিছুর মতো ছেলেটার এই কাজটাও শেষ পর্যন্ত হয়নি। ও অবশ্য একদিন লোকটাকে বলেছিল, 'আইসক্রিমকাকু, আমার চটিটা নেবে তুমি?'

শুনে অবাক চোখে তাকিয়েছিল মানুষটা। তারপর ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, 'খোকাবাবু, তোমার ওই ছোট পায়ের চটিতে যে আমার হবে না ভাই।'

তাইতো! ব্যাপারটা একবারও ভাবেনি ছেলেটা। ও কুঁকড়ে গিয়েছিল লজ্জায়। লোকটা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'তাতে কী হয়েছে খোকাবাবু।'

'কিন্তু এই গরমে কষ্ট হয় না তোমার?' বলেছিল ছেলেটা।

'তা হয় হয়তো।' লোকটা ওর আরও কাছে ঘেঁসে এসেছিল, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানো? কাউকে তো কষ্ট করতেই হবে। নইলে কবেই থেমে যেত সবকিছু। তুমি কিন্তু বড় হবে খোকাবাবু। অনেক বড়।'

লোকটার গোড়ার দিকের কথা সব বুঝতে পারেনি ছেলেটা। কিন্তু ওই শেষের কথায় হেসে ফেলেছিল শেষ পর্যন্ত। কারণ ওর যে কিছু হবে না, তা সবাই জানে। ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসে। পড়া পারে না কখনও। হারিয়ে ফেলে বই–খাতা। সবই তাই বলে ভোম্বল। এমনকি মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত। শুনে শুনে ওর নিজেরই কখনও মনে হয়, বুঝি ওটাই ওর আসল নাম।

দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের ক্লাস থ্রি'র লাস্ট বয় সেই ছেলেটা এভাবেই হয়তো হারিয়ে যেত একদিন। যেভাবে হারিয়ে যায় ভোম্বলদের মতো আরও অনেকে। কিন্তু হঠাৎ সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে গেল। স্কুলে সেবার একজন নতুন মাস্টার এলেন। বয়স তেমন বেশি নয়। গালে হালকা দাড়ি–গোঁফ। সরু সোনালি ফ্রেমের চশমার আড়ালে স্বপ্নময় দুটি চোখ। প্রথম দিন ক্লাসে এসেই মানুষটি কাঁধের ঝোলা থেকে বের করলেন ছবিতে ভরা গোটা কয়েক বই। চমৎকার কণ্ঠস্বরে একে একে পড়ে গেলেন কয়েকটা গল্প। এই প্রথম ছেলেটা ক্লাসে হাঁ করে শুনল মাস্টারমশায়ের কথা। নীল সমুদ্রের অভিযাত্রী কলম্বাসের গল্পটা যখন উনি পড়ছিলেন, সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল। অথচ কলম্বাসের কথা পড়ার বইতেও রয়েছে। ক্লাসে পড়ানোও হয়ে গেছে। একটুও ভাল লাগেনি তখন।

প্রথম পিরিয়ডটা বড্ড তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল সেদিন। ঘণ্টা পড়তেই বই বন্ধ করলেন নতুন মাস্টারমশাই। মিষ্টি হেসে বললেন, 'হেডমাস্টারমশাইকে বলে আজ পরের পিরিয়ডটাও চেয়ে নিয়েছি। তবে এই পিরিয়ডে গল্প নয়, ক্লাসের কাজ দেব একটা। তোমরা বড় হয়ে কে কী হতে চাও, অল্প কথায় চটপট লিখে ফেল দেখি।'

শুনে মুষড়ে পড়েছিল ছেলেটা। একটু আগের সব উৎসাহ নিভে গিয়েছিল মুহূর্তে। কিন্তু নতুন মাস্টারমশাই যখন জানালেন, লিখতে হবে সবাইকেই, পিরিয়ডের শেষে প্রত্যেকের কাছে

গিয়ে খাতা নেবেন তিনি, খাতা পেনসিল নিয়ে অগত্যা বসতেই হল তাকে। গোটা গোটা অক্ষরে লিখেও ফেলল কয়েকটা লাইন। পিরিয়ড শেষ হতে খাতাগুলো ঝোলায় ভরে চলে গেলেন তিনি।

পরের দিন যথাসময়ে নতুন মাস্টারমশাই হাজির হয়েছেন ক্লাসে। ছেলেটা ভুলেই গিয়েছিল আগের দিনের কথা। কিন্তু চেয়ারে বসেই তিনি যখন ঝুলি থেকে খাতাগুলো বের করলেন, বেচারা কুঁকড়ে আধখানা হয়ে গেল। ততক্ষণে খাতাগুলো তিনি টেবিলের উপর রেখেছেন। সামনে ছেলেদের উপর সামান্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'গতকাল আসল কাজটাই করা হয়নি। তোমাদের সাথে পরিচয়পর্ব। এক ফাঁকে সেটা সেরে নেব আজ। তবে তার আগে বলি, তোমাদের খাতাগুলো আমি দেখেছি। অনেকের লেখাই খুব ভাল হয়েছে। কেউ ডাক্তার হতে চাও, কেউ ইঞ্জিনিযার। কেউ হতে চায় মস্ত বৈজ্ঞানিক। চমৎকার হয়েছে। স্বপ্ন দেখতে না জানলে যে বড় হওয়া যায় না ভাই। তবে তোমাদেরই একজন এসবের কিছুই হতে চায় না। তার খাতাটাই পড়ছি আমি।' বলতে বলতে বান্ডিলের ভিতর থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে তিনি পড়তে শুরু করলেন, 'আমি বড় হয়ে এক আইসক্রিমওয়ালা হতে চাই।'

মুহূর্তে সারা ক্লাসে হাসির রোল উঠল। হাসলেন মাস্টারমশাইও। তারপর হাসির রোল থামতে গোড়া থেকে শুরু করলেন আবার, 'আমি বড় হয়ে এক আইসক্রিমওয়ালা হতে চাই। যখন এই শহর গরমে ফুটিফাটা হয়ে উঠবে, দারুণ গরমে আইঢাই করবে মানুষ, পিঠে বাক্সে করে বয়ে আনব এক টুকরো মনোরম জগত, ঠিক স্বপ্নের মতো। সেই স্বপ্নের ছোঁয়া একটু হলেও তো দেওয়া যাবে কাউকে...।'

ধীরে ধীরে পুরো লেখাটা পড়ে শেষ করলেন তিনি। খাতা থেকে চোখ তুলে তাকালেন, সামনে ছেলেদের দিকে। শেষ বেঞ্চে বসা সেই ছেলেটার মুখ তখন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। মস্টারমশাই বললেন, 'দেবজ্যোতি দাস কে?'

দেবজ্যোতি, দেবজ্যোতি? সারা ক্লাস থমকে গেল হঠাত্। তারপর একসাথে শোরগোল উঠল, 'ভোম্বল, ভোম্বল স্যার।'

'কে ভোম্বল?' বললেন উনি।

ঘাড় নিচু করে কোনওমতে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি।

'মাথা উঁচু কর দেবজ্যোতি।' বললেন উনি, 'সেরা লেখাটা কিন্তু তুমিই লিখেছ। দশে দশ নম্বর। আজ থেকে তুমি ক্লাসের মনিটর।'

ততক্ষণে মাথা তুলেছে ছেলেটা। নিজের কানকেও তখন যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও দেখতে পারছিল, সারা ক্লাস কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। ফার্স্ট বয় নবেন্দু পর্যন্ত।

'তা হয় না স্যার। ক্লাসের মনিটর যে নবেন্দু।' সবাইকে অবাক করে দিয়ে অদ্ভুত দৃঢ় গলায় বলল ছেলেটা।

মৃদু হাসলেন মাস্টারমশাই। এগিয়ে এসে পিঠটা চাপড়ে দিলেন ওর, 'কিন্তু আইসক্রিমওয়ালা হতে হলে আজ থেকে তোমাকে যে ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে হবে দেবজ্যোতি।'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। বই–খাতা তুলে নিয়ে গটমট করে হেঁটে বসে পড়ল ফার্স্ট বয় নবেন্দুর পাশে।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

ভ্রমণ

পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

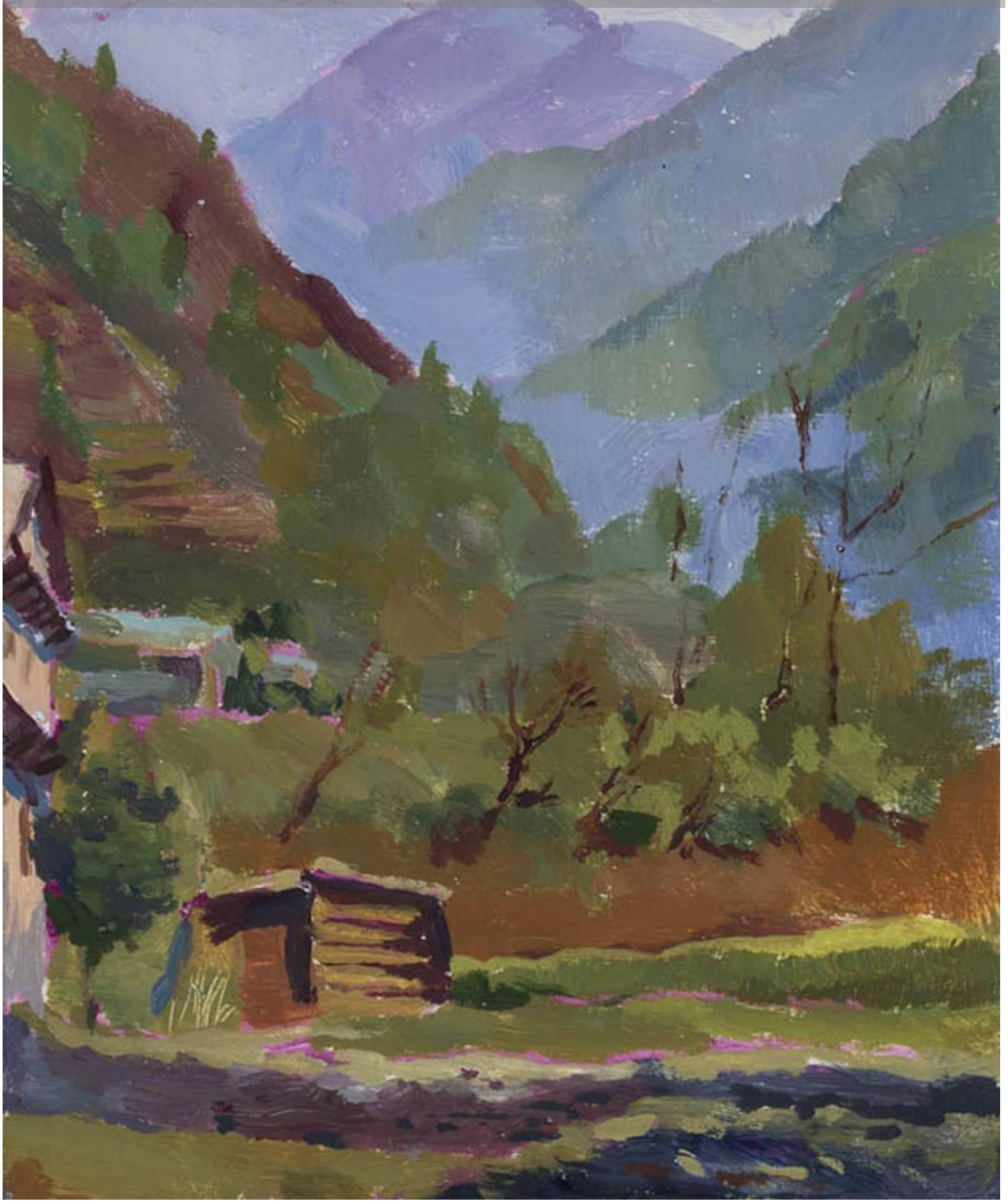

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, " জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর....."

তাতরা

অনেকের মুখে শুনেছিলাম লাটকোপরির জঙ্গল খুব ঘন ও গভীর। ভালুক তো আছেই, লেপার্ড ও অন্য মাংসাশী প্রাণীরও যে অভাব আছে তা মনে হয় না। গাড়োয়ালের একেবারে পূর্ব অংশে এই জঙ্গল, নন্দাকিনী নদীর দুপাশ জুড়ে। নন্দাঘুন্টি নামে যে পর্বতচূড়া তার পায়ের তলা দিয়ে বয়ে এসেছে দুটি ধারা, নন্দাকিনী আর রূপকিনী নামে দুটি নদী। দুই বোন যেন, তারপর মিলে গিয়ে নাম হয়েছে নন্দাকিনী। অনেকটা দক্ষিণ পশ্চিমে বয়ে এসে সে আবার মিশেছে পিন্ডার নদীতে। নন্দাঘুন্টির খুব কাছেই রূপকুন্ড। যে কুন্ডের সাথে জড়িয়ে আছে নানান লোকগাথা। রাজা যশোদয়াল আর তার রানির ওপর দেবীর অভিশাপ নেমে আসার কাহিনী। দেবতার কোপে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত মানুষের হাড়গোড় আজও রয়েছে রূপকুন্ডের পাশে বরফচাপা হয়ে। সে অবশ্য অন্য গল্প।

রূপকুন্ড ফেরৎ একবার আমরা ঢুকে পড়লাম ডেলডুং বুগিয়ালে। এর ঠিক নিচেই লাটকোপরির জঙ্গল। আর আরও নিচে নন্দাকিনীর প্রবাহ। ডেলডুং বুগিয়ালে দুদিন কাটিয়ে তৃতীয় দিনে জঙ্গলে ঢুকে পড়া গেল। পাহাড়ের তীব্র ঢালে ঘন জঙ্গল। গাছপালায় এমনই ঠাসা যে দশ হাত এগিয়ে গেলে সঙ্গী লোকটিকে দেখা যাচ্ছে না। চেঁচিয়ে জানান দিতে হচ্ছে কে কোথায়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ওই অঞ্চলের অভিজ্ঞ দুজন গাইড। নাথু সিং আর ভগৎ সিং। আমরা যখন জঙ্গলের পথে নাস্তানাবুদ তখন ওই দুজন আমাদের ক্রমাগত সাহস জুগিয়ে যাচ্ছেন। ভয় নেই বলে। আর কী আশ্চর্য কায়দায় কান পেতে জলের শব্দ শুনে আর বাতাসের গতি আর জঙ্গলের হালচাল বুঝে আমাদের নামিয়ে আনতে থাকলেন খাড়া পাহাড়ের ঢাল ধরে। মাঝে মাঝে গাছের হেলানো ডালে শুয়েই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তারা। শেষমেশ নিচে যখন নেমে এলাম নদীর পাড়ে দেখি চারপাশে জঙ্গলের মাঝে ঐ একফালি জায়গাই একটু ফাঁকা। সেই মাঠের মতো সমতল জায়গাটাতে স্লেট পাথরের স্তূপ। গ্রামের মানুষেরা ওই পাথর কেটে নিয়ে গিয়ে টালির মতো লাগিয়ে লাগিয়ে ঘরের ছাউনি তৈরি করেন।

নদী পার হয়ে আমরা গ্রামে ঢুকতেই তেড়ে বৃষ্টি এল। এ গ্রামে আমাদের থাকবার কথা ছিল না। এবারে থামতেই হল। ভিজে চুপ্পুস হয়ে সামনের বাড়িটাতেই আমরা দুদ্দাড় করে ঢুকে এলাম। এই গ্রামটাই তাতরা।

বাড়ির মালিক তো খুব খুশি মনে আমাদের ভেতরে এসে বসতে বললেন। একটা বড় ঘর। তার মাঝামাঝি জায়গাতে একটা কাঠের উনুন। ওইটি সারাদিন জ্বলে। রান্না হয়। জল গরম হয়। ঠান্ডায় হাত পা সেঁকা হয়। মাঝে মাঝে উনুনে কাঠের টুকরো গুঁজে দিতে হয় যাতে আগুন বজায় থাকে। ধিকি ধিকি বা গনগনে, যখন যেমন প্রয়োজন। বাইরে বৃষ্টি, তার ফলে ঠান্ডাও বেড়ে গেছে। আমরা সবাই গোল হয়ে উনুনের চারধারেই বসলাম। বাড়ির মালকিন একধারে বসে রুটি সেঁকছিলেন। অতিথি নারায়ণ। একটা একটা রুটি সকলের হাতে দিয়ে বাড়ির কর্তামশাই হই হই করে গল্পে মেতে উঠলেন। ততক্ষণে গরম চা- ও চলে এসেছে সকলের হাতে। এমন অযাচিত আদর পেয়ে আমরা তো অভিভূত। অথচ গ্রামের মানুষের কাছে এ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষ মানুষকে এমনই সাহায্য করবে ভালোবাসবে এটাই তো দস্তুর। সেকথা তো আজ সকলেই ভুলতে বসেছে।

আমাদের গাইড যারা ছিলেন তারা তো এলাকার লোক। তারাও জুটে গেল গল্পে। তারই একখানা রোমহর্ষক সত্যি ঘটনা যতখানি মনে পড়ছে তোমাদের শোনাচ্ছি।

একবার ভগৎ সিং আর নাথু সিং নিজেদের গ্রাম ওয়ানে ফিরছিলেন। পথ সংক্ষেপ করার জন্য কিছুটা পথ পড়ে এই লাটকোপরির জঙ্গলের ভেতর। তখন দুপুর পেরিয়ে সবে বিকেল হয়েছে। একটানা চড়াই উঠে দুজনেই খানিকটা জিরিয়ে নিতে একটা গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মিনিটখানেক বাদে নাথুজি দেখলেন কালো মতো একটা লোক সামনের ঝোপের আড়াল থেকে ওঁকে দেখছে। ভালো করে ঠাহর করতে করতেই লোকটা জঙ্গলের সরু পথটার ওপর এসে দাঁড়াল আর নাথুজি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। চল্লিশ হাত দূরে দাঁড়ানো একটা

কালো ভালুক। দুপায়ে দাঁড়িয়ে সে স্থির চোখে এদিকে তাকিয়ে। নাথুজি খানিকটা ভয় পেলেও হটে না গিয়ে সোজা এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভালুকের চোখের দিকে। কার মনের কতটা জোর যেন তার পরীক্ষা চলেছে। বেশ খানিক সময় পর ভালুক রণে ভঙ্গ দিয়ে পাশের ঝোপে চলে গেল। এমনটা যদিও এরা আশা করেননি তবু ভালুক সরে যেতেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেখান থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

উৎরাইয়ের রাস্তায় পেছন থেকে ভালুক তাড়া করলে ভয় কম। ভালুকের চোখের লোম বড়ো বড়ো হয় বলে উৎরাইয়ের সময় সেটা ওদের চোখের ওপর এসে পড়ে ফলে দেখার অসুবিধে হয়। ভালো দেখতে না পাবার দরুণ গতিও যায় বেশ কমে। ভগৎজি এসব বলবার ফাঁকে এমন মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন যেন বেড়ালছানার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার কথা হচ্ছে।

তো দুজনে তো তড়িঘড়ি পা চালিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন। বেশ খানিকটা চলার পর তখন জঙ্গল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নাথুজি একটু পেছনে, ভগৎ তার থেকে দশ কদম আগে এগিয়ে গেছেন। বিকেলের আলো কমে আসছে। আবার সুমুখে উদয় আরেকখানি ভালুক। ভগতজির ভাষায় আগের ভালুকটার বড়দা হবে কেননা এটি একটু বড়ো। এবারে কিন্তু সেটা বেশ তেড়েই এল। ভগৎ আর নাথু চট করে দু দুটো গাছে আড়াল নিলেন। দুটো গাছই বেশ লম্বা আর তার গুঁড়ির দিকটা যথেষ্ট মোটা। আড়াল পেয়ে ভালুকটা খানিক থমকে গেল। তারপর ভগৎ যে গাছটার আড়ালে সেটার দিকে ঘুরতে লাগল। ভালুক ঘোরে ভগতও ঘোরেন। এমনি চলতে চলতে একসময় ভালুকটা গাছটাকে বেড় দিয়ে দুহাত মেলে ভগৎকে ধরতে গেছে। অমনি ভগৎ সিং দুহাত দিয়ে ভালুকের দু হাত শক্ত করে ধরে গাছের গায়ে এমন ভাবে তার বুক

ঘষে দিলে যে বেচারা হাউ মাউ করে পালাতে পথ পায় না। কিন্তু অমন অমানুষিক কান্ড করবার পর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে ভগৎ গেলেন অজ্ঞান হয়ে আর তাকে কাঁধে ফেলে নাথুজি পাঁই পাঁই ছুট লাগালেন একেবারে গ্রাম অবধি। গ্রাম প্রায় এসেই গিয়েছিল, তাই রক্ষা।

আমরা, যারা গল্প শুনছিলাম তাদের চোয়াল প্রায় আধহাত ঝুলে পড়েছিল এ গল্প শুনে। নাথুজি চোখ নাচিয়ে এক অদ্ভুত কায়দায় জিভ উলটে শিস দিচ্ছিলেন, ভাবখানা এমন যে এ তো হামেশাই ঘটে থাকে গো! এ আর নতুন কথা কি! লাটকোপরি জঙ্গলের ওপরের বুগিয়ালে ভেড়া চড়াতে গিয়ে কি শের দেখিনি আমরা, ভেড়া, কুকুর তুলে নিয়ে যায়নি কি তারা?

ভাবো একবার, কতটা গায়ের জোর আর মনের জোর থাকলে একটা ভালুকের হাত ধরে তাকে সজোরে অমন রগড়ে দেওয়া যায়। অথচ এমনিতে মাটির মানুষ আমাদের ভগৎ সিং।

গল্প শুনতে শুনতে বৃষ্টিও থেমে এসেছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে, বৃষ্টিভেজা জামা জুতো মোজাও খটখটে করে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে আগুনে। এবারে ওঠার পালা। বাড়ির সকলেই থেকে যাবার জন্য এমন করে আমাদের পীড়াপীড়ি শুরু করলেন যেন আমরা কতকালের আত্মীয়। তাতরা গ্রামে আমাদের থাকার কথা নয়। উপায়ও ছিল না। তাই এগিয়ে যেতেই হল। জঙ্গলের গা ঘেঁষা তাতরা গ্রামের মাত্রই দশ বারোখানা ঘরের পাশ দিয়ে আমরা নদীর এপারের পায়ে চলা রাস্তায় উঠে এলাম। এই রাস্তা নদীর অনেকটা ওপর দিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে পাশের গ্রামে। তার নাম সুতোল। সুতোল পৌঁছনোর মুখে অনেক উঁচু থেকে আমরা দেখতে পেলাম রূপকিনী এসে মিলেছে নন্দাকিনীতে।

ভূতুড়ে বাড়ি

ন্যাশানাল লাইব্রেরির ভূতেরা

পিকলু

ন্যাশানাল লাইব্রেরির কথা তো আমরা সবাই জানি, বেলভিডিয়ার স্ট্রিটে অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম লাইব্রেরি এটি। কিন্তু কেউ কি আগে শুনেছো এই সুবিশাল লাইব্রেরির ভূতেদের গল্পও? এ লাইব্রেরিটা আমাদের সবার যেরকম প্রিয় সেরকম ভূতেদেরও খুব প্রিয়।

ন্যাশানাল লাইব্রেরির সূচনা ১৮৩৬ সনে , নাম ছিল কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি। এদিকে ইংরেজরা তাদের জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি গঠন করেন ১৮৯১, সালে মেটকাফ হল- এ (এসপ্লানেড চত্তরে)। পরে ১৯০৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন এই দুই লাইব্রেরিকে একত্র করেন ভারতীয় জনসাধারণের জন্য। স্বাধীনতার পরে ১৯৫২ সালে এসপ্লানেড থেকে বেলভিডিয়ার স্ট্রিটে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করা হয় ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির নাম পালটে হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল লাইব্রেরি।

এই লাইব্রেরি তৈরির সময় ১২ জন শ্রমিক একটা দুর্ঘটনায় মারা যান। লাইব্রেরি তৈরির পর আজও সন্ধের পর মাটিতে চক দিয়ে খসড়া আকঁতে আঁকতে তাঁদের কাউকে কাউকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখা যায়।

এই বেলভিডিয়ার এস্টেট বেশ প্রাচীন একটা জায়গা। মিরজাফরের হাতে তৈরি। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির গভর্নরদের জন্য। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর বাড়ি ছিল এখানে। এখনো মাঝে মাঝে রাতে, যখন লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায়, নাইটগার্ডরা লাইব্রেরির বন্ধ দরজায় এক সুবিশাল ঘোড়ার গাড়ি থামার শব্দ পান। শোনা যায় হেস্টিংস সাহেব ও তার স্ত্রীর পায়ের শব্দ। এক এক সময় আবার নাইটগার্ডের বেশে একজনকে লাইব্রেরির গেটের সামনে দেখা গেছে যেন বাড়ি যাবেন, হাত দেখিয়ে ট্যাক্সি দাঁড় করাতে ও আবার ট্যাক্সিতে উঠেই অদৃশ্য হয়ে যেতে।

আমাদের ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে প্রায় ২২ লাখেরও বেশি বই আছে, আছে দুষ্প্রাপ্য কিছু নথি, আর চিঠি। একবার এক ইংরিজির ছাত্র তার পেপারের জন্য প্রায় নিয়মিত লাইব্রেরিতে আসতো। দুর্ভাগ্য, পেপার শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়। ছেলেটি ভিক্টোরিয়ান যুগের কিছু

দুর্লভ চিঠি পড়তে আসতো লাইব্রেরিতে। এখন অবাক করার বিষয় এই যে সেই সব চিঠি সারাদিনে যতই আগোছালো হয়ে থাকুক না কেন পরদিন সকালে এসে ঠিক গোছানো অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেকে একটি টাইপরাইটার ও দেখেছেন, যেটিতে টাইপিং এর কাগজ নেই, টাইপ করার লোকও নেই তবু সেটি থেকে টাইপিং এর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে জানে সেই ছেলেটি হয়তো জীবিত অবস্থায় যা শেষ করতে পারেনি এখন সেই পেপারটাই শেষ করছে।

২০১০ সালে আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া লাইব্রেরি বিল্ডিং মেরামত করতে গিয়ে একটা গুপ্ত চেম্বার এর খোঁজ পান। প্রায় হাজার বর্গফিটের এই চেম্বারটির কোনো দরজা- জানালা নেই। মনে করা হচ্ছিল হয়তো এই চেম্বারটি হেস্টিংস সাহেবের আমলে নৃশংস নির্যাতনের জন্য ব্যবহৃত হত। আর্কিয়োলজিকাল সার্ভের লোকেরা চেম্বারটিতে একটি গর্ত করলে সেখানে শুধুই দুর্গন্ধ, পচা কাদামাটি খুজে পান। কে জানে হয়ত এইসব অত্যাচারিত মানুষদেরই পচা গলা দেহ প্রায় আড়াইশো বছর ধরে জমে থাকতে থাকতে কাদা হয়ে গেছে।

শলকেনের ছবি

জোসেফ শেরিডান লে ফানু

অনুবাদঃ মহাশ্বেতা

এই মুহূর্তে শলকেনের আঁকা একটা অসাধারণ ছবি আমার হাতে রয়েছে। ছবিটা ভাল ভাবেই সংরক্ষিত। আর শলকেনের অধিকাংশ ছবির মত এটারও আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল চিত্রকরের আলোর ব্যবহার। 'আপাতদৃষ্টিতে' বললাম কারণ আসলে ছবির বিষয়টিতেই ছবির মূল্য, চিত্রকরের কারিগরিতে নয়। ছবির বিষয়টি সাধারণ। প্রাচীন কোন মঠের একটা কক্ষের ভিতরের দৃশ্য। আর তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পোশাক পরা একটি মেয়ে। তার মুখের সামনে আধা- স্বচ্ছ কাপড়ের ঘোমটা। ধর্মীয় পোশাক নয়। তার হাতে একটা বাতি। সেটার টিমটিমে আলোতেই তার শরীর আলোকিত হয়ে উঠেছে। তার মুখে একটা মিটমিটে হাসি। কিন্তু সেই হাসি আনন্দের নয়, বরং মেয়েলী দুষ্টুমির হাসি বলা চলে সেটাকে। আর তার অনেক পেছনে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা লোক। ফায়ারপ্লেসের নিভু নিভু আগুনের আলোয় তার চেহারাটা অল্প বোঝা যাচ্ছে। তার মুখে পরিস্ফুট ভয়। তার হাতটা তার কোমরে বাঁধা তরবারির হাতলে, যেন টেনে বার করতে চলেছে। তার পরণে ফ্লেমিশ পোশাক।

কিছু ছবি দেখলে মনে হয় যে তার বিষয়বস্তু শুধু শিল্পীর কল্পনাই নয়, তার পেছনে আছে বাস্তবেরই কোন ঘটনা। শলকেনের এই ছবিটাও সেরকম। এর দৃশ্যপট, চরিত্র, ঘটনা, সবকিছু কেমন যেন জ্যান্ত। ছবিটাতে এমন কিছু একটা আছে যেটা তার ওপর একটা বাস্তবের ছাপ ফেলে।

অবশ্য সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আসলে ছবিটাতে একটা অতীব রহস্যময় অথচ সত্যি ঘটনার নিখুঁৎ বিবরণ দিতে চেয়েছিলেন শিল্পী। ছবির কেন্দ্রে যে মেয়েটিকে আমরা দেখতে পাই, সে নাকি জেরার্ড ডোউয়ের ভাইঝি, রোজ ভেল্ডেরকস্টের প্রায় আক্ষরিক প্রতিচ্ছবি। গডফ্রে শলকেনের জীবনে ওই এক রোজ ছাড়া আর কোন নারীর আবির্ভাব ঘটেনি। আমার প্রপিতামহ শলকেনের বন্ধু ছিলেন, আর তার নিজের মুখেই এই ছবির পেছনের ভয়ংকর গল্পটা শুনেছিলেন। আসলে ছবিটা তাঁর থেকেই উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন তারপর। সেদিন থেকে ছবিটা ও গল্পটা আমাদের বংশানুক্রমিক সম্পত্তি। প্রথমটার কথা বলেছি, এবার দ্বিতীয়টার কথা বলা যাক।

গডফ্রে শলকেনের চেহারায় বা আচরণে দর্শনীয় কিছুই ছিল না। হ্যাঁ, ছবিটা বরাবরই ভালই আঁকতেন। চিরকালই তার তেলরঙের হাত ভাল। তার কাজের অথচ মানুষ হিসেবে ছিলেন অমার্জিত ও ভোঁতা। তার ছবি এই এত বছর পরেও সমালোচকদের চোখের মণি অথচ তার জীবদ্দশায় তাঁকে সবাই এড়িয়েই চলতেন তাঁর অসামাজিক আচরণের জন্য। তাতে অবশ্য তাঁর জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি। ভাবতেই অবাক লাগে যে এই বদমেজাজি, রুক্ষ, জেদি, জনপ্রিয়

মানুষটাও একসময় অন্যরকম ছিলেন। তাঁরও আনন্দের সময় ছিল, তাঁর জীবনেও বসন্ত এসেছিল। বা কোন রহস্য- রোমাঞ্চের কাহিনীতে তিনিই ছিলেন নায়ক।

অমর শিল্পী জেরার্ড ডোউএর ছাত্র ছিল শলকেন একসময়। সে তখন এক অনভিজ্ঞ তরুণ। স্বভাবতই ধীর স্থির হওয়া সত্ত্বেও জেরার্ডের ফুটফুটে ভাইঝি রোজকে তার খুব মনে ধরেছিল। রোজ তখনও কিশোরী, সবে সতেরোয় পড়েছে। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। নরম- সরম, বাচ্চাদের মত চেহারা, সোনালী চুল –ওই এলাকার সবচেয়ে রূপবতী মেয়ে সে। ধনী শিল্পীর একমাত্র ভাইঝি, আর শলকেন কিনা চালচুলোহীন এক ছোকরা! বিয়ের কথা মাথায় আসা সত্ত্বেও লজ্জায় ও ভয়ে মাস্টারমশায়কে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলতে পারেনি সে। কিন্তু মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, একদিন না একদিন সে বড় হবেনই। পাবে অনেক খ্যাতি, স্বীকৃতি ও অর্থ। সেইদিন মাথা উঁচু করে রোজকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। অতএব দারুণ খাটতে লাগল সে। রাতের পর রাত জেগে আঁকার হাত পাকাতে লাগল। তার সামনে অবশ্য ছিল অনেকগুলো দুঃসহ বছর। কিন্তু সে কথা তো সে আর তখন জানতো না, তাই প্রাণপণে খেটে এক সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত সে। পরবর্তী কালে শিল্পী হিসেবে তার খ্যাতিই দেখিয়ে দেয় যে তার সেই অধ্যাবসায় ও হাড়-ভাঙা খাটুনি বৃথা যায়নি।

তারপর একদিন তার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল এমন রহস্যময়ভাবে যে এখন প্রায় এক শতাব্দি পরে আমার সে কথা বলতে গায়ে কাঁটা দেয়। যাহোক ঘটনাটায় আসা যাক। সেদিন শলকেন একা একাই একটা ছবি আঁকছিল। ডোউ এর অন্যান্য ছাত্রেরা সবাই একে একে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু শলকেন আঁকার নেশায় তখনও এঁকে চলেছে। আস্তে আস্তে দিনের আলো পড়ে এল। তখন রঙ ছেড়ে শলকেন পেন্সিল ধরল। সেইন্ট অ্যান্থনি ও শয়তানের একটা স্কেচ অনেকদিনই অসম্পূর্ণ পড়েছিল তার কাছে, সেটাই শেষ করছিল

সে মন দিয়ে। অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তরুণ শলকেনের মনে ছিল এক শিল্পীসুলভ অসন্তুষ্টি। নিজের প্রতিটি ছবিতেই খুঁৎ খুঁজে পেত সে। এই ছবিটার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটছিল। বারবার মেজে, ঘষে, মুছেও সে কিছুতেই ছবিটাকে ঠিক নিখুঁৎ করে তুলতে পারছিল না। তার আঁকার ঘরটা ছিল বিশাল বড় আর সন্ধে নামার ঠিক আগের মুহূর্তে তাতে খেলা করে বেড়াচ্ছিল ভূতুড়ে সব ছায়া। একেবারে নিস্তব্ধ চারিদিক, তার মধ্যে খুটখুট করে কাগজে পেন্সিল বুলিয়ে চলেছিল তরুণ শিল্পী। এর মধ্যে দিয়ে কীকরে যে ঘন্টা দুয়েক কেটে গেল, শলকেনের খেয়ালই রইল না। রাত তখন হল বলে, চারিদিকে তীব্র অন্ধকার। অথচ ছবিটা যেন জেদ করেই আর সুন্দর হতে চায়না। আস্তে আস্তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল শলকেন। গায়ে তার সারাদিনের ক্লান্তি, হাতে রঙ ও চারকোলের দাগ, পোশাক ও চুল আলুথালু। বিভ্রান্ত হয়ে এক হাত তার লম্বা চুলে দিয়ে আর অন্য হাতে চারকোল নিয়ে ক্যানভাসের গায়ে কালোকালো দাগ টানছিল সে। অত টানাটানির পর ছবিটা তখন প্রায় নষ্টের মুখে। ফিসফিস করে অভিশাপ দিচ্ছিল শলকেন, "যমে নিক, সবকটাকে যমে নিক।"

এই সময় হঠাৎ পিছন থেকে একটা অচেনা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে তার ছবি আঁকা দেখছিল। ছবি

আঁকার নেশায় শলকেন এতক্ষণ পর্যন্ত টেরই পায়নি। কতক্ষণ দেখেছে ভগবান জানে। লোকটির শরীরের একরকম জান্তব শক্তির ছাপ ছিল। তার পরণে ছিল একটা সেকেলে ক্লোক, আর একটা বড়সড় ছুঁচোলো মাথাওয়ালা টুপি। তার মোটা দস্তানায় মোড়া হাতে একটা কালো দামী কাঠের পালিশ করা লাঠি। সেটার মাথায় আবার একটা চকচকে গোল মত কী। একটু ঠাহর করতেই শলকেন বুঝল সেটা সোনার আস্ত একটা তাল, লাঠির মাথায় কারুকার্য করে

লাগানো। ক্লোকের আড়ালে তার বুকেও একটা সোনার ভারী শেকলের কিছুটা দেখতে পেল সে। ঘরের টিমটিমে আলোয় এর চেয়ে বেশি কিছু ঠাহর করতে পারল না শলকেন। তার টুপির ছায়ায় মুখটাও ভাল ভাবে দেখা গেল না। তার বয়স বোঝাটাও কঠিন ছিল। কিন্তু টুপির পেছন থেকে ঝাঁকড়া কালো চুলের যে রাশি নামছিল, আর তার শরীরের শক্ত ঋজুতা দেখে এটুকুই বলা যাচ্ছিল যে তার বয়স ষাটের বেশি হবে না। সে একরকম পর্বতের মতই নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়েছিল শলকেনের পেছনে। লোকটার মধ্যে একটা অবর্ণনীয় অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল যে তাকে দেখে ভক্তির চেয়ে ভয়ই বেশি হচ্ছিল তরুণ শিল্পীর। এরকমভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে তার ছবি আঁকা দেখছিল বলে শলকেনের রাগ হলেও সে ভয়ে তা আর প্রকাশ করতে পারলো না। তার চমক কিছুটা ভাঙতে সে অপ্রত্যাশিত এই অতিথিকে বসতে বলল। জিজ্ঞেস করল সে তার শিক্ষকের সাক্ষাৎ চায় কিনা।

লোকটা যেরকম দাঁড়িয়েছিল সেরকমই রইল। তারপর নিচু ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "ছোকড়া, জেরার্ড ডোউকে গিয়ে জানাও যে রটারড্যাম থেকে মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেন তার সাথে দেখা করতে চান। কাল সন্ধ্যাবেলায় কিছু দরকারি বিষয়ে কথা বলবেন তিনি তার সঙ্গে। তার আপত্তি না থাকলে এই ঘরেই হবে কথাবার্তা।"

এই বলেই লোকটা তার উত্তরের অপেক্ষা না করে লম্বা লম্বা পায়ে খটখট আওয়াজ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারে এই ভেবে শলকেন তাড়াতাড়ি দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে একটা লম্বা একটানা দালান, তারপরে সদর দরজা। কিন্তু সে দেখার জন্য দাঁড়াতে গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। দালান একেবারে শুনশান। এটা কীভাবে হয়? শলকেন অনেক ভেবেও বুঝে পেল না কী করে ওইটুকু সময়ের মধ্যে লম্বা দালান পেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরোবার আর কোন রাস্তা অন্তত শলকেনের জানা নেই। সে কী আদৌ বেরিয়েছে? নাকি অন্ধকারের মধ্যে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে চুরি- ডাকাতির মতলবে। দেখতেও তো দস্যুর মত। তার ওপরে ওরকম রাশভারী আচার আচরণ! এ কথা ভেবেই শলকেনের অস্বস্তি লাগতে লাগল। একা ঘরে থাকতেও ভয় আবার দালানে যাওয়ার মতও অবস্থা রইল না তার। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবার পর শলকেন অতিকষ্টে সাহস করে ঘর থেকে বের হল। তারপর রুদ্ধশ্বাসে দরজায় তালা দিয়ে, পকেটে চাবিটা নিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে সে দালান ধরে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেই রহস্যময় মানুষটা হয়তো এখানে ছিল। কিন্তু এখন তার কোন চিহ্নই নেই। কোনমতে শলকেন সদর দরজা অবধি পৌঁছোল। তারপর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

বাকিটা পরের সংখ্যায়

শাঁকচুন্নি আর হোয়াইট লেডির কথা

টুপুর

শাঁকচুন্নি হলো এমন মহিলার ভূত যে মারা যাওয়ার সময় তার বর বেঁচে ছিল। শাঁকচুন্নি ভূত হিসেবে ভালো নয়। বেশ পাজি আর সব্বনেশে। মানে ভূত হয়ে জল তুলে দেওয়া বা কাপড় কেচে দেওয়ার মতো উপকার করে না। বরং সে তার নানা রকম বায়না নিয়ে হাজির হয় মানুষের কাছে। আর বায়না না মিটলে সে ঘাড় মটকে মানুষটাকে বা মানুষগুলোকে মেরে ফেলে। তারপর খেয়ে ফেলে মৃতদেহগুলোকে।

শাঁকচুন্নি কথাটা এসেছে শঙ্খচূর্ণি কথাটা থেকে। শঙ্খিনী হলো আরেকটা কথা যার মানে শঙ্খচূর্ণি বা শাঁকচুন্নি। ফিলিপিনো পুরাণ আর লোককথায় প্রচুর শাঁকচুন্নির গল্প পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যে এরকম ভূতকে সাধারণত Ghoul বলে। ঘাউল কবরখানায় থাকে। কবর খুঁড়ে মৃতদেহ চুরি করে। কারণ মৃতদেহই তাদের খাবার। এদের মধ্যে সবথেকে পরিচিত হলো White Lady। সাধারণতঃ গ্রামের কবরখানাতেই বাস হোয়াইট লেডির। ফলে গ্রাম থেকে গ্রামে বদলে বদলে গেছে হোয়াইট লেডির গল্প।

হোয়াইট লেডি সাধারণত বর বা হবু বরের দেওয়া দুঃখে মরে গেছে এমন মহিলার ভূত। আবার এমনটাও শোনা গেছে যে কোনো বংশে হোয়াইট লেডি আসলে অতীত প্রজন্মের নারী। হোয়াইট লেডিকে কোথাও কোথাও রানিং লেডিও বলে। স্লাভিক পুরাণে এর নাম রুসালকা। ভূমধ্য-সাগরীয় দ্বীপ মালটা বা নর্থ সি- র এস্টোনিয়া কিংবা মূল ইউরোপ ভূখণ্ডের নরওয়ে বা ঘোর দক্ষিণ গোলার্ধে লাতিন আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড়ো দেশ ব্রাজিল - সর্বত্র দাপট হোয়াইট লেডির। চেক প্রজাতন্ত্রে আবার হোয়াইট লেডির জাঁদরেল গোছের নামটা হলো রোজমবার্কের পার্খতা।

এই যে দাপুটে হোয়াইট লেডি তাকে গল্পে, নাটকে, গানে, যাত্রাপালায় আর সিনেমায় বারবার দেখানো হয়েছে। এর থেকে মনে হয় যে শাঁকচুন্নি যতই খারাপ হোক, তাকে নিয়ে গালগল্প করতে মানুষ বেশ ভালোবাসে।

অরিন্দম দেবনাথ

মহাভারতে আছে রাজসভায় বসে ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিখুঁত বর্ণনা শুনিয়ে ছিলেন সঞ্জয়। মহাকাব্য লেখার সেই আদি যুগে তথাকথিত রেডিও, টিভি, টেলিফোন ছিল না। মোবাইল বা ভিডিও ফোন ছিল বলে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি , কিন্তু কিছু তো একটা ছিল যার জোরে সঞ্জয় বহু দূর থেকে যুদ্ধের প্রতিটি বিবরণ দিতে পেরেছিলেন ? মহাভারতে আছে মুনি ব্যাস- এর বরে সঞ্জয় দূর- দৃষ্টি পেয়েছিলেন, ফলে ঘটনাস্থলে না থেকেও অনেক দূর থেকেও সঞ্জয় সব দেখতে পেতেন ও বর্ণনা করতেন। ব্যাপারটা অনেকটা রেডিওতে খেলা শোনার মত ছিল।

সে যুগে কি ছিল জানা নেই , কারণ কোন প্রমাণ নেই বা মহাভারতে কোথাও বলা নেই ফোন বা টেলিভিশান জাতীয় কোন যন্ত্রের কথা। কিন্তু আমরা তো এ সময়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারি , দেখতে পারি কোথায় কী হচ্ছে। তার জন্যে আমাদের ঘটনাস্থলে যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের আবিষ্কারকরা এমন একটা যন্ত্র আমাদের হাতে গুঁজে দিয়েছেন যে দুনিয়াটা প্রায় হাতের মুঠোতে চলে এসেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা হয়ত এমন কোন যন্ত্র ব্যবহার করতেন যা জনসাধারণের জন্য ছিল না, কিন্তু বিশেষ কিছু মানুষ এর জন্য তখনকার অতি জ্ঞানী মানুষরা তা তৈরি করেছিলেন? আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যতে এমন এমন সব অস্ত্র , যানবাহন বা মহাকাশযানের

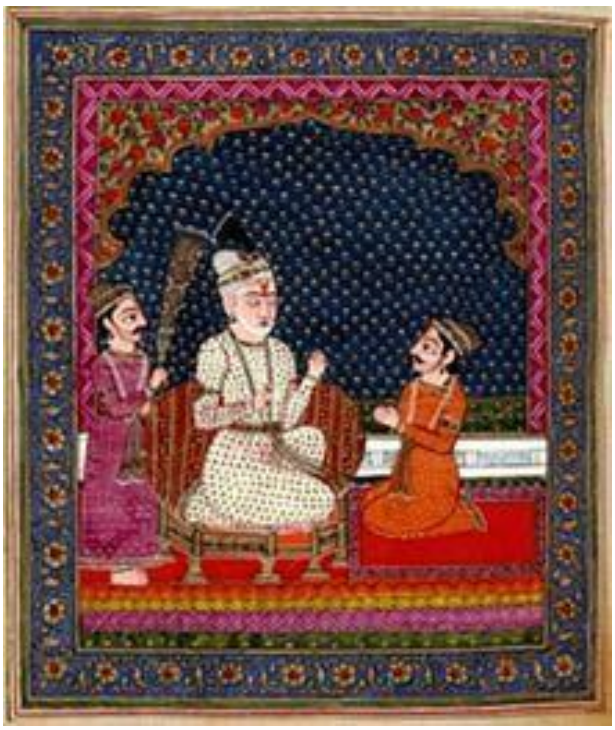

কথা বলা আছে যা আজকের বিজ্ঞানী তথা যন্ত্রবিদরা তৈরি করে দেখিয়েছেন। তাহলে কি আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন অতিজ্ঞানী? কী জানি।

বর্তমান জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে ছোট্ট একটা যন্ত্র – মোবাইল ফোন। কী না করা যায় এই যন্ত্র থেকে! কথা বলা ছাড়াও, গান শোনা , ছবি তোলা, চিঠি লেখা, অপর প্রান্তের মানুষের সাথে ছবিতে মুখোমুখি কথা বলা, আরও কত কাজ করা যায় এই ছোট্ট যন্ত্রটা দিয়ে! অথচ এমন কিছু খরচবহুল নয়। শহর গ্রাম সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এই সহজলভ্য যন্ত্রটা। একটা সময় ছিল যখন একটা সাধারণ টেলিফোন ছিল বলতে গেলে বিলাসদ্রব্য। হাতে গোনা কয়েক জনের বাড়িতে বা অফিসে টেলিফোন ছিল ।

দেখতে দেখতে এই মোবাইল টেলিফোন আবিষ্কার এর বয়েস প্রায় একশো বছর হতে চলল। মোবাইল ফোনকে কোন কোন দেশে বলা হয় হ্যান্ড ফোন, কোন দেশে ওয়ারলেস ফোন। ফেসসেন্দেন নামে একজন ক্যানাডিয়ান আবিষ্কারক প্রথম একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা দিয়ে রেডিও থেকে পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্কে কথা বলা সম্ভব। উনি জাহাজ থেকে স্থলে টেলিফোনে কথা বলে প্রথম নমুনা দিলেন। মোবাইল ফোনের সূচনা এ ভাবেই হয়েছিল। ১৯১৮ সালে জার্মানির বার্লিন ও জোসেন সহরের মাঝে চলা সামরিক ট্রেন এ ওয়ারলেস টেলিফোন পরীক্ষামুলক ভাবে চালু হল। ১৯২৪ সালে বার্লিন ও হামবুর্গ এর মধ্যে চলাচলকারী সাধারন ট্রেনে চালু হল তারবিহীন টেলিফোন। ১৯২৫ সালে যুগতেলেফনিয়ে এ জি নামে একটি সংস্থা ট্রেনের জন্যে ওয়ারলেস টেলিফোন যন্ত্রপাতি সরাবরাহ শুরু করল। ১৯২৬ সালে জার্মান মেইল সার্ভিস ও ডাচেস রেইছেসবান নামে দুটি সংস্থা অনুমতি পেল হামবুর্গ ও বার্লিনের মধ্যে চলাচলকারী প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের টেলিফোন সার্ভিস দেবার। অর্থাৎ ওই সময় থেকে ট্রেন থেকে কিছু যাত্রী চাইলে অন্যপ্রান্তের সাধারণ টেলিফোন এ যোগাযোগ করতে পারলেন ওয়ারলেস টেলিফোন এর মাধ্যমে। কিন্তু সে সময় এর ব্যবহার ছিল খুব সীমাবদ্ধ এবং খুব সীমিত অঞ্চলভিত্তিক । খরচও ছিল লাগাম ছাড়া।

১৯২৬ সালে কার্ল আর্নল্ড নামে একজন কার্টুনিস্ট জার্মান ম্যাগাজিন সিমপ্লিসিমাস একটি কার্টুন আঁকলেন । একজন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা হাতে ধরা যন্ত্রে কথা বলছে আর বাকি লোক ঘুরে ঘুরে দেখছে। ১৯৩১ সালে এরিক কাস্তনের একটি কিশোর গ্রন্থ ‘কনরাডস রাইড টু দি সাউথ সি’ তে মোবাইল ফোনে কথা বলার বর্ণনা আছে-

-- একজন ভদ্রলোক সাইড ওয়াকের কনভেয়ার বেল্ট (চলমান পথ যা আজকাল অনেক এয়ারপোর্ট এ দেখা যায়) থেকে নেমে পড়ে কোটের পকেট থেকে একটা ফোন বের করে একটা নাম্বার ডায়াল করে অন্য একজনকে বললেন, 'আমি আজকের ডিনারে থাকতে পারছি না, আমার একটা বিশেষ কাজ পড়ে গেছে।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর সকল দেশেই সামরিক বাহিনীর কাছে রেডিও টেলিফোন অপরিহার্য হয়ে উঠল। ১৯৪০ সাল থেকে মোবাইল ফোন অটোমোবাইল কোম্পানিগুলো ব্যবহার করতে অনুমতি পেল বিশ্বের অনেক দেশে। কিন্তু সেই সময় এই মোবাইল বা রেডিও ফোনগুলো ছিলো ভীষণ ভারী। তাছাড়া এগুলো প্রচণ্ড ব্যাটারি খেত। সামান্য সময় কথা বলা যেত , তা ছাড়া সব জায়গা থেকে যোগাযোগও করা যেত না। এবং এটা ছিল ভীষণ খরচবহুল।

আমেরিকাতে বেল ল্যাব- এর ইঞ্জিনিয়াররা একটা সিস্টেম তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন যাতে করে গাড়ি থেকে খুব সহজে অন্যান্য ফোনে যোগাযোগ করা যেতে লাগল। একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে শুধু গাড়ি থেকেই কেন! কারণ সে সময় এই যন্ত্রগুলো ছিল বেশ বড় ও বেজায় ভারী। তা ছাড়া অনেক ব্যাটারি লাগত। ১৯৪৬ সালের ১৭ জুন আমেরিকার মিসৌরি শহরে সাধারণের জন্যে মোবাইল পরিষেবা চালু হল। এ টি অ্যান্ড টি নামে একটি সংস্থা শহরতলির জন্য মোবাইল পরিষেবা চালু করল । কিন্তু এটা ছিল খুব কম সংখ্যক বাবহারকারীর জন্য। লাইন ঠিকমত পাওয়া যেত না। কথা বলতে বলতে কেটে যেত। কিন্তু খরচটা আগের থেকে একটু কমেছিল ।

অবিভক্ত রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়ার লেওনিদ ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে অনেকগুলো পরীক্ষামূলক মোবাইল হাত ফোন বের করলেন । ১৯৬১ সালে তৈরি সেই রকম একটা মোবাইল হাত ফোন এর ওজন ছিল মাত্র ৭০ গ্রাম! সুন্দর ভাবে হাতে ধরা যেত সেই ফোন। কিন্তু রাশিয়া সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে শুধুমাত্র অটোমোবাইল এর জন্য সে সময় মোবাইল ব্যবহার করা যাবে । তার ফলশ্রুতি ছিল "আলতাই" নামের ফোন ।

১৯৬৫ সালে রাশিয়ার মস্কো শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ইনফরগা ৬৫ তে বুলগেরিয়ান সংস্থা রেডিওইলেক্ট্রনিক প্রকাশ করল রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার লেওনিদের উদ্ভাবিত বেশ কিছু অটোমেটিক মোবাইল ফোন যেগুলো কোন না কোন ভাবে একটি বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করা যায়। এবং এই ফোনগুলো ছিল সিস্টেম বেস্ট ফোন। একটি বেস স্টেশনের ক্ষমতা ছিল মাত্র ১৫ টা লাইন দেবার !

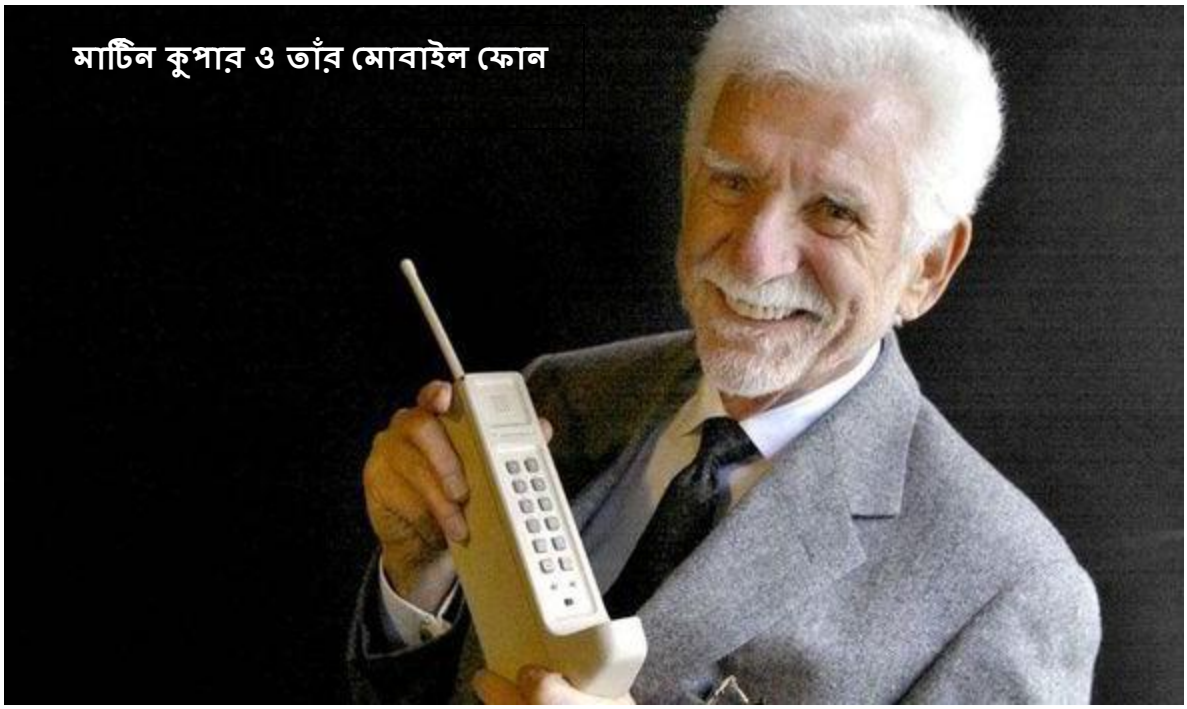

মোটোরোলা হল প্রথম সংস্থা যারা আধুনিক মোবাইল এর প্রবর্তক। ১৯৭৩ সালের তেসরা এপ্রিল মোটোরোলা সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কুপার একটি মোবাইল হাত ফোন সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত করে আমেরিকার বেল ল্যাব এর প্রধান ডঃ জে এল এঙ্গেলকে ফোন করলেন। হাত ফোনটি ছিল ২৩ সেমি. লম্বা ১৩ সেমি. চওড়া ৪.৪৫ সেমি. মোটা ১.১ কেজি ওজনের । একটা থান ইট এর মত! এই ফোনটা থেকে ৩০ মিনিট কথা বললে সেটা আবার কথা বলার উপযোগী করতে ১০ ঘণ্টা চার্জ দিতে হত।

মোটোরোলা সংস্থার পোর্টেবল কমুনিকেশান এর প্রধান ও মার্টিন কুপারের ওপরওয়ালা জন মিচেল মোবাইল হাত ফোন বানানো ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গবেষণায় জোর দিলেন। আর তারই ফলশ্রুতি আজকের মোবাইল। যার জয়যাত্রা শুরু হয়ে ছিল 'জিরো জি' দিয়ে। পৃথিবী জুড়ে এম টি এস ও ইম্প্রুভড টেলিফোন সার্ভিস নামের দুটি সংস্থা যোগাযোগ বাবস্থাটার সংজ্ঞাটাই পাল্টে দিল এর পর! তারপর আরও একের পর এক সংস্থা এল । পৃথিবীটা হয়ে উঠল ছোট। মোবাইল দিয়ে অনুভুতিতে ছোঁয়া যায় এখন অনেক কিছু, যা আগে কল্পনাও করা যেত না !

মোবাইলের মজার খবরঃ

পলিট্রন কোম্পানি একখানা স্বচ্ছ মোবাইল ফোন বাজারে আনছে সামনেই। সঙ্গের ছবিটা দেখো। আর কিছু বলবার নেই এ নিয়ে। অসাধারণঃ

পলিট্রন উপস্থিত কাজ করছে একটা নতুন প্রযুক্তি নিয়ে যাতে করে একটা ছোট্ট ইলেকট্রিক ভোল্টেজ ব্যবহার করে হাতে ধরা কালোরঙের মোবাইল ফোনটাকে ইচ্ছেমত এইরকম স্বচ্ছ করে ফেলা যাবে যখনতখন। ভোল্টেজটা আসবে মোবাইলের ব্যাটারি থেকে।

সারা পৃথিবীতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন ৪০০ কোটি মানুষ।

এক টন সোনার আকরিক পরিশোধন করলে সোনা মেলে ৫ গ্রাম। এক টন ফেলে দেয়া মোবাইল ফোন রিসাইকল করলে মেলে ১৫০ গ্রাম সোনা।তবুও আমরা পুরোনো মোবাইল ফোন রিসাইকল করতে দিই না বিশেষ।

অংকে অসীমের সাধনা মানে তো বড় থেকে আরো বড় সংখ্যার অনুসন্ধান। কিন্তু মুশকিল হল অত বড় সংখ্যাদের সরাসরি লিখতে বসলে জায়গায় কুলোবেনা যে। এইতো যেমন ধরো গুগোলপ্লেক্সিয়ান। আগের সংখ্যাতেই বলেছি এ সংখ্যাটা একের পেছনে শূন্য বসিয়ে বসিয়ে পুরোটা লিখতে গেলে, পৃথিবীর সব গাছ কেটে কাগজ বানিয়ে ফেললেও তাতে কুলোবে না। তাকে কম জায়গায় আঁটিয়ে ফেলতে হলে লিখতে হবে এইভাবেঃ $10^{10^{100}}$ । বড় বড় সংখ্যাদের ছোট পরিসরে লিখে ফেলবার জন্য এমন একাধিক গাণিতিক কৌশল রয়েছে। এই যে একের মাথায় অন্য সংখ্যাকে চাপিয়ে সূচক পদ্ধতিতে বড় সংখ্যাকে ছোট পরিসরে আঁটাবার পদ্ধতিটা এটর প্রথম প্রয়োগও জৈনরা করেছিলেন। কোন একটা সংখ্যাকে ২ দিয়ে ক্রমাগত যতবার কোন ভাগশেষ ছাড়া ভাগ করে ফেলা যায় তাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলন সে সংখ্যার অর্ধছেদ।

যেমন ধরো ৫২৪২৮৮। এই সংখ্যাটাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ২৬২১৪৪। তাকে ফের ২ দিয়ে ভাগ করলে পাবো ১৩১০৭২। এইভাবে চলতে চলতে দেখা যাবে সংখ্যাটাকে ক্রমাগত ২ দিয়ে ১৯ বার ভাগ করতে পারা যাবে।

সেক্ষেত্রে ১৯ কে বলা হবে ৫২৪২৮৮ এর অর্ধচ্ছেদ। অন্য ভাষায়ঃ $২^{১৯}$=৫২৪২৮৮। এতবড় সংখ্যাটাকে কতটুকু জায়গায় আঁটিয়ে ফেলা গেল দেখ।

আচ্ছা, সে না হয় হল, কিন্তু সংখ্যাটা যদি ৫২৪২৮৯ হয়, তাহলে? একে তো একবারও দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না। একে তাহলে অর্ধচ্ছেদ ব্যবহার করে ছোট চেহারায় লিখবো কী করে? একটু বুদ্ধি করলেই কিন্তু এ সমস্যারও সমাধান হতে পারে। তুমি একে লিখতে পারো $২^{১৯}+১$ এইভাবে। তাই না?

আবার ধরো ১১৬২২৬১৪৬৭ সংখ্যাটা। একে আবার লেখা যায় $৩^{১৯}$ এই চেহারায়। এক্ষেত্রে ১৯কে বলব ১১৬২২৬১৪৬৭- এর ত্রিকচ্ছেদ।

৪৩৯৮০৪৬৫১১১০৪ সংখ্যাটাকে লেখা যাবে $৪^{২১}$ এই চেহারায়। এক্ষেত্রে ২১কে বলব, ও সংখ্যাটার চতুর্থচ্ছেদ।

এই পদ্ধতিতে যে কোন বড় সংখ্যাকে সূচক ব্যবহার করে ছোট আকারে লেখবার পদ্ধতিগুলো 'শতখন্ডাগম' নামের দ্বিতীয় শতাব্দির জৈন পুঁথিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানেই আলোচিত হয়েছে সেট তত্ত্বের মত আধুনিক গণিতপদ্ধতি, রয়েছে সূচকপদ্ধতিকে ব্যবহার করে বড় সংখ্যাকে ছোট চেহারায় লেখা ও সহজে বড় বড় আঁক কষবার জন্য লগারিদম নামের গণিতকৌশলের কথাও। ('৫২৪২৮৮ এর অর্ধচ্ছেদ হল ১৯' এই কথাটাকে লগারিদমের ভাষায় বলা হবে এইভাবেঃ $\log_2 (৫২৪২৮৮) = ১৯$)

আবার ধরো, বিন্যাস ও সমবায়ের অংকের কথা। বলো দেখি ১ থেকে ৪ নম্বর জার্সি পরা চারটে ছেলের দল থেকে কতরকমভাবে দুটো করে ছেলের চারখানা উপদল বানানো যায়?

উত্তর হবে ৬→

(১,২) (১,৩) (১,৪) (২,৩) (২,৪)(৩,৪)

আবার যদি বলি ১ থেকে ৪ নম্বর জার্সি পরা চারটে ছেলের দল থেকে কতরকমভাবে দুটো দুটো করে ছেলেকে পাশাপাশি বসানো চারখানা উপদল বানানো যায় তাহলে অংকটা একটু বদলে যাবে। এর উত্তর হবে ১২। কারণ এখানে প্রত্যেকটা উপদলের ছেলেদুটোকে অবস্থান বদলেও পাশাপাশি বসানো যাবে। সম্ভাব্য সজ্জাগুলো তখন এইরকম হবেঃ→

(১,২) (২,১) (১,৩) (৩,১) (১,৪) (৪,১) (২,৩) (৩,২) (২,৪) (৪,২) (৩,৪)(৪,৩)

এখন ৪ টে সংখ্যার থেকে দুটো দুটো করে নিয়ে সজ্জাটা সহজ, কিন্তু ধরো যদি বলা হয়, দশটা সংখ্যার থেকে ছখানা করে সংখ্যার এরকম কতগুলো দল তৈরি করা যাবে তখন কিন্তু এ হিসেব এভাবে করতে হাতে ব্যথা হয়ে যাবে। তার জন্য তখন দরকার হবে কৌশলী অংকের সূত্রের প্রয়োগ।

ব্যবহারিক জীবনে ও গণিতশাস্ত্রে এইধরণের অংকের বিরাট প্রয়োগ আছে। সে তোমরা একটু বড় হয়ে শিখবে।

এই বিন্যাস সমবায়ের অংকের ধাঁধার সমাধানও করেছিলেন জৈন সন্ন্যাসীরা। তাঁদের লেখা স্থানাঙ্গ সূত্র আর ভগবতীসূত্রে সেসব অংকের সন্ধান দেয়া আছে।

মজার খবর হল, তাঁরা এ অংকের গবেষণাটা কিন্তু করেছিলেন, কাব্যের জন্য কতরকমভাবে বিভিন্ন শব্দাংশদের সাজিয়ে বিভিন্ন ছন্দ তৈরি করা যায় তার রাস্তা খোঁজবার জন্য। কাব্যচর্চা থেকে অংক আবিষ্কার, মজার ব্যাপার, নয়?

ক্রমশ

প্রতিবেশী গাছ

পানিফল

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

রাস্তার ধারে খাল, ডোবায় ভাসমান উদ্ভিদ থেকে কিছু সংগ্রহ করে হাঁড়িতে রাখা হচ্ছে এমন দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। বিশেষ করে বর্ধমান- হাওড়া কর্ড লাইনের এবং অন্যান্য লোকাল ট্রেনরূটের যাত্রীরা ট্রেনে ভ্রমণ করবার সময় জানালা দিয়ে তাকালেই এমন দৃশ্য দেখতে পান। ভাসমান উদ্ভিদ 'পানিফল'- এর ফল সংগ্রহের কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

পানিফল সহজলভ্য জলজ উদ্ভিদ যা খাল, বিল, পুকুর, যেখানে জল স্থির অথবা সামান্য স্রোতস্বিনী সেখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতসহ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে প্রচুর পরিমাণে এদের দেখা যায়। পানিফল গাছের (ইংরাজিতে ইন্ডিয়ান ওয়াটার চেস্টনাট নামে পরিচিত) বৈজ্ঞানিক নাম Trapa natans।

এই জলজ উদ্ভিদ অগভীর জল থেকে শুরু করে ১২- ১৫ ফুট অবধি গভীর জলে জন্মাতে পারে। গাছের গোড়ার অংশ জলের তলায় থাকে। গোড়া থেকে দু ধরনের শিকড় গজায়, মাটিতে প্রোথিত ছাড়া থাকে প্রচুর ভাসমান শিকড়ও।

ভাসমান পাতার গুচ্ছ গোলাকারভাবে সাজানো থাকে (গোলাপ ফুলের মতন দেখতে)। ত্রিকোণাকৃতি পাতার প্রান্ত অমসৃণ ও দন্তযুক্ত। উপরিতল চকচকে, গাঢ় সবুজবর্ণের। ফুল সাদা রঙের, চারটি পাপড়িযুক্ত। ফল ত্রিকোণাকৃতি। দু ইঞ্চির মত লম্বায় এবং চওড়ায়। কচি অবস্থায় সবুজ রঙের, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়বর্ণের হয়ে যায়। ফলের প্রতিটি কোণ সরু হয়ে কাঁটায়

পরিণত হয়েছে। সবুজ খোসা ছাড়ালে সাদা ফল দৃশ্যমান হয়। কচি অবস্থায় ফল খুব নরম, খেতে সুস্বাদু।

পানিফলের চাষে বিশেষ খরচ নেই। প্রচুর পরিমাণে চাষ করা যায় সহজেই। ফল বিক্রয়যোগ্য, সুতরাং পানিফলের চাষ অর্থকরী।

পানিফল কাঁচা খাওয়া হয় তবে সিদ্ধ করে খাওয়ারও চল রয়েছে। শুকনো ফল গুঁড়ো করে যে আটা পাওয়া যায় অবাঙালি পরিবেশে তা সিংঘারে কা আটা নামে পরিচিত। তবে একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। পানিফলের পাতা এবং ফল ফ্যাসিওলোপসিস বাস্কি নামে একটি পরজীবি সংক্রমণে সাহায্য করে। এই পরজীবি থেকে মানুষ, শুয়োর এবং অন্যান্য প্রাণীদের ফ্যাসিওলোপসিস নামের রোগ হতে পারে।

টারডিগ্রেড

বৈজ্ঞানিক

এক্সট্রিমোফাইল কাদের বলে জানো? এসব প্রাণী চরমতম সব আবহাওয়ায় বেঁচে থাকে তাদের এই নাম দেয়া হয়। যেমন ধরো কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা আগ্নেয়গিরির লাভার মধ্যে বেঁচে থাকে। সে যাকে বলে একেবারে মহাবীর প্রাণকণা, কী বলো? কিন্তু সব এক্সট্রিমোফাইলের মধ্যে অলিম্পিক হলে সোনাটা যে জিতবে তার কথাই বলব এবারে।

তার নাম টারডিগ্রেড। ডাকনাম খুদে জলভালুক কিংবা মস শূকর। আটপেয়ে খুদে পোকা একখানা। লম্বায় বেশি হলে এক মিলিমিটার। (- ২৭৩) ডিগ্রি বা চরম শূন্যাংকের একেবারে কাছাকাছি তাপমাত্রা থেকে শুরু করে ফুটন্ত জলের চেয়ে অনেক বেশি তাপমাত্রা অবধি সবরকম তাপমাত্রাতেই সে দিব্যি হেসেখেলে বেঁচে থাকে। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে জলের যে চাপ হয় তার থেকে ছ'গুণ বেশি চাপেও তার কিচ্ছু ক্ষতি করতে পারে না। যে মাপের তেজস্ক্রিয়তায় একজন মানুষ মরে যাবে তার চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি তীব্র তেজস্ক্রিয় আবহতেও সে সুস্থ থাকে। মহাকাশের শূন্যতাতেও টানা দশ দিন বেঁচে থাকবার ক্ষমতা রাখে সে। না খেয়ে বাঁচতে পারে ১০ বছর। গরম দিয়ে শুকিয়ে শরীরের শতকরা ৯৭ ভাগ জল বের করে দিলেও দিব্যি ঘুম দেয় , আর পরে ফের জল ঠেকালেই আবার নড়েচড়ে বেড়ায়। বসবাস করে মস ও লিচেনসমৃদ্ধ এলাকায়। প্রায় ৫০০ টারডিগ্রেডের প্রজাতির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে এখন পর্যন্ত।

টারডিগ্রেডের বয়সও মোটামুটি মন্দ নয়। পৃথিবীতে তারা আছে ৫৩ কোটি বছর ধরে। হিমালয়ের চূড়া থেকে সমুদ্রের গভীরে ,মরু অঞ্চল থেকে মেরু অঙচল সর্বত্র এখন অবধি ১১৫০ টি টারডিগ্রেড প্রজাতির খোঁজ মিলেছে।

পাখির খোরাক(পর্ব ২)

সৈকত মুখোপাধ্যায়

পক্ষীজগতের এই খাদ্য-খাদক পালা যে শুধু দিনের আলোতেই চলছে তা নয়, নাইট শোয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে, রাতের সেরা শিকারী হল প্যাঁচা। কাঠঠোকরার মতো এরও পুরো শরীরটা যেন শিকার ধরার জন্যে বানানো। একে তো প্যাঁচা অন্ধকারে শিকার করে। তার ওপরে ওর প্রধান শিকার ইঁদুর, যে প্রাণীটা চলাফেরা করে ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে। তাই শিকার ধরার সময় প্যাঁচা চোখের চেয়ে অনেক বেশি ভরসা রাখে তার কানের ওপর। প্যাঁচার মাথার পালকগুলোকে সরালে দেখা যাবে ওর দুটো কানের গর্ত দু লেভেলে বসানো রয়েছে – মানে একটা একটু ওপরে, আরেকটা একটু নিচে। এর ফলে প্যাঁচা একই শব্দ সামান্য সময়ের ব্যবধানে দুবার শুনতে পায়। এই ব্যবধানটুকু থেকে প্যাঁচা নিঁখুত ভাবে বুঝতে পারে শব্দর উৎসটা ঠিক কোথায়, কত দূরে। ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাওয়া ইঁদুরের সামান্য খসখসানি তার কান এড়ায় না। ঘন অন্ধকারের মধ্যেও এই ‘কিলিং মেশিন’ মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ইঁদুরের ওপর।

আরো আছে। প্যাঁচা অনেক সময়েই খোলা জমির খুব কাছাকাছি উড়ে বেড়ায়, চোখের নজর থাকে নিচুতে, যদি সেখানে কোনো শিকার দেখা যায়। কিন্তু এরকম ওড়ার সময়ে যদি তার ডানায় একটুও ঝটপট শব্দ হয় তাহলেই তো ইঁদুর গর্তের মধ্যে সেঁধোবে। তাই প্যাঁচার ডানার কিনারায় এক বিশেষ রকমের নরম পালকের আবরণ থাকে, যার ফলে প্যাঁচা যখন ওড়ে তখন এতটুকুও শব্দ হয় না।

তাছাড়া প্যাঁচার রয়েছে তীক্ষ্ণ নখ, বাজপাখির মতো বাঁকানো ঠোঁট যা মাংস ছিঁড়তে কাজে লাগে আর ঘাড়ের ওপর মাথাটাকে প্রায় পুরো গোল করে ঘোরানোর ক্ষমতা। এই শেষের ক্ষমতাটার জন্যেই খোলা মাঠের ওপর যে কোনো একটা দাঁড়ের মতো জায়গায় বসে প্যাঁচা তার চারদিকের ঘাসজমির ওপর নজর রাখতে পারে।

এতক্ষণ তো ডাঙার শিকারীদের ব্যাপার স্যাপার দেখলাম। জলের কাছাকাছি যত পাখি দেখা যায় এরকম আর কোথাও নয় – সে সমুদ্র, ঝর্ণা, বড়ো দিঘি, ঝিল, জলাজমি যাই হোক। তার কারণ ওই একটাই। জলের মধ্যে আর জলাভূমির ধারে পাখিরা যত খাবার খুঁজে পায় তেমন আর কোথাও পায় না।

জলের পাখিদের মধ্যে আছে নানা রকমের পানকৌড়ি, হাঁস আর রাজহাঁস। নানান তাদের পালকের রঙ, নানান তাদের আকার। কেউ ডুব দিয়ে জলের নিচ থেকে শামুক, গুগলি আর মাছ ধরে খায়, আবার কারুর প্রিয় জলজ লতাপাতা কিংবা আশেপাশের খেতে ফলে থাকা ফসল। এদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায় ডাহুক, জলপায়রা, জলপিপির মতো পাখি যাদের হাবভাব যেন ওই বাউল গানটার মতো – জলে নামব, জল ছিটোব তবু জলকে ছোঁব না।

এই পাখিগুলো অগভীর জলের ওপর ঘন কলমি বা পদ্মবনের ওপর আলতো পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়ায় আর উড়ন্ত পোকামাকড়কে টপ করে ধরে মুখে ফেলে।

পরিবেশের সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নেওয়ার ম্যাজিক কত দূর যেতে পারে বলি শোনো। এমনিতে তো প্রায় প্রতিটি পাখিরই শরীরের হাড় ফাঁপা আর হালকা যাতে ওদের উড়তে সুবিধে হয়। কিন্তু যাতে উড়তে সুবিধে সেটাই আবার জলে ডুবতে গেলে ভারি অসুবিধের। হাড় হালকা হলে বেশিক্ষণ জলের তলায় ডুবে থাকা তো মুশকিল। তাই অনেক হাঁস যারা জলে ডুব দিয়ে খাবার খোঁজে তাদের শরীরের হাড় মোটেই ফাঁপা নয়, বেশ ভারী।

শুধু হাড় নয়, কিছু কিছু জলের পাখির পালকেও এরকম বদল দেখা যায়। বেশির ভাগ পাখিরই পালকের নানান স্তরের মধ্যে হাওয়ার পরত আটকে থাকে। এতে পালক হালকা হয় আবার পাখিদের শীতও কম করে। কিন্তু জলে ডুব দিতে গেলে এরকম পালক অনেকটা হাওয়া ভরা লাইফ বেল্টের মতোই কাজ করে, শরীরটাকে ভাসিয়ে দেয়। সেইজন্যে পানকৌড়ির পালকের নিচে হাওয়ার পরত নেই। পানকৌড়ি জলে ডুব দিলেই তার সমস্ত পালক ন্যাকড়ার মতো ভিজে যায় আর সেই ভিজে ভারী পালক তাকে জলের নিচে টেনে নেয়। ওদিকে আবার উড়তে গেলে তো ভিজে পালক নিয়ে ওড়া যাবে না। তাই দেখবে খাওয়াদাওয়ার পরে পুকুরপাড়ে গাছে গাছে ডানা মেলে পানকৌড়িদের পালক শুকোনোর কি ঘটা। এইভাবেই পানকৌড়িরা ডোবা আর ওড়া দু কূলই বজায় রাখে।

জলের ধারে যারা খাবার খুঁজে বেড়ায় তাদের মধ্যে সবথেকে পরিচিত দুটো প্রজাতি বোধহয় মাছরাঙা আর বক। এদের দুজনেরই ঠোঁটের দিকে তাকালে শিকারের চরিত্র বোঝা যায়। একেবারে বল্লমের মতো ধারালো সোজা ঠোঁট, মাছের মতো পেছল প্রাণীকে শক্ত করে চেপে ধরার পক্ষে আদর্শ। বেশির ভাগ বকেরই গলা আর পা লম্বা, যাতে শরীরটা জলে না ভিজিয়েও মাছের নাগাল পাওয়া যায়।

মাছরাঙা মাছ ধরে ছোঁ মেরে। অনেক সময় ওরা স্থির হয়ে কিছুক্ষণ হাওয়ার বুকে ভেসে থেকে লক্ষ্য ঠিক করে নেয়, তারপর বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসে। একটা মজার কথা বলি। মাছরাঙা যখন নিজে খাবে বলে মাছ ধরে তখন মাছের মুড়োটা থাকে তার ঠোঁটের ভেতর দিকে আর ল্যাজটা ঠোঁটের বাইরে। এইভাবে গিললে মাছের পিঠের ধারালো পাখনাগুলো গলায় বেঁধে না। কিন্তু ওই একই মাছরাঙা যখন বাচ্ছাকে খাওয়ানোর জন্যে মাছ ধরে নিয়ে যায় তখন তখন মুড়োটা থাকে ঠোঁটের বাইরে আর ল্যাজটা ভেতরে। কেন বলো তো? যাতে বাচ্ছার মুখে প্রথমেই মুড়োটাই ঢুকিয়ে দিতে পারে, সেইজন্যে।

জলে তো শুধু মাছই পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আরো নানান রকম খাবার – শামুক, ঝিনুক, জলের পোকা, পোকার লার্ভা এমন কি এককোষী শ্যাওলা অবধি। এইসব খাবারকেই বা পাখিরা ছাড়বে কেন? যে জাতের পাখিরা নদী বা সমুদ্রের তীরে দৌড়াদৌড়ি ক'রে অগভীর জল

থেকে এই ধরণের খাবারগুলো পেটে পোরে তাদের ইংরিজিতে বলা হয় ওয়েডারস। বাংলায় বলা চলে তীরভূমির পাখি। এদের মধ্যে রয়েছে নানান ধরণের কাদাখোঁচা, টিট্টিভ, গুলিন্দা, বাটান, হটিটি এইসব পাখি। এদের সবারই শরীরে বহুরূপী রঙ, যাতে খোলা বালির চরের ওপর মিশে যেতে কোনো অসুবিধে না হয়। পা লম্বা। সেই পায়ের ওপর ভর দিয়ে অক্লান্তভাবে দৌড়দৌড়ি করতে পারে আবার প্রয়োজন হলে শক্ত ডানায় ভর করে তীব্র বেগে উড়েও যেতে পারে। তবে এদের সবচেয়ে বড়ো সহায় এদের ঠোঁট। ওয়েডারসদের ঠোঁট এত স্পর্শসংবেদী যে কল্পনাই করতে পারবে না। জল কাদার মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে ওরা যখন হাঁটতে থাকে তখন ঠোঁটে অখাদ্যও ঠেকে আবার খাদ্যও ঠেকে। যখনই ঠোঁটে কোনো খাদ্যবস্তু যেমন ছোটো মাছ কিংবা জলের পোকা ঠেকে অমনি ওয়েডার তাকে পেটে পোরে। এই যে শুধু ঠোঁট দিয়ে চিনে কোনটা খাদ্য আর কোনটা অখাদ্য তা চিনে নেওয়া, এই কাজটা ওরা কত তাড়াতাড়ি করতে পারে জানো? এক সেকেণ্ডের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ সময়ে।

সমুদ্র হল খাদ্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। তবে এই ভাণ্ডার থেকে খাবার জোগাড় করতে হলে প্রথমেই একটা জিনিস চাই, তা হল অফুরন্ত ওড়ার ক্ষমতা। গাল বা সিন্ধুসারস, টার্ন বা সিন্ধুচিল, ফ্রিগেট আর অ্যালব্যাট্রস হল এরকমই কিছু পাখি যারা সারা পৃথিবীর সমুদ্রের ওপরের আকাশকে শাসন করছে। এরা জলের ওপর ভাসতে ভাসতে ঢেউ থেকে মাছ ধরে খায়। জেলে নৌকা কিংবা জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া এটোকাঁটাও গালদের প্রিয় খাদ্য। সেইজন্যেই বন্দর কিংবা

জাহাজের চারপাশে চক্রাকারে এদের উড়তে দেখা যায়। খাদ্যসংগ্রহের জন্যে ওড়ার অক্লান্ত ক্ষমতা ছাড়া এদের মধ্যে কারুর কারুর আরো একটা চমৎকার ক্ষমতা রয়েছে। সেটা হল এদের নাক। দেখা যায় অ্যালব্যাট্রসদের নাকটা ঠোঁটের ওপর টিউবের মতো ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে। ফলে এদের ঘ্রাণশক্তি অসামান্য। সেই ঘ্রাণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এরা জলের ওপরে ভেসে থাকা যে কোনো রকম খাবারের কাছে পৌঁছে যায়, সে দিনেই হোক কিংবা রাতে।

ঢেউ ভেদ করে জলের গভীরে ডুব দিয়ে মাছের পেছনের সাঁতরে ধাওয়া করে তাকে পেটে পোরে এমন পাখিও অনেক রয়েছে। পানকৌড়ি তো আমাদের খুবই চেনা এরকম একটা পাখি, তবে সে সমুদ্রে যায় না। সমুদ্রের জলে শিকার করে এরকম কয়েকটা শিকারী পাখির নাম অক্, বুবি আর গ্যানেট। তাছাড়া পেঙ্গুইন তো আছেই।

মোটকথা যা বোঝা যাচ্ছে পাখিদের হাত সরি, সরি, পাখিদের ঠোঁট থেকে কারুরই নিস্তার নেই। হাওয়ায় ভাসুক, জলে ডুবুক, পাতায় লুকোক আর গর্তেই সেঁধোক – যদি তাকে খেলে শরীরে জোর পাওয়া যায়, পাখি তাকে খাবেই।

পেঁচার দ্বিতীয় ছবিটি উইকিমিডিয়া কমনসের সৌজন্যে। শেষের বুবিপাখির ডাইভের ছবিটি নেয়া হয়েছে অর্কাইভ নামের মুক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অন্যান্য ছবি সংগ্রহঃ লেখক।

চেনা পাখির অচেনা পরিচয়

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশপাতি (গ্রিন বি ইটার)

ছোট আকারের সবুজ বর্ণের এই পাখিটির গলায় নীলচে আভা থাকে। চোখের দু পাশে সুক্ষ্ম কালো রেখা টানা থাকে। ঠোঁটটি হয় সুঁচালো, কালো বর্ণের। এরা প্রধানত পোকামাকড় খায়। ঘাসজমি ও হালকা বনাঞ্চলে এদের দেখা যায়। বালি বা কাদার উঁচু আলে সুড়ঙ্গের মত গর্ত বানিয়ে এরা বাসা তৈরি করে।

টেকনো টুকটাক

চ্যানেল টানেল

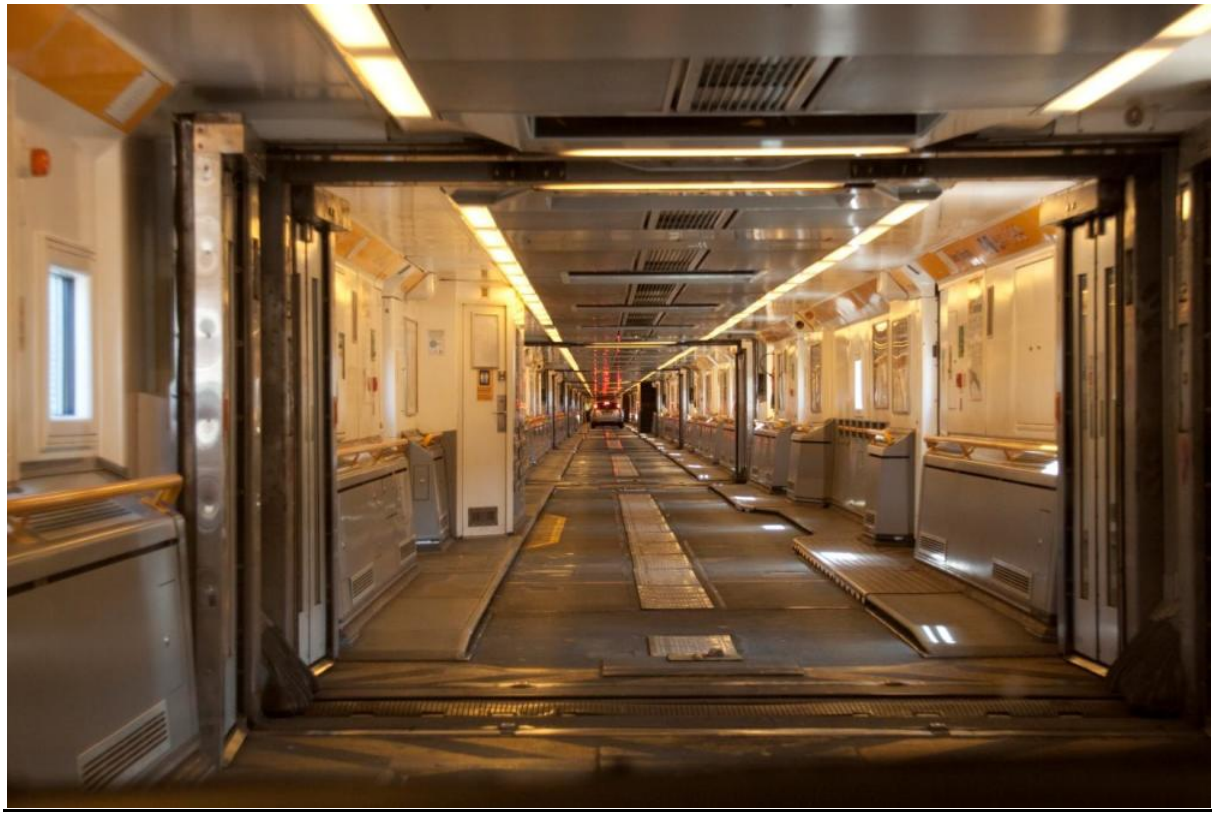

কিশোর ঘোষাল

তোমরা ইউরোপের ম্যাপটা একটু মন দিয়ে যদি লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আর ফ্রান্সের মাঝখানে আছে ইংলিশ চ্যানেল। এই চ্যানেলটি আসলে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের একটা অংশ, লম্বায় প্রায় ৫৬৩ কিলোমিটার। আর চওড়া কোথাও কোথাও প্রায় ২৪০ কিমি। ইংলিশ চ্যানেলের সঙ্গে আমাদের, মানে বাঙালিদের বহুদিনের সম্পর্ক। সেই ১৯৫৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, মিহির সেন অসীম দক্ষতা আর বুকভরা সাহস নিয়ে সাঁতরে পার হয়েছিলেন এই চ্যানেলটি। তাঁর সময় লেগেছিল ১৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিট, সেই সময় এটা একটা রেকর্ড ছিল। ভারত তো বটেই, এশিয়ার মধ্যেও তিনিই ছিলেন এই কৃতিত্বের প্রথম অধিকারী। মিহির সেন ইংল্যাণ্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সের ক্যালে পর্যন্ত যে জায়গায় সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন সেখানে চ্যানেলটি মোটামুটি ৪২ কিমি চওড়া ছিল এবং এই জায়গাটাই চ্যানেলের সবচেয়ে সংকীর্ণ বলা চলে।

এখন যদি তোমরা ইংলিশ চ্যানেল পার হতে চাও, তোমার সময় লাগবে খুব বেশি হলে তিরিশ মিনিট। নাঃ, তোমাদেরকে সাঁতারও কাটতে হবে না, কিংবা জাহাজেও চড়তে হবে না। ডোভার থেকে ক্যালে যাবার এখন সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ট্রেন। যাত্রী হিসেবে ট্রেনে চড়ে পড়তে পারো কিংবা গাড়ি নিয়েও উঠে পড়তে পারো শাট্‌ল্ ট্রেনে, সবশুদ্ধ তোমাকে ট্রেন পার করে দেবে ইংলিশ চ্যানেল।

ইংলিশ চ্যানেলের অনেকটা নিচে, মাটির ভেতর দিয়ে দ্রুতগামী ট্রেন চলাচলের জন্যে সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে গেছে বেশ ক'বছর হল। ১৯৮৮- র ২৮শে ফেব্রুয়ারি এই টানেলের কাজ শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছে ১৯৯৪ সালে। বাইশে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ থেকে চালু হয়ে গেছে নিয়মিত রেল পরিসেবা। আমেরিকান সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারস- এর মতে সারা বিশ্বে সাতটি বিস্ময়কর সর্বাধুনিক নির্মাণের মধ্যে এই টানেল হচ্ছে অন্যতম।

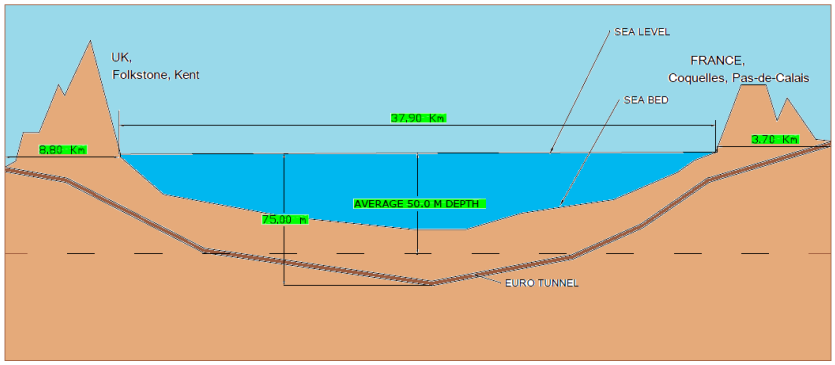

ইংলিশ চ্যানেলের সমুদ্রতল থেকে গড় ৫০মি নিচে দিয়ে মোট তিনটে সমান্তরাল সুড়ঙ্গ বানানো হয়েছে। কোথাও এই সুড়ঙ্গ ৭৫মি নিচে দিয়েও গিয়েছে। পাশাপাশি দুটো প্রধান সুড়ঙ্গের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে তিরিশ মিটার। এই দুটো সুড়ঙ্গ দিয়েই রেলগাড়ি যায় – একটা আপ আরেকটা ডাউন। ট্রেনের গতিও নেহাত ফেলনা নয়, ১৪০ কিমি/ঘন্টায়। এই প্রধান দুটো সুড়ঙ্গের ব্যাস হচ্ছে ৭.৫০ মি। এই দুটো ছাড়াও আরেকটি ছোট সুড়ঙ্গ বানানো হয়েছে, দুটো প্রধান সুড়ঙ্গের ঠিক মাঝ বরাবর, প্রধান সুড়ঙ্গদুটোর রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে। এই ছোট সুড়ঙ্গটির ব্যাস ৪.৫০ মি।

ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের বাঘা বাঘা ইঞ্জিনিয়ারদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই সুড়ঙ্গপথের নকশা আর

নির্মাণ হয়েছিল। সুড়ঙ্গ কাটার জন্যে মোট ১১টি টিবিএম (টানেল বোরিং মেসিন) ব্যবহার করা হয়েছিল। এক একটি টিবিএম মেশিনের ওজন প্রায় ১১০০ টন! প্রায় তের হাজার প্রযুক্তিবিদ ও কলাকুশলী মিলে ছ'বছর দিনরাত কাজ করে এই প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করেছেন। এই সুড়ঙ্গ খোদাই থেকে যে পরিমাণ মাটি আর পাথর বেরিয়েছিল তাতে ১৩ খানা প্রমাণ সাইজের ফুটবল- স্টেডিয়াম ভর্তি করে ফেলা যায়।

এই তিনটি সুড়ঙ্গের প্রত্যেকটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ ৫০.৪০ কিমি। তার মধ্যে সরাসরি সমুদ্রের নিচের দৈর্ঘ ৩৭.৯ কিমি। বাকিটা স্থলে – ইংল্যাণ্ডের দিকের দৈর্ঘ ৮.৮০ কিমি আর ফ্রান্সের দিকের দৈর্ঘ ৩.৭০ কিমি।

এই সুড়ঙ্গের নাম ইউরোটানেল বা চ্যানেল টানেল। এরকম একটা দুটো সুড়ঙ্গ বড়ো হয়ে তোমরা বানিয়ে ফেলতে পারো আমাদের দেশেও। আমাদের গুজরাট রাজ্যের ম্যাপটা যদি দেখ, দেখবে কচ্ছ উপসাগরের জন্যে জামনগর শহর থেকে গান্ধীধাম যেতে গেলে স্থল পথে প্রায় ২২৫ কিমি ঘুরে যেতে হয়। আমরা যদি ইউরো টানেলের মতো একটা সুড়ঙ্গ বানাতে পারি, তাহলে এই দূরত্ব ১০০ কিমির মধ্যে হওয়া সম্ভব। বেঁচে যাবে অনেকটা সময় আর অনেক জ্বালানি তেল, তাই না?

হাতে আঁকা ছবিঃ লেখক
ফোটগ্রাফঃ ক্রিয়েটিভ কমনস

অঙ্ক নিয়ে মজা

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

অঙ্ক মানেই দুর্বোধ্য জটিলতা নয়, তাতে মজাও আছে। এখানে কয়েকটা গাণিতিক প্রশ্ন হাজির করলাম। প্রশ্নগুলো নতুন কিছু নয়, অনেকে হয়তো জানে। তাহলেও একত্র করে দিলাম, দেখো তো মজা পাওয়া যায় কি না?

প্রথম প্রশ্নঃ একটি মন্দিরে যেতে ৬০০ সিঁড়ির ধাপ পার হতে হয়। এক ব্যক্তি একদিন ঠিক সকাল আটটায় সিঁড়ি চড়তে শুরু করে একঘন্টায় ওপরে পৌঁছল। তার পরদিন আবার ঠিক সকাল আটটায় সে নামতে আরম্ভ করে ঠিক চল্লিশ মিনিটে নীচে নেমে এল। এখন প্রশ্ন হল, এই ওঠা ও নামার বেলায় একই সিঁড়ির ধাপে একই সময়ে তার পা রাখা সম্ভব কি?

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ নীচে একটা সংখ্যার সম্বন্ধে চারটে স্টেটমেন্ট (ক)-(ঘ) দেওয়া হলো, যার মধ্যে একটা, এবং মাত্র একটাই, ভুল :

(ক) সংখ্যাটি দু'অঙ্কের
(খ) এটা ১৫০ এর গুণনীয়ক বা বিভাজক (সাদা বাংলায় যাকে বলে...ইয়ে...factor)
(গ) সংখ্যাটি ১৫০ নয়
(ঘ) এটা ২৫ দ্বারা বিভাজ্য (divisible)

যুক্তি দিয়ে বলতে পারবে, কোনটা ভুল ?

তৃতীয় প্রশ্নঃ এবার একটা খেলা। ২০টা কার্ড আছে যার ১১ টা কার্ডে লেখা win, আর বাকি ৯টা কার্ডে লেখা loss। ভাল করে শাফল করে কার্ডগুলো রাখা হল। খেলাটা শুরু হবে কিছু টাকা নিয়ে, ধরা যাক ১০০০০ টাকা। খেলার নিয়ম হল, একটা করে কার্ড তুলতে হবে। যদি win আসে তাহলে হাতে যত টাকা আছে তার অর্ধেক পাওয়া যাবে। আর loss এলে হাতে যত টাকা আছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। এইভাবে সবকটা কার্ড তুলে যেতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, যে টাকা নিয়ে শুরু করা হয়েছিল, খেলার শেষে তার চেয়ে বেশী টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা কত?

চতুর্থ প্রশ্নঃ আর একটা খেলা। বারোটা একই আকার ও আকৃতির কয়েন টেবিলে রাখা আছে, ছ'টার হেড ওপরদিকে আর বাকি ছ'টার টেল ওপরদিকে। এই বারোটা কয়েনকে ছ'টা করে দুভাগে ভাগ করতে হবে, যাতে দুটো ভাগেই একই সংখ্যক হেড আর একই সংখ্যক টেল থাকে। অর্থাৎ প্রথম ভাগে যদি দুটো হেড ও বাকি চারটে টেল থাকে তাহলে দ্বিতীয় ভাগেও দুটো হেড ও চারটে টেল থাকবে। দুটো ভাগেরই এক বা একাধিক কয়েন উল্টে রাখা যেতে পারে। মনে হতে পারে, এতে আর সমস্যা কোথায়? সমস্যাটা হল, এই কাজটি করতে হবে হয় চোখ বেঁধে না হলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। মানে হেড আর টেল না দেখে। এটা পুরোপুরি অঙ্কের খেলা, হাতে হেড বা টেল ফিল করার কোন চালাকি নেই।

পঞ্চম প্রশ্নঃ সবশেষে একটা চালাকির প্রশ্ন। একটা ব্রিজ হেঁটে পার হতে আধ ঘন্টা সময় লাগে। ব্রিজের ঠিক মাঝখানে একটি লোক বসে টোল-ফি আদায় করে। মজার কথা হচ্ছে, লোকটি ঠিক পনের মিনিট জেগে থাকে আর পনের মিনিট ঘুমিয়ে নেয়। সে যখন জেগে থাকে, তখন ব্রিজের ওপর কারুকে দেখলে টোল-ফি আদায় না করে যেতে দেবে না। এই অবস্থায় টোল-ফি না দিয়ে ব্রিজটা পার করার উপায় কি?

||সমাধান||

।১। উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, উঠতে ও নামতে তাকে একই সময়ে কোনও একটি নির্দিষ্ট সিঁড়িতে পা রাখতেই হবে। ব্যাপারটা জলের মতো সহজ লাগবে, যদি একটির বদলে দুটি লোক আছে মনে করা হয়। একজন ওপরে এবং অন্যজন নীচে। ঠিক আটটায় একইসঙ্গে তারা যথাক্রমে নামতে ও উঠতে শুরু করল। ওপরের লোকটি চল্লিশ মিনিটে নীচে এসে যাবে। অন্যজন তখন ২/৩ ভাগ রাস্তা পার হয়েছে। তাহলে এই ২/৩ অংশ পথে নিশ্চই কখনো তারা একই জায়গায় মিলিত হয়েছিল, যখন তারা পরস্পরকে অতিক্রম করেছে। তাই নয় কি?

এইভাবে দু'জন লোকের কল্পনা করে নিলে, বাকি হিসেবটাও খুব সহজ। প্রাথমিক সময়-দূরত্ব অংক কষে সহজেই পাওয়া যাবে, ওঠবার এবং নামবার দু'ক্ষেত্রেই ঠিক ৮টা ২৪ মিনিটে সে নীচ থেকে ২৪০ নম্বর ধাপটায় পা রেখেছিল।

।২। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের একটাই উপায়, - একটা একটা করে সম্ভাবনা বাতিল করা । ট্রিকটা হচ্ছে 'একটা, এবং মাত্র একটাই ভুল'। এখন দেখা যাক...

ধরা যাক (ক)-টা ভুল, সেক্ষেত্রে সংখ্যাটা ১ বা ৩ অঙ্কের । তার বেশী অঙ্কের হলে ১৫০ এর ফ্যাক্টর হবে না [(খ) দ্বারা]। এক অঙ্কের হলে ২৫ এর গুনিতক হতে পারে না [(ঘ) দ্বারা]। ১৫০ এর তিন অঙ্কের ফ্যাক্টর শুধু ১৫০-ই আছে, যেটাও হবে না [(গ) দ্বারা]। সুতরাং (ক) ভুল হতে পারে না।

ধরা যাক (খ)-টা ভুল (ক) এবং (ঘ) দ্বারা, সংখ্যাটি ২৫, ৫০ কিংবা ৭৫, যার প্রত্যেকটিই ১৫০-র বিভাজক। (খ) ভুল হলে তা হতে পারে না। সুতরাং (খ) ভুল হতে পারে না।

ধরা যাক (গ)-টা ভুল অর্থাৎ সংখ্যাটি ১৫০, যা (ক) দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং (গ) ভুল হতে পারে না।

সুতরাং (ঘ)-টাই ভুল। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, এক্ষেত্রে (ক), (খ), (গ) ঠিক হতে বাধা নেই, (যেমন, সংখ্যাটি ১৫ বা ৩০ হতে পারে)।

।৩। প্রতিবার win আসলে তোমার হাতের পরিমাণ দেড়গুণ হয়ে যাচ্ছে এবং loss এলে আদ্ধেক । এই হিসেবের তো কোন নড়চড় নেই, তা সে win আর loss যে ক্রমেই আসুক না কেন। অর্থাৎ, শুরুর অঙ্কটা ১১ বার ৩/২ দিয়ে গুণিত হবে আর ৯ বার ১/২ দিয়ে। এইটাই প্রথমে মাথায় আসে না।

সুতরাং ২০ বার খেলার পরে হাতে থাকবে - টা. $১০০০০\times(৩/২)^{১১}\times(১/২)^{৯}$ = টা. ১৬৮৯.৪০, অর্থাৎ ১০০০০ টাকার বেশী থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই!

।৪। যা করতে হবে সেটা হল এই। যে কোন ছ'টা করে কয়েন নিয়ে দু'ভাগ করে ফেলা যাক। এটা অন্ধকারেও করা যাবে, কিছু না দেখে। তারপর যে কোন একটা ভাগের কয়েনগুলো উল্টে দাও, কিছু দেখবার প্রয়োজন নেই। যা দরকার তাই পাওয়া যাবে।

নিশ্চই অবাক লাগছে। নীচের ছকটা থেকেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা যাক প্রথম বিভাগে h সংখ্যক হেড রইল। তাহলে দুটি বিভাগে হেড আর টেলের সংখ্যা কি হবে?

	প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ
হেড	h	6-h
টেল	6-h	6-(6-h)=h

অতএব, যে কোন একটা ভাগের কয়েনগুলো উল্টে দিলেই কেল্লাফতে!

।৫। এটা নিছকই চালাকির প্রশ্ন, অঙ্কের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। টোল-ফি আদায়কারী লোকটি ঘুমিয়ে পড়ামাত্র ব্রিজ পার হতে শুরু করতে হবে। ব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছতেই আদায়কারীর ঘুম ভাঙ্গবে। এইখানেই একটা কায়দা করতে হবে। লোকটার ঠিক ঘুম ভাঙ্গার আগেই চট করে ঘুরে যে দিক থেকে আসছিলে সেইদিকেই হাঁটা দাও। ঘুম ভেঙ্গেই লোকটি দেখবে ফি না দিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ। ঘাড় ধরে সে তোমায় 'উল্টো' দিকে পাঠিয়ে দেবে।

মহাজনে বলে গেছেন, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। তাই কোন চালাকি না করেও সময়-দূরত্বের কিছু দারুণ বুদ্ধির অঙ্ক আছে। পরে কোনওসময়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

মৃগ- পক্ষী শাস্ত্র ও হংসদেব

সংহিতা

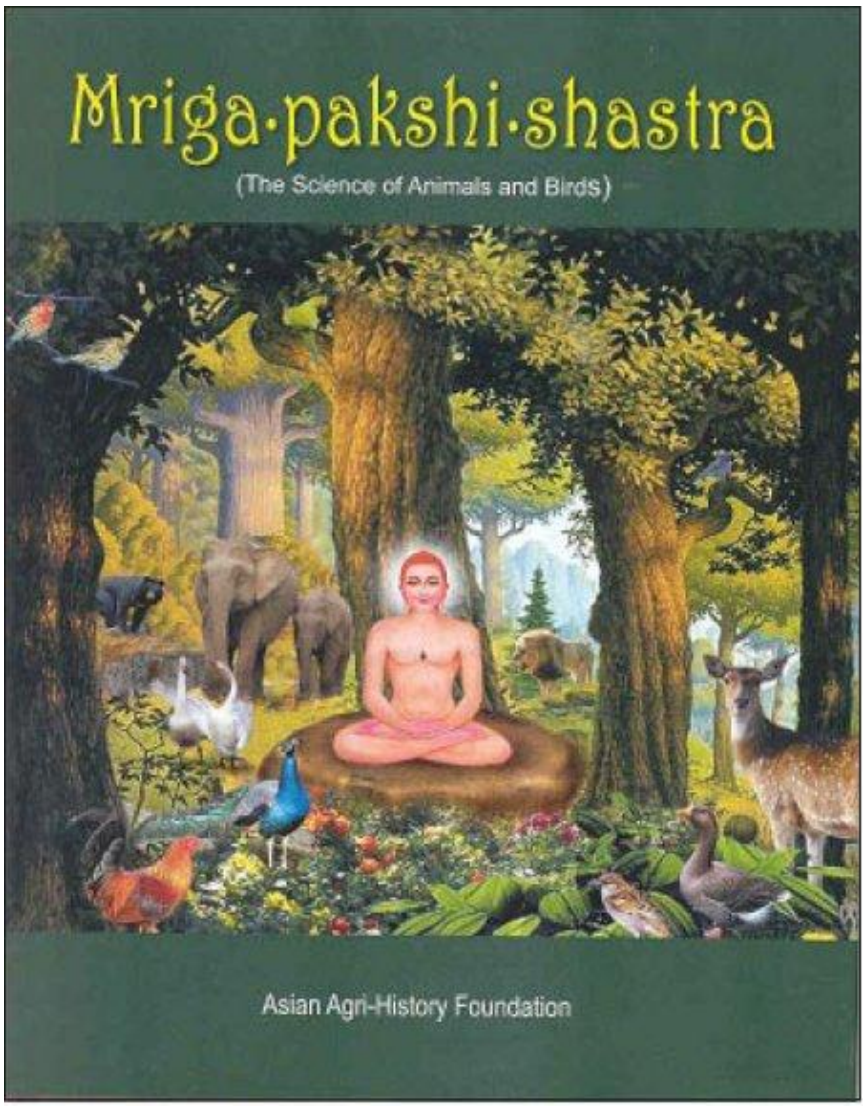

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার প্রমাণ হিসেবে কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে গত দু শতকে। তবে সে সব পাণ্ডুলিপির জন্ম সত্যিই মধ্যযুগে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে। এইসব বইয়ের মধ্যে প্রধান হলো হংসদেব নামে এক জৈন কবির লেখা মৃগ- পক্ষী শাস্ত্র।

এই বইটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে বলে জানা যায় যে এই বইতে ঠিক কী আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বইটির লেখক সম্পর্কে যে অতি অল্প তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে স্পষ্ট হয় নি যে বইটি খ্রিষ্টিয় তের শতকে লেখা নাকি তার থেকে অনেক আগে লেখা। তবে বইটির লেখকের নাম যে হংসদেব সে ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করেন নি। লেখক যে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাও নাকি বইটির ভূমিকা থেকে স্পষ্ট। কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া যায়নি লেখকের বাসস্থান, জন্মস্থান এসব ব্যাপারে। যদিও বইটি থেকে জানা যায় যে লেখকের গ্রামের নাম ছিল মণ্ডক আর সরস্বতী নদীর তীরে সেই গ্রাম, কিন্তু বর্তমানে মণ্ডক নামে গ্রাম আছে কর্ণাটকে, আর সরস্বতী নদী আছে গির অরণ্যের কাছে গুজরাটে। এই নদীকে মনে করা হয় বৈদিক অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর অংশ। বৈদিক সরস্বতী নদীর উৎপত্তি গাঢ়োয়াল হিমালয়ের সরস্বতী হিমবাহ থেকে। তারপর নদীখাত উত্তরাঞ্চল, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান হয়ে থর মরুভূমিতে পাতালে প্রবেশ করে আবার জেগে উঠেছে গুজরাটে।

বাকি সব তথ্যের উপর নির্ভর করলে মনে করা যায় যে লেখক হংসদেব পশ্চিম ভারতের বাসিন্দা ছিলেন। এর সপক্ষের জোরালো কারণগুলো ভৌগোলিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। মৃগ- পক্ষী

শাস্ত্রতে সিংহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, যা সারা ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র গুজরাটের গির অরণ্যেই পাওয়া যায় এবং ভারতের ঐ অঞ্চলেই সব থেকে বেশি দেখা যায় জৈন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ। তাছাড়া জৈন ধর্মাবলম্বীদের গ্রামের নাম কর্ণাটকে আর গুজরাটে একই হতেও পারে। যেকোনো গ্রামের সীমা ও অবস্থান পরিবর্তনশীল; লোকমুখে গ্রামের নামও প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানে বদলে যেতে পারে কোনো কোনো জায়গায়। হতে পারে যে পশ্চিম ভারতের গির অরণ্যের কাছাকাছি যে গ্রামে থাকতেন কবি হংসদেব, সেই মণ্ডক গ্রামের নামটি বদলে গেছে, বা গ্রাম থেকে কোনো কারণে বসত উঠে যাওয়ায় গ্রামটি আর নেই। কিন্তু কর্ণাটকের মণ্ডক গ্রামটি পরে গড়ে উঠেছে বা তার নামটা অবিকৃত থেকে গেছে; কিংবা হংসদেবের গ্রাম থেকে কেউ কর্ণাটকে গিয়ে গ্রামটিতে বসত শুরু করেছেন বলে গ্রাম দুটির নাম এক।

শুধু সিংহের কথাই নয়, সাধারণভাবে ভারতে যত জন্তু দেখা যায় তার অধিকাংশের বিষয়েই বিশদ বর্ণনা আছে মৃগ- পক্ষী শাস্ত্রতে। এই বইয়ের বর্ণনায় শুধু প্রাণী নয় স্থান পেয়েছে পাহাড়- পর্বতের মতো নির্জীব বিষয়ও। যদিও আধুনিক জীববিদ্যা যেভাবে শ্রেণী বিন্যাস করে প্রাণীদের বর্ণনা করে, সেভাবে হংসদেব তাঁর আলোচনা করেন নি, কিন্তু তাঁর আলোচনা বিষয়ে ও বিস্তারে বিশাল ছিল। বন্য পশুপাখীদের পাশাপাশি মৃগ- পক্ষী শাস্ত্রে জায়গা পেয়েছিল গৃহপালিত জন্তু ও পাখ- পাখালি। এই সমস্ত প্রাণীর শারিরীক বিবরণের সাথে ছিল তাদের জীবনের মেয়াদেরও উল্লেখ। ফলে পশুপালকরা সহজেই বুঝতে পারতেন যে কিভাবে কতোদিন পরে তাঁদের খামারে নতুন পশু বা পাখি আনতে হবে; কিংবা কবে কখন কোন পশু বা পাখিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় যাতে তাদের থাকে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায়। শিকারীদের সুবিধে ছিল যে এই বই থেকে তাঁরা জানতে পারতেন কোন পশু বা পাখিকে কোন ঋতুতে শিকার করা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পক্ষে।

হংসদেব আসলে কবি ছিলেন। পুরো মৃগ- পক্ষী শাস্ত্র লিখেছিলেন অনুষ্টুপ ছন্দে। তাঁর বিশাল পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান গেঁথেছিলেন একহাজার সাতশ শ্লোকে। তার মধ্যেই লেখা আছে জৈননগরীর রাজা শৌদদেবের কথা আর সরস্বতী নদীর কথা। আরও লেখা আছে যে হংসদেব রাজা শৌদদেবের সভাকবি ছিলেন। ১৯২৭ সালে সুন্দরাচার্য যখন মৃগ- পক্ষী শাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ করেন তখন তিনি জানিয়েছিলেন যে হংসদেবের এই বইটি ত্রয়োদশ শতাব্দিতে লেখা। তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই জানার বা প্রমাণ করার যে বইটি ঠিক কবে লেখা হয়েছিল। তবে কোনো ভাবেই এই বইটির কথা জানা যেত না যদি না লিপিবিদ পণ্ডিত বিজয়রাঘবচারিয়ার এর পান্ডুলিপিটা বাঁচিয়ে রাখতেন। পণ্ডিত বিজয়রাঘবচারিয়ার সেই পান্ডুলিপির প্রতিলিপি দিয়েছিলেন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার হাতে তাঁর রাজ্যের জাদুঘরের সংগ্রহে রাখার জন্য। আর তাছাড়া আরেকটা প্রতিলিপি তিনি দিয়েছিলেন উত্তর আমেরিকার মন্ট্রিয়াল শহরের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ক্যাসেউডের হাতে। ভারতবর্ষে প্রাণীবিদ্যা চর্চার প্রাচীনতম নিদর্শন মৃগ- পক্ষী শাস্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছে সেকন্দ্রাবাদ শহরের এশিয়ান এগ্রি- হিস্ট্রি ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা।

ইন্দো- বার্মা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ও মিজোরামের জীববৈচিত্র্য

মিজোরামের ভূ- প্রকৃতি ভূতাত্ত্বিক বিচারে বেশ পুরোনো। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের মাঝে মাঝেই আছে সমতল নদী উপত্যকা আর হ্রদ। পাহাড়ি অঞ্চলে হ্রদ মানে খানিকটা জলা জায়গাও থাকে তার সাথে। যেহেতু বহমান নদী আছে, সেহেতু পুরোন পাথর ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজ চলছে অবিরত। আবার পাহাড়ের কারণে মানুষের চলাচলের পক্ষে বেশ দুর্গম এলাকা এই রাজ্য। তাই মানুষের বাসও এখানে কম। রাজ্যের মোট বাসিন্দাদের অর্ধেকের কিছু কম মানুষ থাকেন গ্রামে, আর অর্ধেকের কিছু বেশি লোক থাকেন শহরে। ফলে এখানে মানুষের পালিত পশুও কম, চাষের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণও কম। সেই জন্য এ রাজ্যে বনের ভাগ রাজ্যের মোট এলাকার চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগেরও বেশি।

বনবিদ চ্যাম্পিয়ন ও শেঠের হিসেবে এখানে মূলত ছ'ধরনের বন দেখা যায় যেগুলোকে চারটে গোষ্ঠীতে ফেলা হয়েছে। যেমন ক্রান্তীয় প্রায় চিরহরিৎ বন, ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বন, উপক্রান্তীয় পাহাড়ি বড়ো পাতাওয়ালা গাছের বন, উপক্রান্তীয় পাইন বন। এর মধ্যে প্রথম ধরনের বনেই ছেয়ে আছে মিজোরাম। দ্বিতীয় ধরনের বন আছে প্রথম ধরনের বনের প্রায় তিনভাগের একভাগ এলাকায়। শেষ দুই ভাগের মধ্যে তৃতীয় ভাগের এলাকা চতুর্থের থেকে বেশি, কিন্তু প্রথম দুই ভাগের তুলনায় এই দুই জাতীয় বন আয়তনে সামান্যই।

সুতরাং মিজোরামের বনে মূলতঃ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনের পশুদেরই বাস। এখানে দুটো জাতীয় উদ্যান আর আটটা অভয়ারণ্য আছে। আপাতত কোনো বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তৈরি করা হয় নি। অর্থাৎ এখানে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের এলাকার প্রাণীদের মতো সংকটজনক নয়, তবে সংকটজনক তো অবশ্যই। বিশেষতঃ বাঘের অস্তিত্ব সংকট বেশ গভীর। তাই আছে ড্যাম্পা টাইগার রিজার্ভ। কিন্তু এই এলাকার বনের বিশেষত্বের কারণে ও ভূ-প্রকৃতির দুর্গমতার কারণে বেশ কিছু প্রজাতির প্রাণী সারা পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র এখানেই পাওয়া যায়। সেটাই এই অঞ্চলের বনকে বাঁচিয়ে রাখার সপক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি।

রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে সংরক্ষিত করার জন্য মিজোরামের উত্তর- পশ্চিমে তৈরি হয়েছে ড্যাম্পা টাইগার রিজার্ভ। সুতরাং বাঘের সাথে এখানে সংরক্ষিত হয় হাতি, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার আর হলক গিবন। হলক গিবন এক জাতীয় বাঁদর। তাছাড়া অনেক রকম পাখিও সংরক্ষিত হয় এখানে। বনের বেশির ভাগটাই ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বন।

জাতীয় উদ্যানদুটির নাম যথাক্রমে মুরলেন ও ব্লু মাউন্টেন। মুরলেন জাতীয় উদ্যানে দিনের বেলা অন্ধকার থাকে ঘুটঘুটে। বনের মাথায় যতো সূর্যের আলো পড়ে তার একশো ভাগের একভাগ মাত্র গাছের ডালপালা ভেদ করে মাটিতে পৌঁছোয়। সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি বয়সি কিছু গাছ আছে এখানে। আরও মজার ব্যাপার হলো এখানে চারটি বনগোষ্ঠীর গাছই দেখা যায়। কারণ ভৌগোলিক অবস্থাণে এই বন উপক্রান্তীয় হলেও উচ্চতার কারণে এখানে পাইন বনের দেখা মেলে। পাখির মধ্যে বিশেষ হলো হিউমস্ বার- টেইলড ফেজেন্ট নামের বড়ো লেজ বা ছোটো পেখমওয়ালা পাখি। পশুদের মধ্যে গোরাল আর সেরো এই এলাকার বিশিষ্ট ছাগলজাতীয়

প্রাণী। তাছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীদের মধ্যে আছে বাঘ, হলক গিবন, চিতা, ভালুক এবং নানান প্রজাতির পাখি।

ব্লু মাউন্টেন জাতীয় উদ্যান পাহাড়ের মাথায়। তাই এখানে গাছ মূলতঃ উপক্রান্তীয় পাইন বনের। পশুর মধ্যে প্রধান হলো লেপার্ড, সেরো আর গোরাল। পাখির অনেক রকমের মধ্যে নজর কাড়ে ট্র্যাগোপ্যান, যা হলো আরেকরকম বড়ো লেজ বা ছোটো পেখমওয়ালা পাখি।

অভয়ারণ্যগুলির মধ্যে প্রধান হলো ঙেংপুই, খাওংলুং, টাউই, লেংটেং এবং থোরাংট্লেং। ঙেংপুই অভয়ারণ্যটি মিজোরামের দক্ষিণ- পশ্চিমে। কিন্তু এর বিভিন্ন জায়গা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুশো মিটার থেকে এক হাজার দুশো মিটার উঁচু। ফলে জীববৈচত্র্য উপক্রান্তীয় থেকে উপক্রান্তীয় পাইন বনের মতো। এখান বাস করে যে সব পশু তাদের মধ্যে প্রধান হলো বাঘ, হাতি, ক্লাউড লেপার্ড, সম্বর, হলক গিবন, হনুমান, রেহ্শাস বাঁদর, লিফ মাঙ্কি বা লুটুন নামের ছোট্ট বাঁদর, গাউর, বার্কিং ডিয়ার এবং বুনোশুয়োর।

খাওংলুং অভয়ারণ্যটি মিজোরামের ভৌগোলিক প্রাণকেন্দ্রে বলা যায়। এখানেও উচ্চতার পার্থক্যের জন্য বন ঙেংপুই অভয়ারণ্যের মতোই। প্রাণী বৈচিত্র্য বেশ কম। নানা ধরনের পাখি ছাড়া বাঘ, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, সেরো আর হলক গিবন দেখা যায়।

লেঙ্ংটেং অভয়ারণ্য মুরলেন জাতীয় উদ্যানের কাছাকাছি। কিন্তু এর উচ্চতা দু হাজার তিনশো মিটারেরও বেশি। এই বনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বাকি সব বনের মতোই। তবে বৈশিষ্ট হলো যে এখানে কালিজ ফেজেন্ট দেখা যায়।

থোরাংট্লেং অভয়ারণ্য ড্যাম্পা টাইগার রিজার্ভের কাছে। এই বনের গুরুত্ব হলো যে এটি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে হাতি চলাচলের করিডর।

অন্যদুটি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত বন হলো পালক অভয়ারণ্য ও ফওংপুই। বলাবাহুল্য এই দুই বনেও গাছপালা আর পশুপাখি মিজোরামের অন্যান্য বনের মতোই।

মিজোরামের বনের আশু সংকট হচ্ছে যে দেশি- বিদেশি খনিজ তেল ব্যবসায়ী সংস্থা এ রাজ্যে পৌঁছেছে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের খোঁজে। এদের খোঁজ সার্থক হলে বনের ওপর কোপ পড়তে পারে। তবে আশার কথা হলো যে এই দুই খনিজ তোলার জন্য সরু গর্তই যথেষ্ট। অর্থাৎ মাইলের পর মাইল বন কেটে ফেলে খনি বানাতে হবে না। তবু খনির কর্মীদের কাজের ও থাকার জায়গা দিতে গেলে বন তো কিছুটা ধ্বংস হবেই। মুরলিন জাতীয় উদ্যানের সৌন্দর্য ও বিস্ময়কে টিকে থাকার জন্য লড়তে হবে মানুষের প্রয়োজনের সাথে।

বনের ডায়েরি

চেন্দরু আর টেবুর গল্প

স্বপ্না লাহিড়ী

দূর থেকে মার গলার আওয়াজ ভেসে আসছে, "চেন্দরু উ উ--- চেন্দরু রে. . . . . "

বস্তরের শ্বাপদ সঙ্কুল ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট গ্রাম গঢ়বেঙ্গলা। সেখানেই বাবা মার সঙ্গে থাকে ছোট্ট ছেলে চেন্দরু। সেই সকালে বেরিয়ে গেছে বন্ধু গেংরুর সাথে পাখি মারতে। সন্ধে হয়ে এল, এখনো ফিরছে না ছেলে দুটো। জঙ্গলে অন্ধকার ঝপ করে নামে। তার ওপর খবর আছে একটা তেন্দুয়া(লেপার্ড) নাকি ঘরের সামনে থেকে দুটো বাচ্চা তুলে নিয়ে গেছে, ঘর থেকে খানিক দূরে তাদের রক্তমাখা জামা কাপড়ও পাওয়া গেছে। গ্রামেরই একজন গিয়েছিল জঙ্গলে কাঠ কাটতে, পিছন থেকে

দাঁত বসিয়েছিল তার পায়ে। নিচু হয়েছিল বলে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছিল সে। মায়ের কপালে চিন্তার রেখা।

একটু পরেই তাদের গলা শোনা গেল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো দুই বন্ধু। খালি গা, কোমরে একটুকরো কাপড় বাঁধা, মাথায় গলায় রঙিন পুঁতির মালা, হাতে তির ধনুক আর পিঠে ঝুলছে সেদিনের শিকার করা কয়েকটা বুনো মুরগি আর পাখি। আজ রাতেমা এই দিয়েই ভাত দেবে তাদের। এই গড়বেঙ্গলা গ্রামের বাসিন্দারা বড় গরিব। জঙ্গলের কাঠকুটো বেচে ঘরে চাল আনে তারা। কোনদিন খেতে পায় কোনদিন পায় না। কিন্তু সাত বছরের চেন্দরু দারিদ্রের কী বুঝবে ?

গড়বেঙ্গলা গ্রামের ধার থেকে শুরু ঘন জঙ্গল অবুঝমাড়। এখানে বাঘ. লেপার্ড ভালুক, বন্য দাঁতালো শুয়োর. হায়না আরও কত হিংস্র পশু ঘুরে বেড়ায়! পায়ে পায়ে ঘোরে বিষাক্ত সাপ। যে দিন গাঁয়ের বড় বুড়োরা বুনোশুয়োর শিকার করে আনে, উৎসব পড়ে যায়। পেট ভরে ঝলসানো মাংস খায় সবাই।

বাচ্চা চেন্দরু ভয় বোঝে না। একদিন সকালে সে ঘুরছে জঙ্গলে, পাখির খোঁজে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কাছের ঝোপ থেকে একটা কুঁই কুঁই আওয়াজ শুনে। সাবধানে ডালপালা সরিয়ে যা দেখলো, তাতে তো সে একেবারে অবাক। একটা ছোট্ট বাঘের বাচ্চা, সবে চোখ ফুটেছে বোধহয়। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, বাচ্চাটার মা কাছাকাছি নেই তো?

কাছের একটা ঝাঁকড়া গাছে চড়ে চেন্দরু বাচ্চাটার মায়ের ফেরার অপেক্ষা করতে থাকলো। সকাল পেরিয়ে, দুপুরও যায় যায়। বাচ্চাটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। তার মায়েরও দেখা নেই। আর দেরি না করে চেন্দরু নেমে এলো গাছ থেকে। পরম স্নেহে, তুলতলে নরম শাবকটিকে বুকে তুলে দৌড় দিল বাড়ির দিকে।

শুরু হল দুই বন্ধুর একসাথে বড় হওয়া। চেন্দরু আর তার প্রিয় বাঘ টেবু। জঙ্গলের পথে তারা ঘুরে বেড়ায় এক সাথে। কখনও চেন্দরু টেবুর পিঠে চেপে ঘোরে, আবার ক্লান্ত হয়ে পড়লে, তার পিঠে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এমনি করেই তাদের দিন চলছিল।

১৯৫৮ সাল, সুইডিশ চিত্র নির্মাতা আর্নে সুক্সডর্ফ আর তাঁর পত্নী এ্যসট্রিড এলেন বস্তারের জঙ্গলে, একটি চলচ্চিত্র তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এখানে এসে শুনলেন চেন্দরুর কথা, দেখলেন পুঁতির মালা গলা মাথায় জড়ানো , কোমরে এক টুকরো কাপড় বাঁধা, নগ্নদেহ বছর দশেকের এই বালক আর তার বাঘ টেবুকে। এদেরকে নিয়েই সৃষ্ট হল ১৯৬০ সালে তাঁর অস্কার পুরস্কার বিজয়ী ফিল্ম "ইন জাঙ্গল সাগা", যা পরে ইংরাজিতে রূপান্তরিত হয় "ফ্লুট অ্যান্ড অ্যারো" নামে ।

এই বইটিতে চেন্দরু দশটি বাঘ আর গোটা ছয়েক লেপার্ড নিয়ে কাজ করেছিল। গল্পটা গড়েই উঠেছিলো চেন্দরুকে নিয়ে। বস্তার নারায়ণপুরের অখ্যাত গ্রাম গঢ়বেঙ্গলাকে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছিলো একরত্তি এই ছেলেটি।

চেন্দরু তখন সুক্সডর্ফ দম্পতির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশে বিদেশে। খ্যাতির শিখরে সে। যারাই তাকে দেখতে আসে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বপ্নের মতন দিন কাটে তার। সুক্সডর্ফ দম্পতি স্থির করলেন চেন্দরুকে দত্তক নেবেন তাঁরা। নতুন জীবনের হাতছানিতে ঝলমল করে উঠলো তার মন। কিন্তু সুক্সডর্ফ দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদে সে স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেল তার।

ফিরে এসে পুরনো জীবনে আর মানিয়ে নিতে পারছিলো না সে। কারুর সাথে কথা বলে না। জীবনের চরম উপহাস বোধহয় সহ্য করতে পারছিলো না। কিন্তু তারপর বড় হতে হতে জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে সমঝোতা করতে শিখল

চেন্দরু। কখনো কখনো মুরিয়া আদিবাসীদের স্বতঃস্ফুর্ত নাচে গানে মেতে উঠতো আবার পরক্ষণেই উদাস মন নিয়ে চলে যেত জঙ্গলের আড়ালে। জীবনের ওপর বড় অভিমান তার।

স্মৃতি হিসেবে তার কাছে ছিলো শুধু এস্ট্রিড সুক্সডর্ফের লেখা চেন্দরুর জীবনের ওপর বেস্টসেলার বই "চেন্দরু দি বয় অ্যান্ড দি টাইগার"। বইটিতে কিছু ছবিও ছিল চেন্দরুর। পরবর্তী জীবনে, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মজদুরি করতে হত তাঁকে। ছেলে জয়রাম মান্ডাভি বলেন, কোন প্যান্টশার্ট পরা লোক দেখলেই চেন্দরু পালিয়ে যেতেন জঙ্গলে। এত দুঃখ, এত অভিমান তাঁর। তবু একটা ক্ষীণ আশা তাঁর মনে ছিল যে, সুক্সডর্ফ

সাহেব একদিন হয়ত তাঁর খোঁজে গড়বেঙ্গলা আসবেন। একেবারে ভেঙে পড়লেন চেন্দরু যেদিন তিনি সুক্সডর্ফ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পেলেন। সেটা ছিল ২০০১ সালের চৌঠা মে।

ভগ্ন স্বাস্থ্য, ভগ্ন মন নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন চেন্দরু। চিকিৎসার টাকা আসবে কোথা থেকে? এগিয়ে এলেন এক সহৃদয় জাপানি মহিলা এক লক্ষ টাকা নিয়ে আর প্রদেশের এক মন্ত্রী দিলেন পঁচিশ হাজার টাকা। সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু বছরখানেক আগে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হলেন চেন্দরু।

১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন চেন্দরু মান্ডাভি। শিয়রে বসেছিলেন ছেলে জয়রাম মান্ডাভি। জীবনের যত দুঃখ, অভিমান সব ইহলোকে ফেলে রেখে হয়তো প্রিয় বাঘ টেবুকে নিয়ে, চেন্দরু পরলোকে আবার আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন।

দন্ডকবনে বাঘ দর্শন

তাপসকিরণ রায়

সেই দণ্ডকবনেরই কথা। উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার পদমগিরি নামের জায়গা। সেখানের জঙ্গল এলাকাতে বেশ কিছু বাঙালি পরিবারের পুনর্বাসন হয়েছিল। এই পদমগিরি এলাকায় পাঁচ ছয়টি গ্রাম ছিল। গ্রামবাসীদের ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্যে ছিল একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তাতে আমি আর আমার স্ত্রী শিক্ষকতা করতাম। আমরা দুজনই মাত্র শিক্ষক,শিক্ষিকা। ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশ ষাটের মত। বড়রাস্তা থেকে গ্রামগুলি ছিল বেশ ভিতরে এবং গভীর জঙ্গল এলাকায়। জঙ্গলের মাঝে মাঝে কোথাও দুটো তিনটে গ্রাম পাশাপাশি, তার সংলগ্ন কিছু চাষের জমি। আর তারপর ক্রমশ ঘন জঙ্গল দিগন্ত জুড়ে রয়েছে-- শাল, সেগুন,মহুয়া,হরিতকি,অর্জুন গাছের সমারোহ সেখানে।

বনে বাঘভালুকের ভয় ছিল। সচরাচর তারা মানুষের ক্ষতি খুব কম করে। তবু বাঘভালুকের নাম শুনলেই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হতে চায় লোকের। একবার আমাদের এক গ্রামের বিয়েবাড়িতে যেতে হয়েছিল। এক মাস আগে থেকেই বার বার অনুনয় বিনয় করে গেছে, “মাষ্টামশাই, আপনারা কিন্তু নিশ্চয়ই বিয়েতে আসবেন। আমরা আপনাদের পথ চেয়ে থাকবো।”

গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ের বিয়ে। এতবার,এতভাবে বলে গেছে, তারপর না যাওয়াটা মোটেও ভালো দেখায় না। বিয়ের লগ্ন ছিল রাত এগারটায়। আমরা ভাবলাম রাত নটার মধ্যে বিয়েবাড়ি ঘুরে চলে আসবো। আমরা দশ বারোজন মিলে বিয়েবাড়ি রওনা হলাম। আমি, আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে--বড় জন ক্লাস ফোরে, আর ছোট জন ক্লাস ওয়ানে। এছাড়া ছিলেন একজন বনকর্মী-- নায়কবাবু। স্থানীয় কম্পাউন্ডার ভদ্রবাবুর

পরিবারের চারজন- - ওঁরা স্বামী, স্ত্রী আর তাঁদের দুই ছেলে। এ ছাড়াও স্থানীয় গ্রামের দু তিনজন লোক ছিলেন।

সন্ধের পরপর আমরা রওনা দিলাম বিয়েবাড়ির দিকে। মেঠো পথ। দু'ধারে ফসলের জমি, তার পরেই বনের সীমানা শুরু। আমাদের সঙ্গে আছে দু'তিনটে টর্চ, লাঠি, আর দুটো সাইকেল। সাইকেলে কখনো কখনো বাচ্চাদের সিটে বসিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। বাকি সবাই পায়ে হেঁটেই চলেছি। হালকা চাঁদের আলোয় পথ দেখা যাচ্ছিল। আকাশ জুড়ে উজ্জ্বল তারাদের মেলা বসে ছিল। মধ্যে মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছিল, জোনাকিরা টিম টিম আলো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা টুকটাক কথা বলতে বলতে চলছিলাম। ছোট বাচ্চারা সাইকেলে, আর বড় বাচ্চারা বড়দের মাঝখানে থেকে কিছুটা ভয়ে ভয়ে হাঁটছিল। আমাদের সবার চোখ মাঝেমধ্যে ঘুরেফিরে সামান্য দূরের জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছিল।

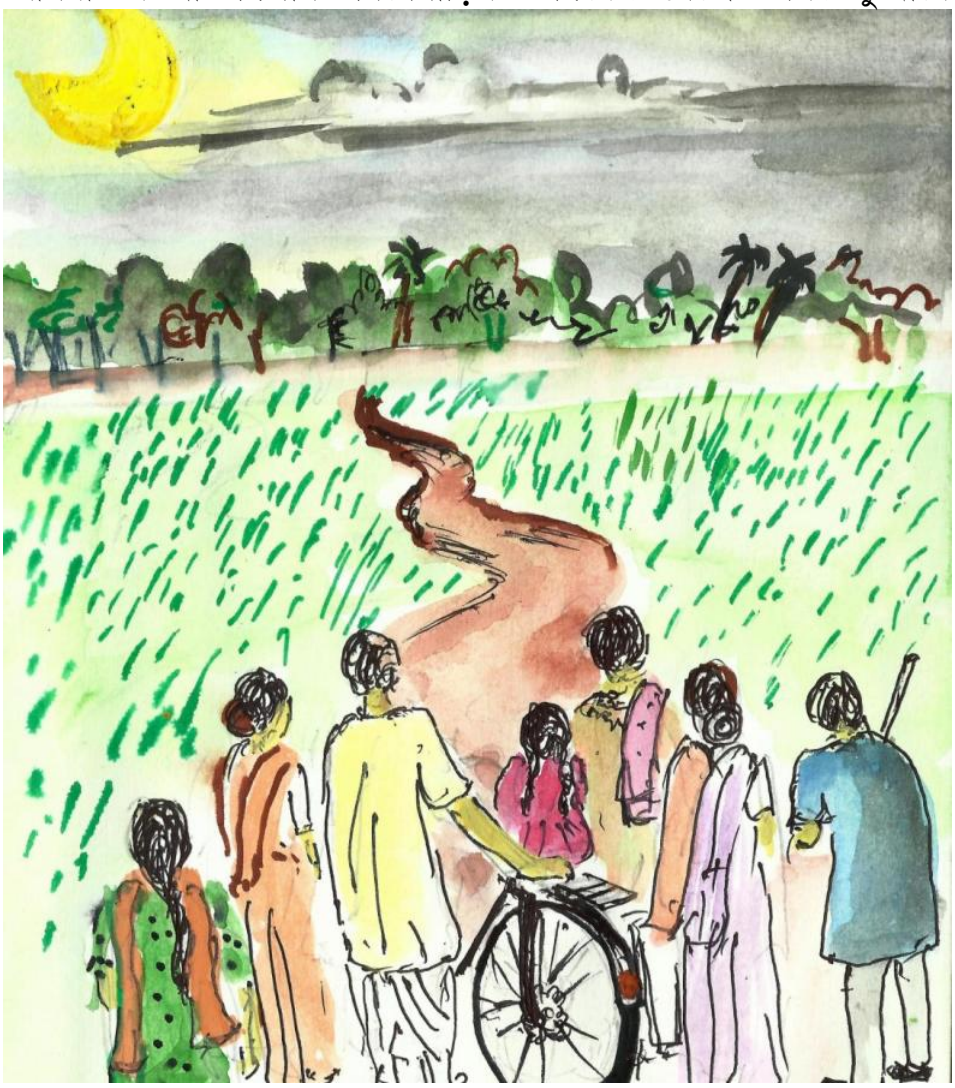

বড় মেয়ে বলল, "বাবা! এখন যদি জঙ্গল থেকে বাঘ,ভালুক বেরিয়ে আসে?"

শুনে বললাম, "ভয় নেই, আমরা অনেক লোক আছি, সঙ্গে টর্চ, লাঠি আছে— বাঘ,ভালুকের প্রাণেও তো ভয় থাকে! "

ছোট মেয়ে বলল, "বাবা! ওরা তো মানুষ খায়, তবে কেন ওরা মানুষকে ভয় পাবে?"

“একসঙ্গে অনেক মানুষ দেখলে ওরাও ভয় পায়, বাবা! ” আমি মেয়েদের অভয় দিতে চাইলাম।

আবছা আলোছায়া ভেদ করে প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে পোঁছালাম সেই গ্রামের বিয়ে বাড়িতে। পথে কোনও অসুবিধা হল না। না দেখলাম বাঘ,না দেখলাম ভালুক, এমনকি একটা শেয়াল পর্যন্ত চোখে পড়ল না !

বিয়েবাড়ির খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ির দিকে রওনা দিতে দিতে রাত দশটা বেজে গেল। আরও কিছু সময় থাকার জন্য বিয়েবাড়ির লোকদের বারংবার অনুরোধ আমরা রাখতে পারলাম না। কারণ আমাদের রাস্তা নিরাপদ নয়। রাত যত বাড়বে, বন্য জন্তু জানোয়ারদের চলাফেরা তত বাড়বে। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। বাঘভালুকের সামনাসামনি হয়ে গেলে বড় বিপদের ব্যাপার হয়ে যাবে।

ফিরতে ফিরতে নায়কবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনারা তো জানবেন, এই অঞ্চলে বাঘ,ভালুক নিশ্চয় আছে?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে তো বটেই! এই তো ক’দিন আগে গ্রামের লোকেরা একটা বাঘকে দেখেছে। আমায় খবর দিয়েছে। আমি অবশ্য একমাসের মধ্যে আশপাশের জঙ্গলের ভেতর কিছু দেখিনি। তবে ওদের গতি তো অনেক, আজ এখানে,কাল হয়তো দেখা গেলো দশ কিলোমিটার দূরে কোথাও চলে গেছে,”নায়কবাবু বললেন।

“এখানে কখনো বাঘে মানুষ খেয়েছে?”আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আমি এখানে এসেছি আজ তিন বছর হল। এখানকার মানুষকে কখনো বাঘে ধরেছে বলে তো শুনি নি। বাঘ সাধারণত গরু, ছাগল, মুরগী এসব ধরে খায়। তবে এটা জানি যে বাঘ একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পেলে নাকি মানুষের মাংস ছাড়া অন্য মাংস খেতে চায় না!”নায়কবাবু বলে যাচ্ছিলেন।

“ওরে বাবা! ” মাঝখান থেকে আমার বড় মেয়ে তার নায়ককাকুর কথাগুলি শুনে বলে উঠলো।

এমনি সময় আমাদের সঙ্গের গ্রামের শিকদারমশাই, যিনি সবার আগে আগে হাঁটছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সে সঙ্গে আমাদেরও হাঁটায় ব্রেক কষতে হল! কী হল, কী হল একটা ভাব সবার মনে। নায়কবাবু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার, শিকদারবাবু?”

শিকদার বাবু তৎক্ষণাৎ চাপা ভীত স্বরে আঙুল উঁচিয়ে বলে উঠলেন,“সার, ওই দেখুন! ”

আমরা সবাই তখন শিকদার বাবুর আঙুলের ইশারার দিকে তাকিয়ে বললাম, “আরে,ওটা বাঘ না?” আমার মুখ থেকে আচমকা কথাগুলি বেরিয়ে এলো।

নায়কবাবু চাপা স্বরে বলে উঠলেন, “হ্যাঁ, বাঘই তো ! ”

দেখি আমাদের থেকে মাত্র তিন,চার শ ফিট দূরে হবে দাঁড়িয়ে আছে এক বাঘ! বিরাট তার চেহারা—চার ফুট উঁচু তো হবেই! লম্বায় মনে হয় ছ'সাত ফুট হবে। গোঁফ উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই !

নায়কবাবু বলে উঠলেন,"বাবা,বেশ বড় বাঘ তো!"

ভয়ে আমরা একজায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়ালাম। ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। আমাদের মাঝখানে এসে কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে কারো মুখে কথা সরছিল না।

নায়কবাবু ধীরে ধীরে বললেন, "আপনারা চুপ চাপ থাকুন। বাঘ আপনিই চলে যাবে। এতজন লোক দেখে ও আমাদের ক্ষতি করতে সাহস পাবে না।"

কিন্তু বাঘ তো যায় না! যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি নির্বিবাদ সে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে। বাঘকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কারণ,আকাশের চাঁদ

তখন অনেকটা মাথার ওপরে উঠে এসেছিল। জঙ্গলের আড়াল ছাপিয়ে চাঁদ মাঝ- আকাশের কাছাকাছি থেকে আলো দিচ্ছিল। আর বাঘটাও দাঁড়িয়েছিল ফসলের জমির উঁচু আলের ওপরে সামনের দু পা বাড়িয়ে দিয়ে।

নায়কবাবু বললেন, "চলুন আমরা ধীরে ধীরে নিজেদের গ্রামের দিকে হাঁটতে থাকি,বাঘকে চুপচাপ নিজের মত থাকতে দিন-- আমাদের একসঙ্গে জটলা করেই চলতে হবে—কেউ যেন ভয়ে আলাদা ছোটাছুটি না করে। কাউকে একলা পেলে বাঘ নিশ্চয় তাকে আক্রমণ করবে।"

আমরা নিজেদের পথে এগিয়ে চললাম। বাঘ দেখলাম তার জায়গা থেকে এক পা'ও সরল না। হাঁটতে হাঁটতে আমরা বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছি, তখনও দেখি বাঘ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নায়কবাবু এবার সাহস করে বাঘের দিকে ফিরে তাকিয়ে চীৎকার করে,মারবার ভঙ্গি করে হাত ওপরে তুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘ,"ঘোঁ ঘোঁ ঘড় ঘড়..." শব্দ করে গজরাতে থাকলো। মাঝে মাঝেই বাঘের মুখের দু পাশের বড় বড় ভয়ঙ্কর দাঁতগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম।

দূর থেকে এক সময় দেখলাম বাঘ তখন হেলতে দুলতে আপন মনে নির্বিকারে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে। আমরা বড়রা বাঘ ভয় পেয়েছে এমনি কিছু মনে করেই বোধহয় বাঘের দিকে তাকিয়ে বাঘকে ভয় দেখাবো বলে ইচ্ছে করেই হোই হোই হোই হোই করে চিৎকার করে উঠলাম। দেখি বাঘ সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, এমনি সে ভাব দেখাল যেন ও বলতে চাইল, "তোমাদের আমি ভয় পাই থোড়াই ! "

আবারও আমরা হোই হোই করে উঠলাম বাঘের দিকে তাকিয়ে।

বাঘ কিন্তু ভয় পেল না-- "ঘাও ঘা ঘো...," করে গোঙাতে থাকল- - তাও এক পা পেছনে না গিয়ে নিজের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে!

শেষমেষ কারো কিছু ক্ষতি না হলেও ভয় কাটতে সে রাতে আমাদের সময় লেগেছিল।

ছবিঃ অনুপম

যদি বন্ধু হতে চাও

অচিন্ত্য সুরাল

যদি হতে চাও আমার বন্ধু
হতে পারো, তবে মাগনা হবে না, যেগুলো আমার প্রিয়
কিছু কিছু তার দিতে তো হবেই
রাজি থাকো যদি, বেশ তো তাহলে আঁজলা ভরে তা দিও
চকোলেট? উঁহু, তারচে' বরং
মুড়কির মোয়া, গুড়ের বাতাসা, নারকোল নাড়ু ক'টা
এনো তো কুলের মিষ্টি আচার
তালের বড়াও দিতে চাও যই ইও অন্তত ছ'টা
চপ কাটলেট দরকার নেই
ঘরে যদি থাকে এনো তো কয়েক দিস্তা খাস্তা লুচি
শিঙাড়া, জিলিপি তাছাড়া কচুরি
জানিয়ে রাখছি, সে'সবেও আছে দস্তুরমত রুচি।
আর তো কিছু মনে পড়ছে না
যাকগে' ওতেই- আরে আরে তোর চোখ কেন ছলোছল
কিছু নেই তোর? ঠিক আছে ঠিক আছে
চুপি চুপি তবে কোঁচড় ভরানো ভালোবাসা দিবি বল!

ছবিঃ অরিঘ্ন

গুল

অমিতাভ প্রামাণিক

আমরা যখন ছিলাম না, আর তোমরা যখন ছিলে –
দু'খান পাখিই পড়তো মারা, যখন একই ঢিলে –
আকাশ ছিলো সাগর- ছাঁচা জলের মতো নীল –
ঠিক দুপুরে পাছ পুকুরে মারতো ভূতে ঢিল –
বাতাস ছিলো হাস্নুহানার গন্ধে বেজায় ম' ম' –
লখীন্দরের বউকে দেখে কাঁপতো ভয়ে যমও –
গাছের নিচে ছায়ার আরাম, ডাকতো কোকিল, কুহু –
মা বলতেন, আঁক কষেছিস, তুমি বলতে, উঁহু –
রাত্রি বেলা বসতো আসর, তরজা, কবির লড়াই –
যতই খেতে আচার, তবু থাকতো বয়াম ভরাই –
নদীর জলে দুলতো খেয়া, গাইতো মাঝি গান –
শিবের গীতই শোনাচ্ছি যে, ভানতে আমি ধান!
আমরা যখন ছিলাম না, আর ছিলে শুধু তোমরাই –
বলছো যা যা, ভাবছো আমি নিচ্ছি মেনে? ছাই!

ছবিঃ সৌভিক

পুরোনো সেই দিনের কথা

আশুতোষ ভট্টাচার্য

আজ একটু অন্যরকম পুরোনো সেই দিনের কথা
ভাবছ বুঝি এটা আবার কোন ধরণের রসিকতা
একশো বছর পিছিয়ে চলো, গড়ের মাঠে ছুটছে ঘোড়া
বৃটিশ করে রাজ্যশাসণ লালপমুখো সব সাহেব গোরা
সাহেবরা সব খেলছে দেখে কয় বাঙালি উঠলো মেতে
কোথা থেকে বল জোটালো মাতলো খেলায় আনন্দেতে
বেয়ার ফুটেড নেটিভগুলো শিল্ড জিতেছে উঠছে স্লোগান
সেলাম তোমায় বীর বাঙালি সেলাম তোমায় মোহনবাগান
‘লগন’ তো সেই সেলুলয়েড গল্প- গানে মনের মত
খালি পায়ে দামাল ছেলে ঢাকছে মায়ের বুকের ক্ষত

বিজ্ঞানী

প্রকল্প ভট্টাচার্য

সন্তোষ দফাদার, বিজ্ঞানী পেল্লায়।
বাড়ী তার থরহরি মেডেলের জেল্লায়।
একদিন হাবু তাকে পাকড়াও করলে বিকেলে।
“বল দেখি পন্ডিত, কতজোর ছুটলে
আকাশটা ছোঁয়া যায় রোদ্দুর উঠলে?”
এ হেন প্রশ্ন শুনে বিজ্ঞানী বিষম সে কি খেলে!
আঁকেতে দিস্তা ভরে, মেলেনাকো উত্তর,
বই খোঁজাখুঁজি সার, শেষে বলে ‘ধুত্তোর,
আকাশ যায় না ছোঁয়া,
নিজেই দেখি না করে চেষ্টা!’
পরদিন সোনাবেলা, সক্কলে হকচক,
পরণেতে ট্র্যাকস্যুট, পায়ে জুতো চকচক,
বিজ্ঞানী ছোটে কেন? পাগল হল নাকি সে শেষটা!!

বাঘ আসত আমার বাড়ি

রতনতনু ঘাটী

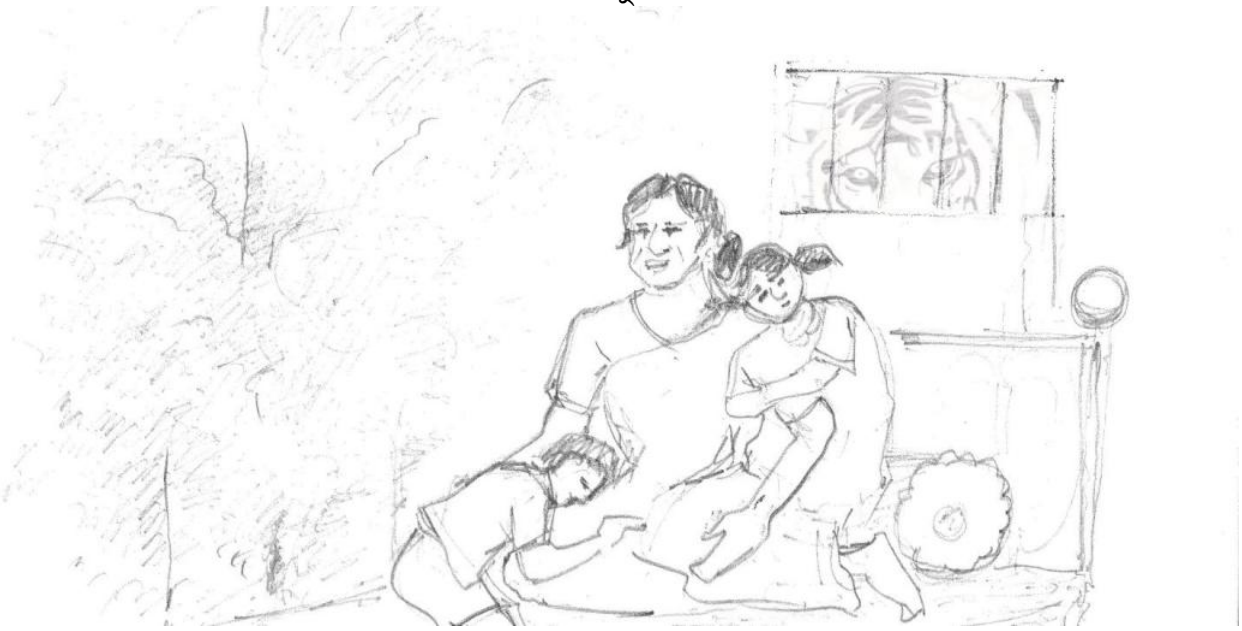

তখন দূরে বনবাদাড়ে চোখ জ্বালিয়ে
আমার বাড়ি বাঘ আসত সন্ধেবেলা।
খটাশ দুটো জোনাকপোকা ধরত বসে,
ঠামি বলত, “ওসব হল নকল খেলা।”

“তাই না হলে বাঘটা এসে হালুম করে—
আসল নয়? ও হো বাঘটা মিথ্যে তবে!
ঘাড় মটকে পালায় নি তো দূরের বনে?”
ঠামি বলত, “একটু পরে সত্যি হবে।”

“আঁচল খোলো, লুকোই আগে আমরা দুটি!”
ভীষণ ভয়ে উলটিপুটি বোন ও আমি,
বাঘটা এসে দাঁড়াক দেখি সাহস কত?
সত্যি বাঘ আনতে হবে আজকে ঠামি!”

“বাঘ আসবে। ব্যস্ত কেন? একটু দাঁড়া!
তারও আগে বন চাই যে,নদীও চাই।
এই এখানে কান পাতলে শুনতে পাবি!”
বলেই ঠামি বুকের মাঝে দেখাল তাই।

একটা নদী বইছে বটে! গন্ধটা কী—
দু’ভাইবোনে নদীর কুলু শুনছি দূরে।
ও গন্ধটা বনেরই তো ঠামির বুকে।
হঠাৎ দেখি বাঘ বেরোল অবাকপুরে!

তারপর তো বন কাঁপানো হালুম ডাকে
বোনটা ভয়ে চেঁচিয়েছিল, “ওঠ না দাদা!”
তখন নাকি ঘর ভরেছে বাঘ- গন্ধে,
আমি সেসব পাইনি কিছু, ঘুমিয়ে কাদা।

ছবিঃ অর্ণব

শীত

আবু হোসেন

শীত মানে রোদে ভরা হিমেল সকাল
শীত মানে ব্যাটে বলে মহা গোলমাল
শীত মানে খেজুরের গাছভরা রস
শীত মানে লেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে বস
শীত মানে ঠাণ্ডায় মহাসুখে রোজ
আগুনের ধারে বসে পিঠেপুলি ভোজ
শীত মানে দিন গেলে হাড়কাঁপা রাতে
লেপমুড়ি দিয়ে ঘুম ঠাকুমার সাথে।

ছবিঃ অন্তরা

রজব আলি

সৌম্যকান্তি জানা

আজবগড়ের রজব আলি
খাচ্ছিল তাঁত বুনে
কিন্তু হঠাৎ সংসারে টান
মূল্যবৃদ্ধি গুণে
তারপর সেই রজব আলির
কী যে হল ব্যামো
লুঙ্গি ছেড়ে ধরল সে প্যান্ট
বাড়লো খুবই ঘ্যাম- ও
যাকেই দেখে ইংরিজিতে
বলছে হ্যালো হাই

চচ্চড়ি ঘ্যাঁট আর ছোঁবেনা
চিল্লি চিকেন চাই
বউকে ডেকে বলল ডিয়ার
এসো টুইস্ট নাচি
একসোকিউজ কইছে দিলে

ধাক্কা কিংবা হাঁচি
ভাবল সবাই রজব আলি
হয়েই গেছে ক্ষ্যাপা
চিন্তা সবার, কে পোহাবে
এমন আজব হ্যাপা
বদ্যি এসে জিভ দেখল,
দেখল লিভার নাড়ি
কিন্তু হঠাৎ পেটটা টিপে
ঠেকল কিছু ভারী
বদ্যি বলে বিপদ, করো
এক্স রে তাড়াতাড়ি
রিপোর্ট এল পেটের ভেতর
আস্ত ডিকশনারি।

ছবিঃ অরিঘ্ন

দিদার বাংলা

তাপস মৌলিক

দিদাটা একটা যা তা!
গর্তকে বলে ‘গাতা’
ছেলেমেয়েদের ‘পোলাপান’ বলে
বুঝিনা ছাতার মাথা।
গল্পকে বলে ‘পরস্তাব’
আর বকবক করা ‘প্যাচাল’
রাগলে মামাকে ‘ভাদাইম্মা’ বলে
বোঝো বাংলার কী হাল!

কানে কম শোনা
দিদাকে খ্যাপায় দাদু ‘হাটকালা’ বলে
দিদা বলে দাদু ‘টোলাইতে গেছে’
মর্নিং ওয়াকে গেলে

যতই দেখাই অভিধান খুলে
এসব নেই সেখানে
দিদা খালি বলে ‘আমাগো দ্যাশেতে
হগলে এইতানই জানে।’

আমার দেশ আর দিদার ‘দ্যাশ’কি
আলাদা নাকি রে ভাই!
দু’জনেই থাকি এই বাংলায়
বাংলাই বলি তাই।

ডিগরিডাঙার ফকিরবাবা

তরুণকুমার সরখেল

ডিগরিডাঙার ফকিরবাবার
ফন্দিফিকির জমকালো
দেখেই আমার পিলেশুদ্ধু
ভীষণরকম চমকালো
গাছের মাথায় পা ঝুলিয়ে
ডাল ধরেছে খামচেটে
বলছে সবাই সে তো কেবল
খাচ্ছে নিজের ঘাম চেটে
আস্ত কুমীর কামড়ে দাঁতে
আয়েস করে খাচ্ছে খাবি
আস্তানা তার বিশ্ব জুড়ে
সাংহাই কি আবুধাবি
ভেলকিবাজি দেখিয়ে বাবা
রোজই যাচ্ছে দিল্লিবর্মা
বলতে হবে ডিগরিডাঙার
ফকিরবাবা করিৎকর্মা

ছবিঃ সোমা

ধাঁধা

প্রথম ধাঁধা

ধুধু গরম বালির চর
তার ওপরে আজব ঘর
বারমহলে সবুজ দেয়াল
তার ভেতরে সফেদ দেয়াল
ভেতরে লাল বাড়িখান
হাজার ভায়ের অবস্থান।

দ্বিতীয় ধাঁধা

বইমেলায় এক ছোকরা একবার আমায় আচ্ছা বোকা বানিয়েছিলো। বলে, "কাকু, দুটো বেন টেন এর কমিকস কিনে দেবে কথা দাও যদি তাহলে আমি একটা ম্যাজিক দেখাবো।" বললাম, "কী ম্যাজিক দেখাবি?" সে বলে, "তাহলে আমি এই মেলার মাঠে জলের নিচে দশ মিনিট থেকে দেখিয়ে দেবো।" বললাম, ,"ইমপসিবল। এখানে জল পাবি কোথা? আর পেলেও তার নিচে দশ মিনিট? ক্ষ্যাপা নাকি?" সে মিচকি হেসে বলল, "চ্যালেঞ্জ?"
বইদুখানা সেবার আমায় কিনে দিতেই হয়েছিলো? ব্যাপারটা সে কীভাবে করলো বলতো?

তৃতীয় ধাঁধাঃ

দুই বন্ধু রাতে বসে আছে। একজন টিভি দেখছে আর অন্যজন গল্পের বই পড়ছে। হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। টিভিওয়ালা বন্ধু নাচার হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্যজন কিন্তু তখনো বই পড়েই যাচ্ছে। কীভাবে হয়? ব্যাপারটা তিনভাবে হতে পারে। ১। অন্য বন্ধুটা ই বুক রিডার বা স্মার্টফোনে ইবুক পড়ছিল। ২। মোমবাতি বা এমার্জেন্সি লাইট বা ইনভার্টার জ্বেলে নিয়েছিল। তিন নম্বর কায়দাটা কী?

চতুর্থ ধাঁধা

ভোরবেলা ঘরে ঢুকে এসে দেখি মুরলী মরে পড়ে আছে। হাতে পিস্তল। পাশে একটা টেপরেকর্ডার। সেটার প্লে সুইচ টিপতেই শোনা গেল লোকটার গলার স্বর- "বেঁচে থাকবার আর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। বিদায়।" তারপরেই ধড়াম করে গুলির আওয়াজ। শুনেই পুলিশে ফোন করলাম, "একটা খুন হয়েছে। আপনারা আসুন।" কীভাবে বুঝলাম?

শব্দখেলা

কিছু কিছু জায়গায় শব্দ খুঁজে বের করে তার প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে বাক্যগুলো ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ঠিকঠাক করে দাও দেখিঃ

১। সুন্দ থাকব নে পর্যটকের ভিড়

২। ঈশ্বরসাধনা হয় ক,খ,গ,ঘ ধামে

৩। তাহারা আমাকে কতই না পত্নীধ জহরয়ে প্রশ্ন করিল।

৪। আকাশে তারার ১,২,৩,৪ কত তা কে বলিতে পারে?

৫। জপাহাড়ণের ইচ্ছাই সর্বপ্রধান।

জানো কি?

বুধ থেকে নেপচুন এই আটটা প্রধান গ্রহ বাদেও সূর্যের আরো পাঁচখানা বামন গ্রহ এখন অবধি খুঁজে পাওয়া গেছে। (সৌরজগতের যেসব বস্তু নিজের মাধ্যাকর্ষণে নিজের চেহারাটা গোল করে নেবার মত ভারি অথচ ঘূর্ণনপথের আর সব বস্তুকে ঝেঁটিয়ে এনে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারবার মত বড়সড় নয় তাদের বিজ্ঞানিরা বামন বামন গ্রহ বলে ডাকেন।)

এদের নাম প্লুটো, সেরেস, মেকামেক, হমিয়া আর এরিস। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হল এরিস। সবচেয়ে কাছে আছে সেরেস (মঙ্গল ছাড়িয়ে গ্রহাণুপুঞ্জ বলয়ের মধ্যে) হমিয়াতে প্রচুর বরফের খোঁজ মিলেছে। হমিয়ার আর একটা মজা হল এর চ্যাপ্টা চেহারা। ১৯০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি বিষুব ব্যাসের এই বামন গ্রহ ৩ ঘন্টা ৫৪ মিনিটে নিজেকে ঘিরে একটা পাক খেয়ে ফেলে। এত জোরে ঘোরবার জন্য তার চেহারা হটয়ে গেছে বেশ চ্যাপ্টা, অনেকটা মশলা বাটার নোড়ার মত। দুটো উপগ্রহও আছে এর।

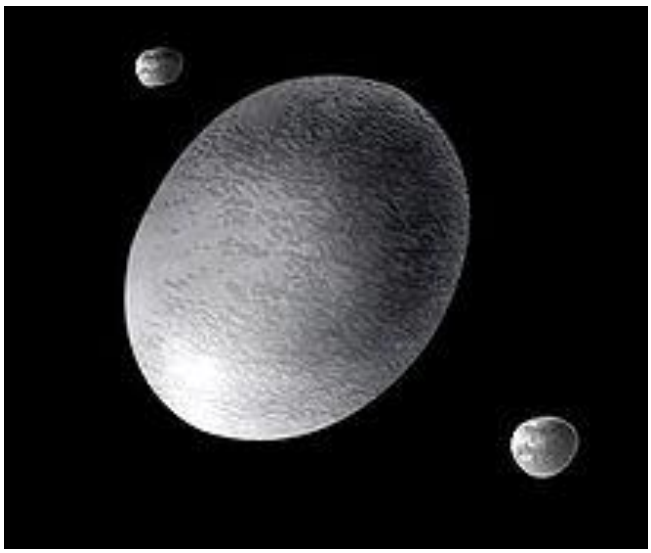

বিজ্ঞানীদের অনুমান, সৌরজগতের গ্রহদের সীমানা ছাড়িয়ে কুইপার বেল্ট নামের যে এলাকা আছে সেখানে খুঁজলে আরো অন্তত দুশোখানা বামন গ্রহের খোঁজ মিলবে। আর কুইপার বেল্টের ওপারে যাবতীয় এলাকা খুঁজলে মিলতে পারে আরো দশ হাজার বামন গ্রহ।

কুইজ

১। মস্তিষ্ক আমাদের দেহের মোট উৎপাদিত শক্তির শতকরা কতভাগ খরচ করে?

২। ডুরা মাটের কী?

৩। মস্তিষ্কের কোন অংশটা ইন্দ্রিয় দিয়ে পাওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করে?

৪। সেরিবেলামফোরামেন ম্যাগনাম ও সেরিব্রাম ,ব্রেইন স্টেম ,—এদের মধ্যে কোনটা মস্তিষ্কের অংশ নয়?

৫। মস্তিষ্কের কোন অংশ আমাদের শরীরের ডানপাশটাকে চালায়?

৬। মস্তিষ্কের যে অংশটা ভাষা বোঝবার কাজে সাহায্য করে তার নাম কী?

৭। দক্ষিণ প্যারিয়েটাল লোবে চোট পেলে কোন প্রধান বৌদ্ধিক কাজ বিঘ্নিত হয় না?

৮। হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের কোন এলাকা?

৯। মস্তিষ্কের কোন স্নায়ু আমাদের খাবার চিবোতে সাহায্য করে?

১০। কার মস্তিষ্ক সবচেয়ে ভারী? মানুষ, হাতি না তিমি?

মজার ইন্টারনেট

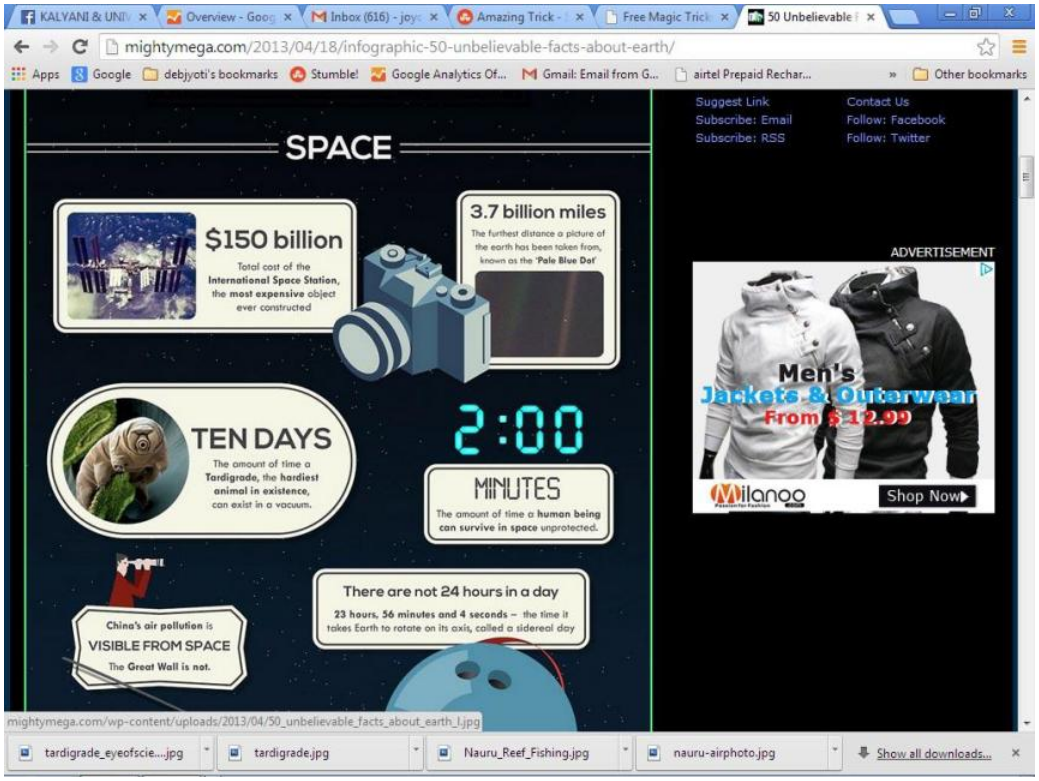

প্রতিদিন মহাকাশ থেকে কত টন উল্কা পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে? দশদিন অবধি পরিপুর্ণ বায়ুশূন্যতায় বেঁচে থাকতে পারে কোন প্রাণী? একটা টেবিল টেনিস বল না পৃথিবী, কে বেশি মসৃণ? এমন পঞ্চাশখানা আজব তথ্যের বিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি জবাব জানতে চাইলে এই সাইটটা দেখোঃ
http://mightymega.com/2013/04/18/infographic-50-unbelievable-facts-about-earth/

সহজে দারুণ দারুণ ম্যাজিক শিখবে নাকি? এইখানে গিয়ে দেখতে পারোঃ
http://www.goodtricks.net/

কীসের ফটোঃ

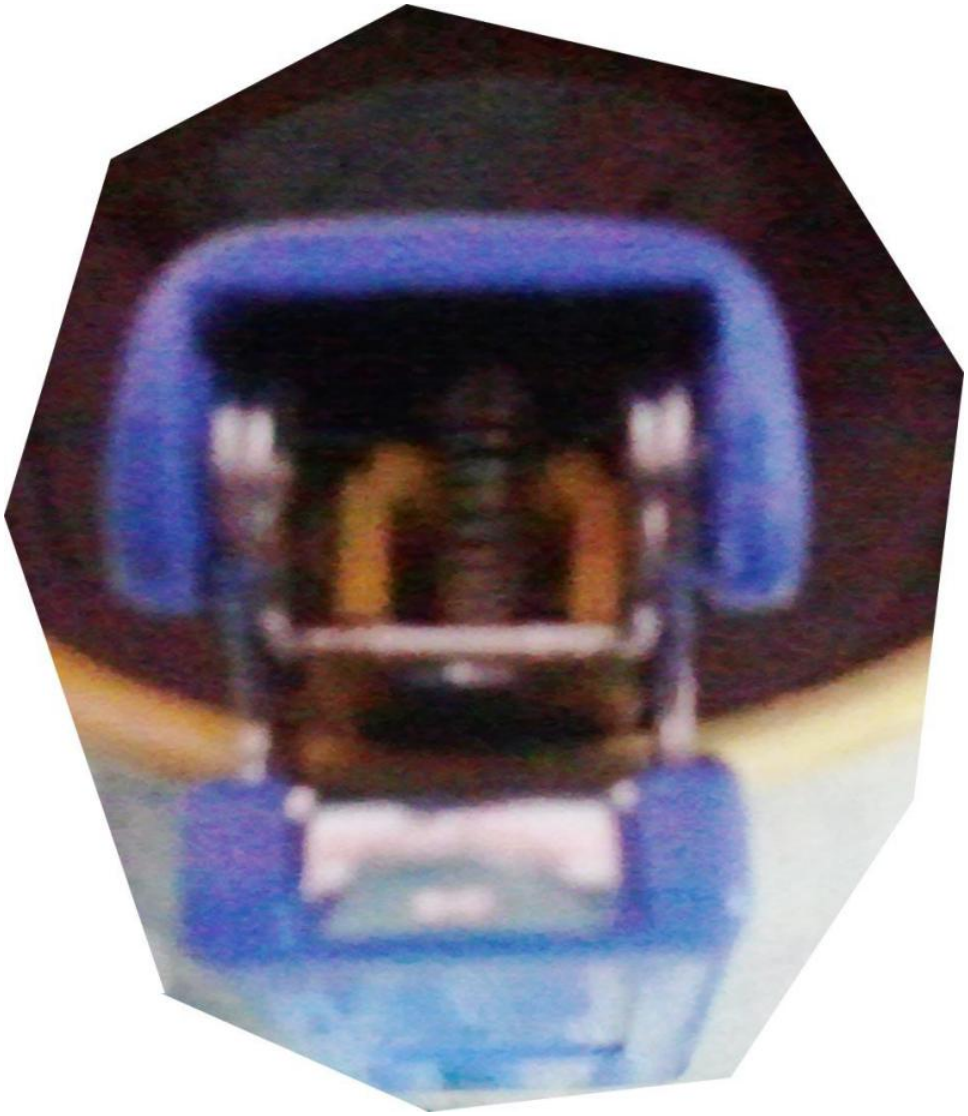

ড্রুডল

এটা কীসের ছবি হতে পারে?

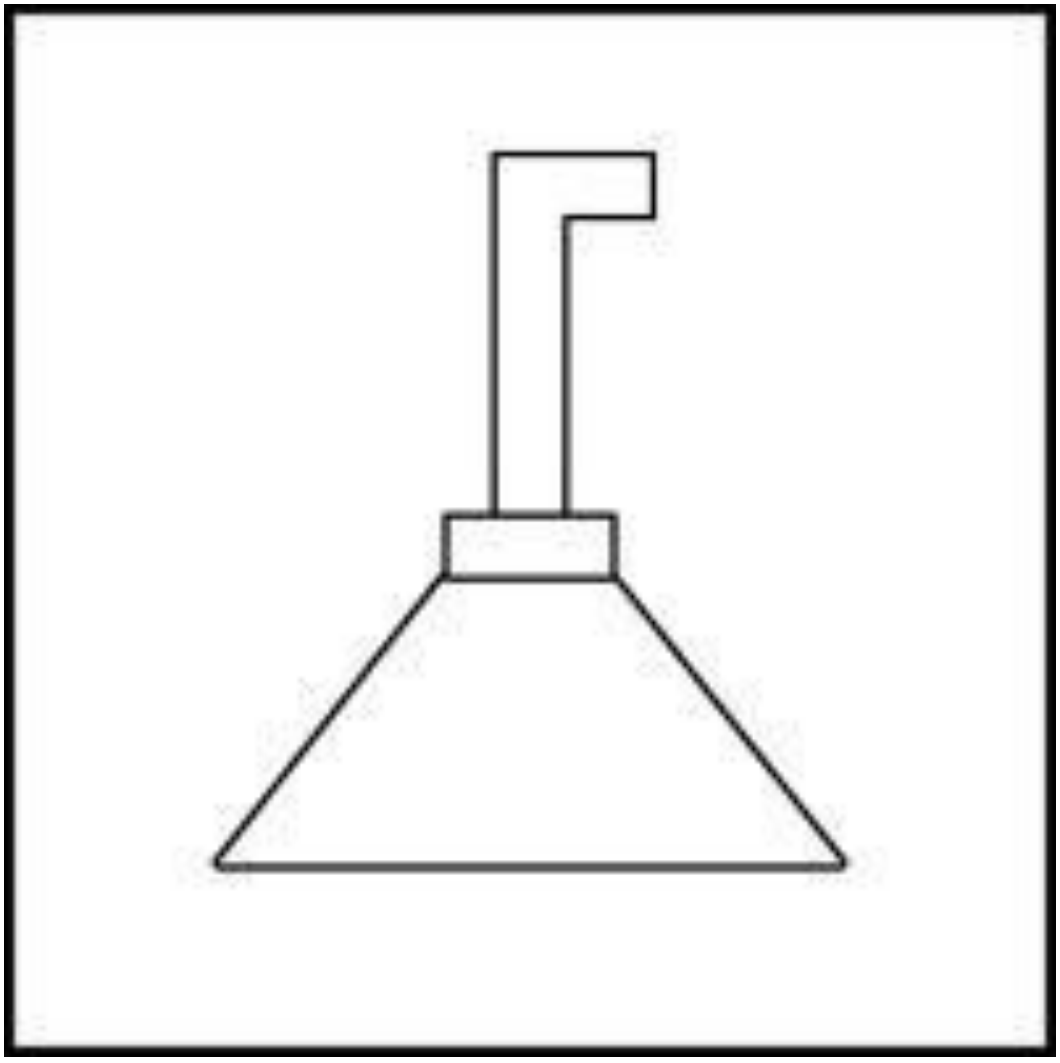

অবিশ্বাস্য

আশ্চর্য উল্কি

আগের সংখ্যার উত্তর

ধাঁধার উত্তর

প্রথম ধাঁধা

হরেন গুলি ছুঁড়বে মাটিতে। যদি সে অন্য কারো বুকের দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ে তাহলে তাতে যোগেন বা সুরেনের মরবার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে। যোগেন যদি মরে তাহলে সুরেন পরের গুলি চালাবে।হরেন তবে মরবেই। সুরেনকে মারে তাহলে পরের গুলি চালাবে যোগেন তাতেও তার মরার সুযোগ তিনের মধ্যে দুই। আকাশে গুলি ছুঁড়লেও যদি কোনক্রমে সেটা নেমে এসে অন্যদের কাউকে মারে তাহলেও সেই একই দশা হবে তার। দিকে মাটিতে গুলি মারলে নিশ্চিতভাবে যোগেন সুরেন দুজনই বেঁচে যাবে। তখন যোগেন সুযোগ পাবে। যেহেতু সুরেনের টিপ কখনো ভুল হয় না আর তার অরেই সুরেনের পালা, যোগেন তাই সুরেনকে মারতে চাইবে।যদি মেরে ফেলতে পারে ভালো কারণ সেক্ষেত্রে আর কেউ গুলি ছোঁড়বার জন্য বাকি থাকবে না। যদি না পারে তাহলেও সুরেন যখন দেখবে হরেন মাটিতে গুলি করেছে আর যোগেন তাকে তাক করে গুলি করেছে তখন সে নির্ঘাৎ প্রতিশোধ নেবার জন্য যোগেনকেই মারবে। কাজেই হরেন মাটিতে গুলি ছুঁড়লে তার বেঁচে যাবার সুযোগটা সবচেয়ে বেশি থাকবে।

দ্বিতীয় ধাঁধা

লোকটা প্লেন চালানোয় ওস্তাদ ছিল, কারণ সে- ই ছিল সেই প্লেনের পাইলট। যাত্রীদের খানিক বাদে লাফিয়ে পড়ার কারণটা আশা করি বুঝতেই পারছো।

তৃতীয় ধাঁধা

অদ্ভূত।

কুইজের উত্তরঃ

১। ইন্দোনেশিয়া। ১২৯টা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে এই মুহূর্তে।

২। ২৮০ কোটি। এশিয়ায় থাকে ৪০০ কোটি লোক।

৩। মারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

৪।ভেনিজুয়েলা

৫। ভেনিজুয়েলা

৬। চিলির আটাকামা মরুভূমিতে

৭। পেরুর লা রিনকোনাডা। ৫১০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত।

৮। মোনাকো। জুয়োর আড্ডা (ক্যাসিনো)র জন্য বিশ্ববিখ্যাত। লোক আছে ৩২০০০।

৯। লিবিয়ার আজিজিয়া। ১৯২২ সালে এখানে ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উঠেছিলো।

১০। ত্রিস্তান ডি কুনহা।

ড্রুডল

কুয়োর জলে বৃষ্টির ফোঁটা

"অ্যাডমিরাল সেন, কোন সন্ধান পেলেন প্রফেসর বোসের?"

পর্দা থেকে অ্যাডমিরাল সেন ভুরু কুঁচকে একবার তাকালেন লালপিওতের দিকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "আপনার সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাডমিরাল। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব নিজে আপনার সঙ্গে কথা বলে ধন্যবাদ জানাবেন আজ বিকেলে। কিন্তু, এই ঘটনার ব্যাপারে আর আপনার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। বাকি ব্যাপারটার দায়িত্ব নিয়েছে পার্থিব কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষজ্ঞ দল। এখন বিদায়।"

"লোকটা আমাদের নাগাল থেকে বেরই হয়ে গেল শেষে। আধুনিকতম যন্ত্র ব্যবহার করেও গত চব্বিশ ঘন্টায় কোন সন্ধান মেলেনি যখন, তখন ধরে নেয়া যায় যানটা কোন কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি বরং এইবারে একটু বিশ্রাম নাও।" পেছন থেকে জেমস আরিয়ানার গলা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন লালপিওতে। বৃদ্ধের মুখে উদ্বেগের স্পর্শ ছিল। পাশে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে ফের বললেন, "গত এক দিনের বেশি সময় তুমি এই আসন ছেড়ে একবারও ওঠ নি। এবারে বরং- "

তাঁর কথাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে লালপিওতে বললেন, "না জেমস। আমার বিশ্রামের সময় নেই এখন। ধ্বংস ও হয় নি। পার্থিব বায়ুমন্ডলে কোন যান ধ্বংস হলে বুদ্ধর কোন না কোন সেনসরে সে শক্তিবিচ্ছুরণের খবর থাকত। তেমন কোন খবর আমার কাছে আসেনি। কাজেই—"

বলতে বলতেই তাঁর সংযোগযন্ত্রটি ফের সচল হয়ে উঠছিল। পর্দায় ফুটে ওঠা সংকেতসংখ্যাগুলোর দিকে একনজর দেখে লালপিওতে চাপা গলায় বললেন, " ঝুং জিয়ানের সংকেত।"

জেমস আরিয়ানা কৌতুহলি চোখে মনিটরের দিকে তাকিয়েছিলেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন, "ঝুং জিয়ান! 'বুদ্ধ' গণনাকেন্দ্রের—"

"হ্যাঁ জেমস। ঠিক ধরেছেন। গণনাকেন্দ্রের প্রধান কমুনিকেশন অফিসার। একে কিনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমায়," বলতে বলতেই দ্রুত কয়েকটি বোতামে হাত ছুঁইয়ে যাচ্ছিলেন লালপিওতে। সেটা শেষ হতেই পর্দার বুকে দপদপ করতে থাকা লাল চিহ্নটা একমুহূর্তের জন্য সবুজ হয়ে উঠেই নিভে গেল একেবারে। সেই মুহূর্তের খন্ডাংশে বুদ্ধ থেকে ভেসে আসা ঘনীভূত বিপুল তথ্যের চোরা স্রোত এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁর গণকযন্ত্রে।

পর্দার দিকে চোখ রেখেই জেমস আরিয়ানা বিস্মিত গলায় বললেন, "সাতশো টেরাবাইট! সে তো প্রচুর তথ্য। কী আছে ওতে?"

"খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজছি জেমস। ধ্বংস যখন হয়নি তখন কোথাও না কোথাও অবতরণ নিশ্চয় করেছে এরা। নকল লাইফবোটের ছবিটাকে পাঠিয়েছিলো পশ্চিম গোলার্ধের দিকে। কাজেই ধরে নেয়া যায় এরা পূর্ব গোলার্ধেই কোথাও নেমেছে এসে। সেদিককার নির্জন এলাকাগুলোতে গত কয়েকঘন্টায় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের যত শক্তিবিচ্ছুরণ ঘটেছে তার সমস্ত তথ্য একত্র করে আনিয়ে নিলাম এখানে। বাকি কাজটা গ্রোভারের বিশ্লেষক দলের।"

সংযোগযন্ত্রে সংকেত আসছিল ফের। সৈয়দ আব্রাহামের মুখ ভাসছে সেখানে। সেইদিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা হাসি ফুটে উঠল লালপিওতের মুখে। ছুরির মত ধারালো গলায় বললেন, "স্বাগত বিজয়ী বীর। নিরীহ মানুষের গণহত্যা আর বুদ্ধিমান শত্রুর মোকাবিলা করা যে এক ব্যাপার নয় সে শিক্ষাটুকু আশা করি আপনার হয়েছে এইবার।"

সৈয়দ আব্রাহামের চোখদুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। তারপর ধীর গলায় বললেন, "আর একটা সুযোগ আমায় দিন অ্যাডমিরাল। আমি এর-- "

"বদলা নেবে, তাই তো? সে সুযোগও তুমি পাবে। তবে এবারে আমি নিজে তোমার সঙ্গে থাকব। এখন তৈরি হও। আমরা পৃথিবীতে যাচ্ছি।"

সৈয়দ আব্রাহামের চোখদুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল, "তার মানে সরাসরি আক্রমণ! চমৎকার। সে উপদেশ আপনাকে আগেই একবার দিয়েছিলাম অ্যাডমিরাল। আমি সমস্ত বাহিনীকে-- "

"তুমি একটি মূর্খ সৈয়দ আব্রাহাম। সরাসরি আক্রমণ! হাঃ। পৃথিবীর একটা ছোট প্রদেশের অস্ত্রভান্ডারেও আমাদের গোটা উপনিবেশের চেয়ে বেশি অস্ত্র জমা থাকে সে তুমি জানো না?"

"জানি অ্যাডমিরাল। সেই সঙ্গে এ-ও জানি যে, এরা আসলে ভীরু আর অপদার্থ, আরামপ্রিয় জানোয়ারের দল। একটা জোরদার আক্রমণ করতে পারলেই ভয় পেয়ে যাবে। আমার পরিকল্পনা হল, একসঙ্গে পৃথিবীর চারটে প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে হামলা করা। আমাদের শক্তি কম হতে পারে অ্যাডমিরাল, কিন্তু—"

"থামো তুমি," তীক্ষ্ণ কন্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন লালপিওতে, "অর্থহীন কথায় সময় নষ্ট কোরো না। এলিট কমব্যাট দলের থেকে সেরা সাতজন যোদ্ধাকে বেছে নাও। পাঁচজন পুরুষ, দুজন মহিলা। একটা ছোট হানাদার যানের অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিয়ে চেহারায় কিছু পরিবর্তন করে সেটিকে 'জি' শ্রেণীর আন্তর্গ্রহ প্রমোদতরণীর চেহারা দেবে। সেটির নাম হবে 'প্র ত মিসিয়ারি। যানের প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র যথাসময়ে তোমার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। ছ' ঘন্টা সময় পাবে। পার্থিব সময় ভোর চারটেয় যাত্রার জন্য তৈরি থাকবে। সাধারণ নাগরিক পোশাকে। বাকি ব্রিফিং যাত্রাপথে দেয়া হবে তোমাদের।"

সৈয়দ আব্রাহামের মুখে বিভ্রান্তি আর রাগের বিচিত্র একটা মিশ্রণ খেলা করে যাচ্ছিল। বহু কষ্টে নিজের আবেগকে দমন করে তিনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর সংযোগ কেটে দিয়ে অন্য একটি পর্দার দিকে মুখ ঘুরিয়ে লালপিওতে উত্তেজিত গলায় বললেন, "বলো গ্রোভার। কিছু পেলে?"

গ্রোভারের মুখে কন উত্তেজনার চিহ্ন ছিল না। শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "হ্যাঁ অ্যাডমিরাল। আপনার হিসেবে ভুল হয়নি। তথ্য বিশ্লেষণ করে অরুণাচলের জঙ্গলের একটা এলাকা থেকে কিছু ক্ষীণ ইলেকট্রনিক সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। আমার বিশ্লেষণ বলছে, ওগুলো কম শক্তির কিছু লেজার বিচ্ছুরণ। অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। ত্রুটির পরিমাণ কুড়ি বর্গমিটার।"

"লেজার বন্দুক?"

"সম্ভবত তাই অ্যাডমিরাল। আরিয়ানা অ্যালগরিদমের বিশ্লেষণ বলছে ওগুলো মানুষের তৈরি কৃত্রিম শক্তিবিচ্ছুরণ হবার সম্ভাবনা শতকরা পঁচানব্বই।"

লালপিওতে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জেমস আরিয়ানার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ জেমস। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে তোমার আবিষ্কৃত যে অ্যালগরিদম দিয়ে মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা ইলেকট্রনিক শক্তিবিচ্ছুরণের চরিত্র নির্ণয়ের পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল, আজ সেই তুচ্ছ আবিষ্কারটাই সম্ভবত আমাদের বিপ্লবের পথের সবচেয়ে বড় বাধাটাকে সরিয়ে দিতে চলেছে। আমি চলি—"

“হ্যাঁ। এইবার একটু বিশ্রাম নাও। সেটা তোমার এখন প্রয়োজন।”

মৃদু হেসে লালপিওতে বললেন, “না জেমস। বিশ্রামের সময় এখন নয়। এখন শিকারে যাবার সময়। তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আমার সাফল্য কামনা করো।”

*****

“নাম?”

“সিমোন ভার্গিস মিথরান।”

অভিবাসন দফতরের কেরানিটি পরিচয়পত্রের ছবির সঙ্গে সামনে দাঁড়ানো অভিজাত চেহারার উপজাতীয় মহিলাটির মুখ মিলিয়ে নিলেন। সামনের গণকযন্ত্রে পর্যটকটির যাবতীয় তথ্য ভেসে উঠছে। পরিচয়পত্রের তথ্যগুলোর সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে নিতে নিতেই প্রশ্ন করছিলেন তিনি,

" পৃথিবীতে আসবার উদ্দেশ্য?"

"এশিয়া মহাদেশের অরুণাচল এলাকায় পূর্বপুরুষের জন্মভিটা দেখেতে এসেছি।"

"সঙ্গে লোক আছেন আটজন। এত মানুষ নিয়ে এলেন কেন?"

মহিলাটি অলস ভঙ্গীতে হাতের আঙুল মটকালেন একবার। মুখে বিরক্তির চিহ্ন। তারপর বললেন, "সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচারক ও দেহরক্ষী নিয়েই আমি পথ চলি অফিসার। সেটাই আমার সমাজের দস্তুর। তাছাড়া এই যানটি চালাবার জন্য একজন অভিজ্ঞ পাইলট ও একজন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞও রয়েছেন। এই প্রমোদতরণীর সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সবারই মঙ্গল কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা বৈধ কাগজপত্র রয়েছে।"

অফিসার সম্বোধন শুনে কেরানিটি খুশি হয়েছেন দেখা গেল। টুরিস্ট মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজকাল মঙ্গলে বোধ হয় আপনার মত অনেক অভিজাত মানুষ পাকাপাকি বাস করতে আরম্ভ করেছেন , তাই না ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। জায়গাটা অনেক বদলে গেছে। বিয়ে হয়ে প্রথম যখন গিয়ে পৌঁছালাম, সেসময় তো কৃত্রিম পার্থিব অভিকর্ষের বন্দোবস্তও ছিল না। একেবারে আদিম জায়গা ছিল। গত চল্লিশ বছরে কত যে বদল হল! আমার স্বামীর মত কিছু উদ্যোগি মানুষের ক্রমাগত চেষ্টায় সেটা সম্ভব হয়েছে। ছুটি কাটাতে চলে আসুন না একবার মঙ্গলে। আমাদের অতিথি হবেন। অসাধারণ সুন্দর সব প্রমোদক্ষেত্র তৈরি করছে আজকাল সেখানে আমাদের 'মিথরান এন্টারটেইনমেন্ট।' ভালো লাগবে দেখবেন। এই যে আমার কার্ড রেখে দিন একটা।"

কেরানিটির কাগজপত্র পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাসিমুখে একটি ছোট্ট নমস্কার করে তিনি বললেন, "আপনার যাত্রা আনন্দময় হোক ম্যাডাম। আপনার যানটিকে অভিবাসন স্টেশন ছেড়ে আবহমন্ডলে ঢোকবার ছাড়পত্র দেয়া হল। তিন নম্বর এয়ারলক- এ আপনার যান 'প্রমোদ তরণী মিসিয়ারি' অপেক্ষা করছে। শুভ সন্ধ্যা।"

"শুভ সন্ধ্যা অফিসার।" ছোট্ট একটি নমস্কার করে মহিলাটি একপাশের এয়ারলকের দিকে এগিয়ে গেলেন ধীর পায়ে। তাঁর পেছন পেছন মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী জন আব্রাহাম মুখতার।

*****

"কো- অর্ডিনেট পাওয়া গেছে অ্যাডমিরাল। লক্ষ্যবস্তু আর ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।"

"ইঞ্জিন বন্ধ করুন। সব আলো নিভিয়ে দিন। প্রতিরক্ষাকবচ ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রক চালু করুন। লক্ষ্যবিন্দুর ঠিক পাঁচ মিটার ওপরে নিয়ে যানকে স্থির করুন।পাইলট বাদে বাকি কমব্যাট ফোর্সের সদস্যরা আমার সঙ্গে নিচে নামবারে জন্য তৈরি হোন।"

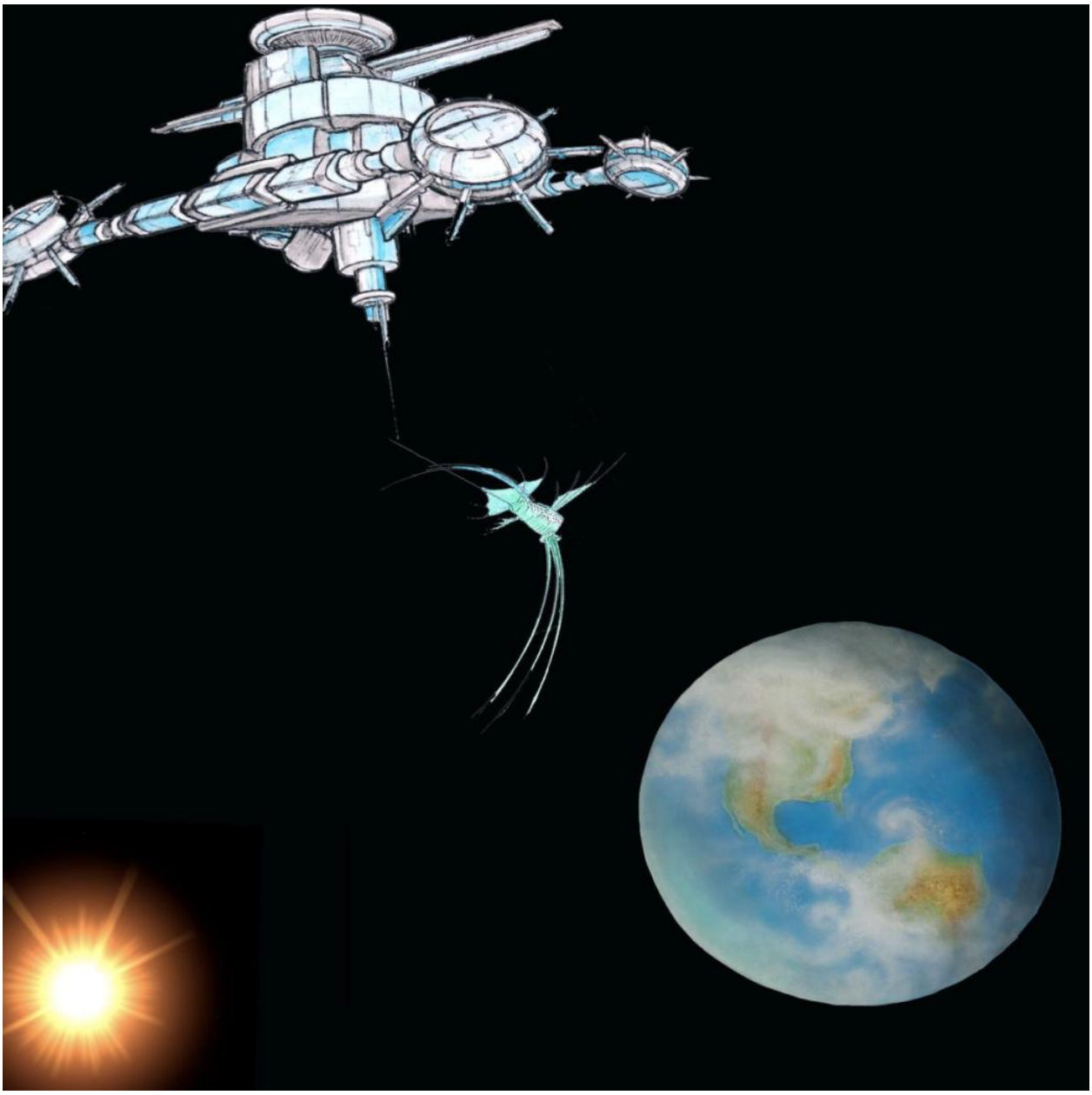

যানের বাইরের আবরণটি তখন বাতাসের সঙ্গে ঘষা খেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই আবছা আলো ছড়িয়ে, ঘন মেঘের রাশি ছিন্নভিন্ন করে নিচের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল ছদ্মবেশী হানাদার যান।

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

পঞ্চা নামে ভালুকটি

পূর্বপ্রকাশিতের পর

মামাকে বলতে একটা বড়ো দেখে হালকা প্লাস্টিকের বল এনে দিল। বলে শট মারা, উঁচু করে সামনে বলটা ছুঁড়ে দিয়ে হেড মারা সহজেই শিখে নিল পঞ্চা। এইসব সহজ জিনিসগুলো শেখানোর কায়দা আমি বুঝে গিয়েছি।

যেমন, বলটা সামনে রেখে আমি বলি, "পঞ্চা, মেরে ভাই –আমি যা করেগা তুমিও তা- ই করেগা," বলে আমিও হামা দিয়ে ভালুকের মতো হয়ে হাত দিয়ে শট মারার মতো করে বলটা মারি।

প্রথমটায় পঞ্চা ঠিক বুঝতে পারে না। তখন আমি আরো কয়েকবার করে দেখিয়ে বলটা ওর সামনে রেখে সামনের একটা পা হাতে ধরে বলটাকে শট করাই। বার কয়েকের চেষ্টায় পঞ্চা দিব্যি ব্যাপারটা বুঝে যায়।

পঞ্চা যে বেশ অনুকরণপ্রিয় ভালুক তাতে আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না। অনুকরণপ্রিয় মানে জান তো? অনুকরণপ্রিয় মানে হচ্ছে যে নকল করতে ভালোবাসে।

অনেক খেলা ওকে আমি শিখিয়ে ফেললাম। নতুন খেলার কথা মাথায় এলেই বারবার সেটা ওর সামনে করি, আর খেলাটার নাম বলতে থাকি সঙ্গে সঙ্গে। এভাবে প্র্যাকটিস করতে করতে ও চমৎকার শিখে ফেলে। তখন শুধু খেলাটার নাম বললেই ও করে দেখায়।

যেমন, বলটা ওর সামনে রেখে বলি, "পঞ্চা, মেরে ভাই, বলে শট করকে দেখাও।"

বলার সঙ্গে পঞ্চা সামনের পা দিয়ে বলে টুক করে শট লাগায়।

যেমন যেমন পঞ্চা শিখছে মামাকেও সব জানিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি! তাকেও শিখে নিতে হচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খেলা তো মামাই দেখাবে।

কয়েকটা খেলা অবশ্য চেষ্টা করেও শেখাতে পারলাম না। ডিগবাজি খাওয়াটা অনেকটা গড়াগড়ি খাওয়ার মতোই থেকে গেল। সেটা ওর দোষ নয়। চেষ্টা ও কম করেনি। কিন্তু অত বড় একটা শরীর নিয়ে আমার মতো ডিগবাজি ও খাবে কী করে? তবু ওটা আমাদের প্রোগ্রামে রাখা ঠিক হল। অনেকটা তো ডিগবাজির মতোই হচ্ছে। নাকের ডগায় বল ব্যালান্স করার খেলাটা অবশ্য শেখানো গেল না। এটা একটা দারুণ আইটেম হতে পারত। কিন্তু আমিই পারিনা নাকের ডগায় এক সেকেন্ড বলটাকে দাঁড় করিয়ে

রাখতে, তো পঞ্চাকে শেখাব কেমন করে? দুলুনি নাচের সঙ্গে আরো দু'রকম নাচ কিন্তু ওকে আমি শিখিয়ে ফেললাম –দু'পায়ে নাচ, তিন পায়ে নাচ। এক পায়ে নাচের চেষ্টা করে দেখা গেল সেটা সম্ভব নয়। অত ভারী শরীর নিয়ে এক পায়ে নাচতে পারে কেউ! চেষ্টা করেছিল বেচারা। পারে না, পড়ে যায়। শেষে আমিই বললাম "থাক পঞ্চা ভাই, আর চেষ্টা নেহি করেগা, তোমার ব্যথা লাগেগা তো আমার খুব দুঃখ হোগা।"

পঞ্চাকে নিয়ে খেলা দেখাতে বেরোনোর জন্য আমরা প্রায় তৈরি এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

হাবুল মন্ডল হঠাৎ একদিন এসে হাজির। আমি একা ছিলাম বাড়িতে।

হাবুল মন্ডল কাঠ- মিস্তিরি। তার সবই কাঠ- কাঠ। চেহারা, কথাবার্তা –সব। কেউ তাকে খুব একটা পছন্দ করে না। ঝামেলা পাকানো তার স্বভাব।

"ন'কড়ি কোথা," বলতে বলতে সে ঘরে ঢুকল, "এই বুঝি তোদের সেই বিতিকিচ্ছি ভালুকটা?"

ভীষণ রাগ হল আমার। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না। হাবুল মন্ডলের সঙ্গে ঝগড়া না বাধানোই ভালো। মনে মনে বললাম, "পঞ্চা বিতিকিচ্ছি ভালুক হতে যাবে কেন? তুমিই একটা বিতিকিচ্ছি মানুষ –ভোঁদড় চামচিকে ছুঁচো, এদের থেকেও খারাপ তুমি। অ্যাঁ, পঞ্চার দোষ ধরতে এয়েছেন! ওর মতো ক'টা ভালুক আছে পৃথিবীতে?"

রাগে আমি ভেতরে ভেতরে একেবারে গজগজ করছিলাম।

"তা সে আসবে কখন?" হাবুল মন্ডল জিজ্ঞেস করল।

"জানি না।"

''এলে বলবি আমার সঙ্গে দেখা করতে। একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব আজ।''

আমাকে চিন্তায় ফেলে হাবুল মন্ডল চলে গেল।

মামা বাড়ি ফিরতে সব বললাম। ভেবে- চিন্তে মামা বলল, ''চল যাই, দেখি হাবুল কী বলে। মনে হচ্ছে ওর মাথায় পোকা নড়েছে। লোকটা তো ভালো না! ঝামেল পাকাতে ওস্তাদ।''

আমরা যেতেই হাবুল তেড়ে- ফুঁড়ে বলতে শুরু করল, ''এই যে ন'কড়ি, তোমাদের ওই বিচ্ছিরি ভালুকটাকে হটাও, এখানে ভালুক রাখা চলবে না। তিন দিন সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে ওটাকে বিদেয় করতে হবে।''

''কেন হাবুলদা, অমন কথা কেন বলছ? ভালুক আছে, আমাদের ঘরে আছে, আমরা তো কারো অসুবিধা করছি না।''

''তা বললে হবে?'' তেড়ে- মেড়ে উঠল হাবুল, ''ভালুক জাতের স্বভাব মোটেই ভালো না। আমি অনেকের সাথে কথা কয়েছি। তাদেরও ওই মত। তোমাদের ভালুক যদি কাউকে আক্রমণ করে?''

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বললাম, ''আমাদের পঞ্চা খুব ঠান্ডা স্বভাবের ভালুক, বস্তির সবাই দেখেছে।''

''তুই চুপ কর ছোঁড়া,'' হাবুল খেঁকিয়ে উঠল।

আমাকে চোখের ইশারা করে মামা বলল, ''তুই থাম দশা, বড়োদের কথার মধ্যে কথা বলতে নেই। হাবুলদা, পঞ্চা এর আগেও তো একজনের ঘরেই থাকত। এখানেও আমাদের ঘরে থাকবে। তাকে আমরা বাইরে বার করব না। যখন খেলা দেখাতে নিয়ে যাব মুখ বাঁধা থাকবে। গলায় বাঁধা দড়ি থাকবে আমার হাতে। খুলে রাখলেও পঞ্চা কারো ক্ষতি করবে না, মানুষকে ও খুব ভালোবাসে, সে তো বস্তির লোকেরা দেখেছে। তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ।''

কিন্তু হাবুল মন্ডল কি কারো কথা শোনার পাত্র? সে তার জেদ ধরেই রইল, "আমাকে জ্ঞান দেবার চেষ্টা কোরো না ন'কড়ি। আমি গরাণ কাঠ দেখিয়ে লোককে বুঝিয়ে দিচ্ছি সেগুন কাঠ, হুঁ! আর উনি এয়েছেন আমাকে জ্ঞান দিতে। যা বলেছি –ফাইনাল। ভালুক ভাগাও।"

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে মামা বলল "চ' দশা।"

যেতে যেতে আমি বললাম, "ব্যাপার কী বলো তো মামা, হাবুল মন্ডল ওরকম করছে কেন?"

"বুঝলি না? ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। নিজেই বড়ো মুখ করে বলছে গরাণ কাঠকে সেগুন কাঠ বলে চালিয়ে লোককে বোকা বানায়। পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট হাতে ধরিয়ে দিলে এক্ষুনি চুপ করে যাবে, পঞ্চা যে কত ভালো ভালুক নিজেই বলে বেড়াবে। টাকা আমার নেই, থাকলেও একটা পয়সা আমি ওকে দিতাম না। যা পারে ও করুকগে।"

"মামা," হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল, "পরাণদাদুকে বলে দেখলে হয় না?"

"মন্দ বলিসনি," মামা আমার কথায় সায় দিল, চল "পরাণজেঠুকে গিয়ে সব বলি।"

ঘটনা শুনেই তো পরাণদাদু রেগে আগুন, তেলে বেগুন। "এ কী অন্যায়, এ কী অত্যাচার! ওরে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমি ওরে ছাড়ুম না। চলো," বলে লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতির ওপর আধময়লা একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে দাদু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'জনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বলতে গেলে হাবুল আমাদের দোরগোড়া থেকেই খেদিয়ে দিয়েছিল, বসতে তো বলেইনি। কিন্তু পরাণদাদু বস্তির সবচেয়ে সম্মানিত শিক্ষিত লোক। তার সঙ্গে ও রকম অভদ্রতা করা চলে না বুঝেই হয়তো হাবুল বলল, "আসুন জেঠু, বসুন এই চেয়ারটাতে।"

কিন্তু দাদু তখন রেগে টং। বলে, "বসতে আসি নাই। শুনো হাবুল, তোমার অনেক পয়সা, কেমন কইরা পয়সা আসে তাও জানি। এরা হদ্দ গরিব। তুমি এদের প্যাটে লাথি মারনের তাল করতাছ ক্যান? ভল্লুকের খেলা দেখাইয়া দুইটা পয়সা যদি রোজগার করে তোমার কী ক্ষতি? ক্যান খামাখা গোলমাল পাকাইতাছ তুমি?"

"ছি ছি ছি ছি," জিব কেটে কানের লতি ছুঁয়ে হাবুল বলল, "কারো রোজগারে কেন বাধা দেব আমি? তা- ই বলে লোকের ভালোমন্দর দিকটা মাথায় রাখব না? ভালুকটা যদি খেপে যায়? যদি কাউকে আক্রমণ করে?"

"না, সেই ভয় নাই। ভল্লুকটি বড়ই শিষ্ট স্বভাবের। কিন্তু হাবুল, লোকের ভালোমন্দ লইয়া তোমার এত চিন্তা আগে তো কখনও দেখি নাই। সেইবার নিশিকান্তর চিকিৎসা লাইগা বস্তির গরিবস্য গরিবরাও দুই- পাঁচ টাকা চান্দা দিল। তুমি একটা পয়সাও দেও নাই।"

এবার বোধহয় আঁতে ঘা লাগল হাবুলের, সেও গলা তুলল, "বেশ করেছি দিইনি। কোথায় কার চিকিৎসা হচ্ছে না তার জন্যে আমার কষ্টের পয়সা খয়রাত করতে হবে?"

"তুমি একটা পশুর অধম," পরাণদাদুর গলা হাবুলের গলার ওপরে উঠল, "তোমারে আমি স্পষ্ট কথা কইতাছি হাবুল, তুমি যদি উৎপাত কর আমি তোমারে শিক্ষা দিয়া ছাড়ুম।"

আসল চেহারা বেরিয়ে এল হাবুলের, "যান, যান, যা পারেন করুন গে আপনি। ভালুক আমি তাড়িয়ে ছাড়ব।"

"তুমি আমারে চিন না হাবুল। আমি মনে করতাছি তুমি আমার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করলা। তোমার কী হাল করি দেখবা। চইলা আসো নয়কড়ি –"

পরাণদাদু যে একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে বোঝা যাচ্ছে। গটগট করে হাঁটছে। পেছন পেছন আমি আর মামা। যাকে পাচ্ছে তাকেই বলছে দাদু, "সবাইরে লইয়া মাঠে চইলা আসো। সভা হইব। জরুরি সভা। আধঘন্টা পরে।"

আমি ভয়ে ভয়ে মামার দিকে তাকালাম।

মামা ইশারায় আমাকে ভরসা দিল। যেন মিটিমিটি হাসিতে আমাকে বুঝিয়ে দিল –দ্যাখ না কী কান্ড হয়। পরাণজেঠু যা করবে আমাদের ভালোর জন্যই করবে।

বস্তিতে একটা চক্কর দিয়ে একেবারে আমাদের ঘরের সামনে এসে থামল দাদু। তারপর বলল, "নয়কড়ি, ভল্লুকটারে এইবারে বাইরে আনো।"

মামা দরজা খুলে পঞ্চাকে বাইরে নিয়ে এল।

দাদু বলল, "নয়কড়ি, আমি তোমার ভল্লুকের পিঠে চড়ুম। তুমি এর গলায় দড়ি ধইরা সভাস্থলে লইয়া চলো।"

বলে চটপট পঞ্চার পিঠে চড়ে বসল দাদু।

ভাবতে পার দৃশ্যটা তোমরা! হেলে- দুলে পঞ্চা চলেছে, তার পিঠে পরাণদাদু। পঞ্চার গলার দড়ি ধরে মামা রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। পেছনে আমি।

এই কান্ড দেখে বাচ্চাবুড়ো হইহই করে সবাই ছুটে এল।

আমাদের বস্তির মাঝখানে ছোটো একটা মাঠ মতন আছে। রীতিমতো মিছিল করে সেখানে পৌঁছোলাম আমরা। দাদুর ডাকে আগে থেকেই অনেকে এসে ভিড় করে ছিল। আমাদের মিছিল গিয়ে পৌঁছতে মাঠ একেবারে ভরে গিয়ে টইটুম্বুর। এই অবাক ব্যাপার দেখে সবাই একেবারে হকচকিয়ে গেছে। বুঝতে পারছে না কেউ কিছু, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

পঞ্চার পিঠ থেকে নেমে দাদু একজনকে বলল, "একটা বেঞ্চি টুল চৌকি যা পাও লইয়া আসো।"

দেখতে দেখতে চলে এল একটা চৌকি। দাদু তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে মামাকে বলল, "পঞ্চারে উঠাইয়া আমার পাশে বসাও। "

মামা তা- ই করল। দাদু এবার দুই হাত তুলে সবাইকে চুপ করে করতে বলল।

"একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমি এই সভা ডাকছি। ক্যান এই বৃদ্ধ বয়সে ভল্লুকের পিঠে চইড়া আমি সভাস্থলে আইলাম এই কথাটা ভাইবা তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হইছ। হওনেরই কথা। এইটাই আমি আবার প্রমাণ করলাম যে ভল্লুকটি বড়ই শান্ত ও সুশীল। তোমরা অবশ্য আগেও দেখছ, শুনছ। আবারও দ্যাখো তোমরা, এত লোকের মধ্যেও সে কেমন ভদ্রসভ্যভাবে বইসা আছে। কোনো চঞ্চলতা নাই, দুষ্টামি নাই। তোমরা সকলেই নয়কড়ি আর তার ভাইগনা দশকড়িরে চিন। এদের ভল্লুকের মতন এরাও অত্যন্ত ভদ্র ও শান্তশিষ্ট। সামান্য পুঁজিপাটা শ্যাষ কইরা এরা এই ভল্লুকটা কিনছে খেলা দেখাইয়া দুইটা পয়সা রোজগারের আশায়। অথচ হাবুল মন্ডল উইঠা- পইড়া লাগছে ভল্লুকটারে তাড়ানের লাইগা।"

এইভাবে চমৎকার একটা বক্তৃতা দিল পরাণদাদু। হাবুলের বদমায়েশির কথা সব বলল। একটা একটা করে হাবুলের কান্ড বলে দাদু আর লোকেরা সব ছি ছি করে ওঠে। একদল খেপে গিয়ে বলল, "ওকে কান ধরে বস্তি থেকে বার করে দেব আমরা।"

তাদের শান্ত করল দাদু, "তোমরা উত্তেজিত হইয়ো না। হাবুলরে তাড়ানেরও কাম নাই মারনেরও কাম নাই। ওরে শুধু এইটা বুঝাইয়া দিলেই হইব যে অন্যের ক্ষতি করনের চেষ্টা আমরা সহ্য করুম না। সবাই শান্তিতে থাইকা দুইটা ডাইলভাত খাউক এই আমরা চাই। তা হইলে তোমরা কী চাও কও। তোমরা যদি চাও ভল্লুক থাকব, তোমরা না চাইলে থাকব না।"

সবাই একসঙ্গে গমগম করে বলে উঠল, "থাকবে থাকবে।"

দাদু দু'হাত তুলে বলল, "তোমাদের মঙ্গল হইব। তোমরা অতি সজ্জন। সভা শেষ।"

"দাদু," সামনের দিক থেকে কে একজন বলে উঠল, "পঞ্চার খেলা দিয়ে সভাটা শেষ করলে হয় না?"

"উত্তম প্রস্তাব! তুমি কী কও নয়কড়ি?" মামার দিকে তাকাল দাদু।

"খুব ভালো কথা," মামা বলল, "যা তো দশা, ঘর থেকে খেলা দেখানোর জিনিসগুলো নিয়ে আয়।"

আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম সব জিনিস।

দারুণ খেলা দেখাল পঞ্চা। জমিয়ে দিল একেবারে। সে কী আনন্দ সবার!

সভা শেষ হতে প্রথমে মামা তারপর আমি পরাণদাদুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। কী জানি কেন আমরা না বলতেই আমাদের দেখাদেখি পঞ্চাও সামনের দু'পা জড়ো করে নমস্কার করল দাদুকে।

দাদু হাত তুলে আমাদের তিন জনকেই বলল, "আয়ুষ্মান ভব।"

পরদিন সকালে আমি আর মামা চা খেতে খেতে গল্প করছিলাম, "পরাণজেঠুর ক্ষমতা দেখলি দশা, এক প্যাঁচে হাবুলকে একেবারে শুইয়ে দিল। আমাদের সঙ্গে আর বাঁদরামো করতে আসবে না হাবুল।"

সত্যি, পরাণদাদু অতুলনীয়।

"লাগিয়েছিস ভালো। কিন্তু মানেটা ঠিক ঠিক জানা আছে তো?"

"হ্যাঁ। অতুলনীয় মানে যার তুলনা নেই।"

"ঠিক আছে।"

"আমাদের পঞ্চা কেমন খেলা দেখাবে তারও কিন্তু একটা পরীক্ষা কাল হয়ে গেল মামা। তুমি ওকে কোন ডিভিশন দেবে?"

"ফার্স্ট ডিভিশন। দুটো লেটার।"

"কীসে কীসে?"

“নাচার জন্যে একটা, আর একটা নকল কুস্তি- কুস্তি খেলার জন্যে।”

“সব মিলিয়ে ওকে স্টার দিচ্ছ না কেন তুমি?” নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে মামাকে বড্ড কৃপণ মনে হচ্ছিল আমার।

কপালে আঙুলের টোকা দিতে দিতে মামা বলল “তা দেওয়া যেতে পারে। কাকে বলে লেটার, কাকে বলে স্টার ঠিক জানিস তো? ”

“জানি। কোনো বিষয়ে আশি বা তার ওপরে পেলে লেটার। আর, সব মিলিয়ে শতকরা পঁচাত্তর পেলে স্টার।”

“শুধু পঞ্চা স্টার পেলে হবে না, তোকেও পেতে হবে মাধ্যমিকে।”

“ন’কড়ি ঘরে আছ নাকি হে?” বাইরে থেকে কারো ডাক।

মামা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতে ঘরে ঢুকল বদ্যিনাথদাদু। পরাণদাদু যেমন রোগা- রোগা টানটান চটপটে, বদ্যিনাথদাদু ঠিক তার উলটো। গোলগাল মোটাসোটা, হাঁটে থপথপ করে। পরাণদাদুকে মোটে দেখতে পারে না বদ্যিনাথদাদু, খুব হিংসে করে। আমার মনে হয় পরাণদাদুকে যে লোকে খুব মান্যিগণ্যি করে, ওকে অতটা করে না, এটাই ওর হিংসের কারণ। কেন যে বদ্যিনাথদাদু বোঝে না –পরাণদাদুর মতো সে কি লেখাপড়া জানে, নাকি সকলের আপদে- বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়?

বদ্যিনাথদাদুকে দেখে আমার মনে হল সে খুব বিরক্ত হয়ে আছে। চৌকিতে বসেই বলল, “আচ্ছা ন’কড়ি, এটা কী হল? ওই বাঙালটাকে ভালুকের পিঠে চড়িয়ে বস্তি ঘোরাতে গেলে কেন? আমাকে বললে আমি ঘুরতে পারতাম না?”

“না না জেঠু,” মামা বলল, “ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। উনি নিজে থেকে বললেন বলেই…। আমি কি কোনো গুরুজনকে বলতে পারি, এপনি ভালুকের পিঠে চড়ে বস্তিতে ঘুরুন?”

“কথাটা মিথ্যে বলেনি,” বদ্যিনাথদাদু বলল, “কিন্তু আমি এখন ভালুকের পিঠে না চড়লে ওই বাঙালটার দেমাক বড্ড বেড়ে যাবে না?”

মামা ইতস্তত করতে লাগল।

আমি বললাম, “বেশ তো দাদু, তুমি কাল বিকেলে চোড়ো। আমরা সবাইকে বলে রাখব। তোমার সম্মান আমরা কমতে দেব না। আচ্ছা দাদু, তাহলে এখন একবার ঘরের মধ্যেই পঞ্চার পিঠে চড়ার ট্রায়াল দিয়ে নাও।”

কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে বদ্যিনাথদাদু বলল, “এখনই? না, এখন থাক, মানে আজ আমার হাঁটুর ব্যথাটা

আবার বেড়েছে কিনা। কবে চড়ব তোমাদের আগে জানিয়ে দেব। যেদিন হবে একেবারেই হবে।”

“বেশ, তা-ই হবে,” মামা বলল, “পঞ্চা, বদ্যিনাথজেঠুকে নমস্কার করো।”

পঞ্চা নমস্কার করল, পেছনের দু’পায়ে বসে সামনের দু’পা জড়ো করে নমস্কারের এই ভঙ্গিতে বসেই থাকল তারপর।

আমি সেটা লক্ষ্য করে বললাম, “মামা, পঞ্চা নমস্কার করেই আছে কেন?”

এক সেকেন্ড ভেবে মামা বলল, “বদ্যিনাথজেঠুর আশীর্বাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে মনে হয়। পরাণজেঠু ওকে হাত তুলে ‘আয়ুষ্মান ভব’ বলে আশীর্বাদ করেন না! আপনি ওকে অমনি করে আশীর্বাদ করুন তো বদ্যিনাথজেঠু, দেখি কী করে!”

খিটখিটে গলায় বদ্যিনাথদাদু বলল, “আমি ওই কাঠবাঙালটার মতো করে আশীর্বাদ করতে যাব কেন? আমি আমার মতো করব।”

বলে হাত তুলে পঞ্চাকে আশীর্বাদ করল বদ্যিনাথ দাদু, “শতপুত্রবতী ভব।”

তাতেও কাজ হল, পঞ্চা সামনের দু’পা নামিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

মামা বলল, “ও কী করে একশো ছেলের মা হবে জেঠু? ও যে ভালুক, ভালুকনি তো নয়!”

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

।১।

শার্লক হোমস আর ওয়াটসন ট্রেকিং এ বের হয়েছেন। রাতে একটা জঙ্গলের ধারে তাঁবু খাটিয়ে দুজন ঘুমোতে গেলেন। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে শার্লক ওয়াটসনকে গুঁতো মেরে ডাকলেন, "ওয়াটসন, মাথার ওপর কী দেখছ?"

"উঁ—কোটি কোটি তারা।"

"এর থেকে তুমি কি সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারো?"

"কোটি কোটি তারা মানে তাদের কিছু তারাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ গ্রহ—লক্ষ লক্ষ গ্রহ মানে তাদের মধ্যে হাজার হাজার গ্রহে প্রাণ— হাজার হাজার গ্রহে প্রাণ মানে শত শত গ্রহে বুদ্ধিমান জীব— তার মানে মহাবিশ্বে আমরা একা নই। এ ছাড়া আর কোন সিদ্ধান্ত হতে পারে না শার্লক। সমস্ত বিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত-- "

"ওয়াটসন, তুমি একটা বুদ্ধু। মাথার ওপরে এত তারার আসল সিদ্ধান্তটা হল আমাদের তাঁবুটা কেউ চুরি করে পালিয়েছে।"

।২।

শার্লক আর ওয়াটসন বেলুন অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছেন। বেলুনটা খুব নিচে দিয়ে উড়ছিলো। তলায় রাস্তার ওপরে একজন লোককে আসতে দেখে হোমস চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মশাই, আমরা কোথায় আছি বলতে পারেন?"

লোকটি তাঁদের দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "আপনারা একটা বেলুনে আছেন।"

শুনে শার্লক বললেন, "ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয় একজন গণিতজ্ঞ, তাই না?"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, "কী করে বুঝলেন?"

"সহজ ব্যাপার। প্রথমত আপনি উত্তরটা দেবার আগে বেশ কিছুক্ষণ ভেবেছেন। দ্বিতীয়ত আপনি যে উত্তরটা দিয়েছেন সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে একদম সঠিক। কোনো ভুলচুক নেই। আর তৃতীয়ত আপনার উত্তরটা বাস্তবজীবনে কোন একেবারেই কোন কাজের নয়।"

এবারে শুধু ছবির মেলা। হাজার রঙের ঢেউয়ে ভেসে যাক জয়ঢাকের পাতা।

আমাদের পাড়ায় দুর্গাপুজোর সময় একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তাতে সবাই তো ছবি এঁকে পুরষ্কারটুরষ্কার পেল। আঁকিয়েদের মধ্যে একজন কোন পুরষ্কার পায়নি। প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে দেখলাম , নিজের আঁকা ছবিটাকে পথের পাশে ফেলে দিয়ে গেছে সেই আঁকিয়ে। কালো পিচের রাস্তা আলো করে শুয়ে ছিল ছবিটা। আমরা তাকে তুলে এনে জয়ঢাকের পাতাতে সাজিয়ে দিলাম। ছোট্ট বন্ধু, আমরা তোমার নাম জানিনা। শুধু জানি তুমি একজন খাঁটি শিল্পী। অসাধারণ রঙের ঢেউ তুলে তাকে অবহেলায় ছড়িয়ে দিয়ে যেতে পারো পথের পাশে। নাম না জানা আঁকিয়ে , তুমি অনেক বড়ো হও। আমাদের কালো পিচের মরা রাস্তাকে চিরদিন এইভাবেই যেন রাঙিয়ে দিয়ে যেও।

বিজয়া দশমীর দিন জয়ঢাককে দুর্গাপুজোর এক অসাধারণ সুন্দর অ্যালবাম উপহার পাঠিয়েছে পাণিহাটি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে ক্লাস ফাইভের ছোট্ট বন্ধু অহনা। দেখ দেখি, এমন সুন্দর সব ছবি কি আগে কখনো দেখেছো?

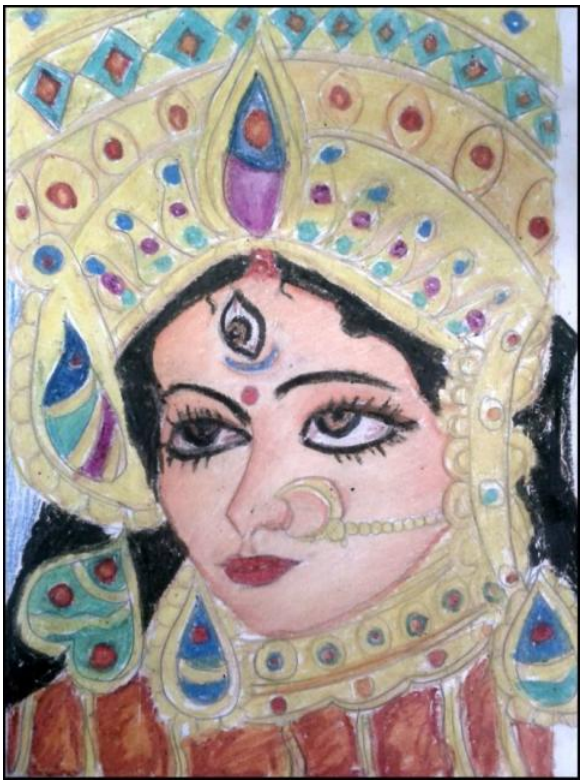

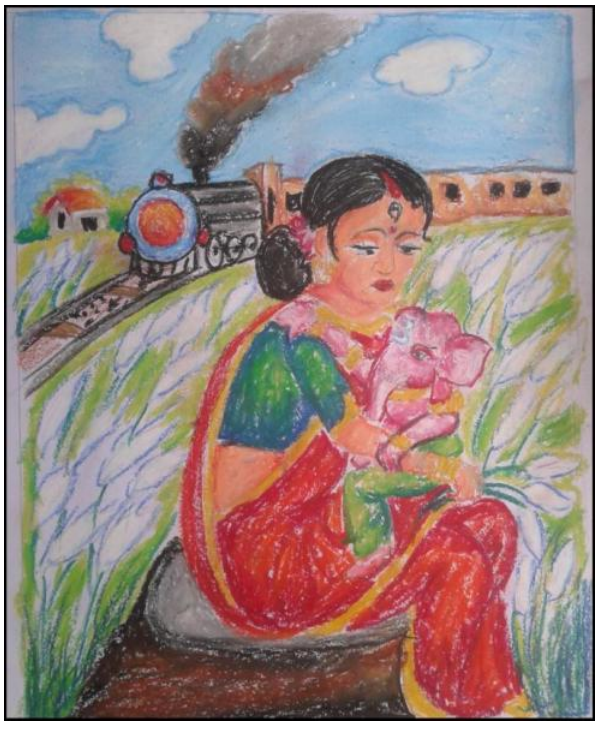

ছত্তিশগঢ়ের দুই দুষ্টু ভাই নীলাদ্রি আর প্রান্তিক জয়ঢাককে দুখানা ছবি উপহার দিয়েছে। নীলাদ্রি এঁকেছে বুড়ো আঙুলের ছাপাই ছবি আর প্রান্তিকের তুলিতে একখানা রামধনু ভরা আছে। এই দেখোঃ

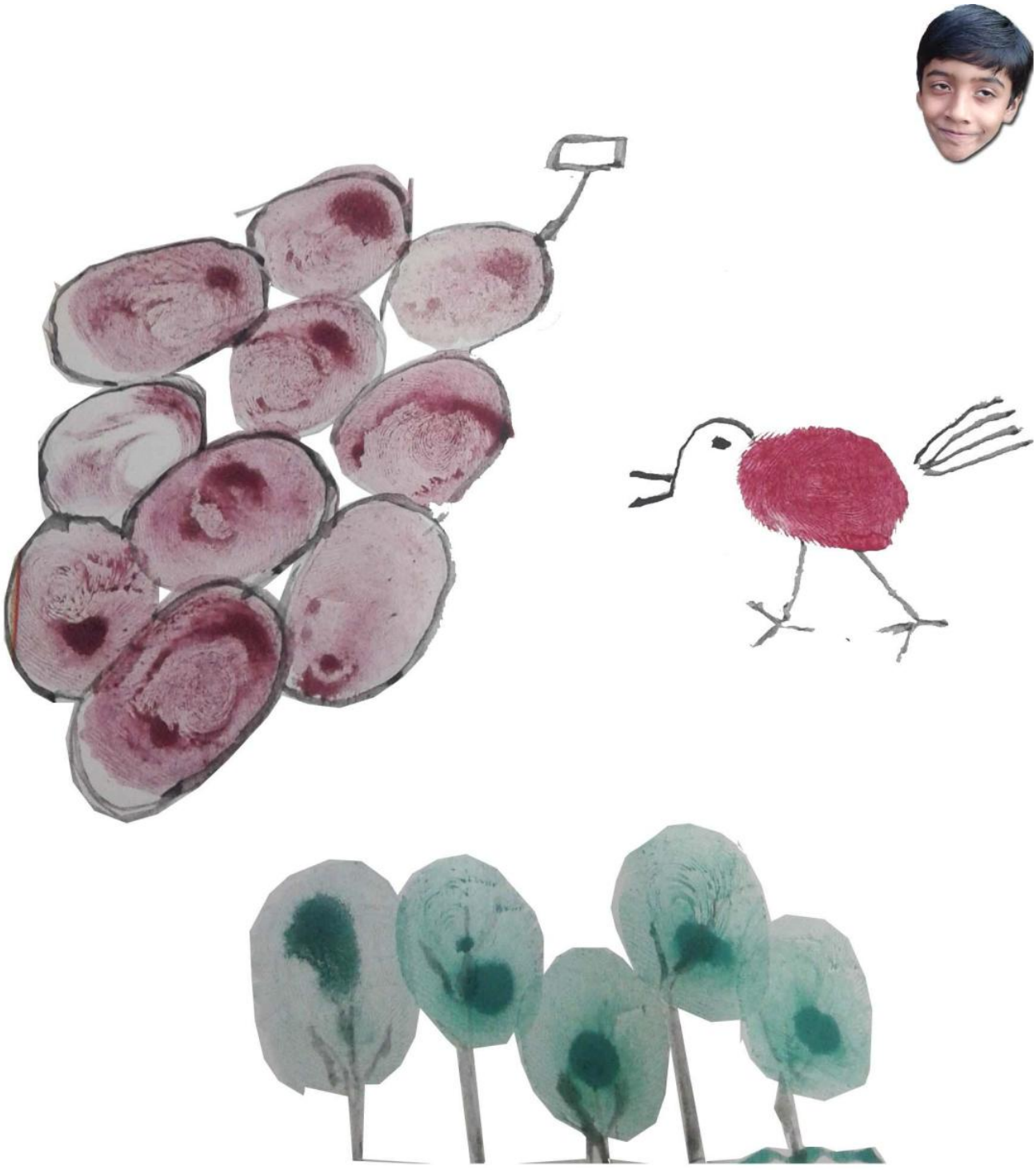

নীলাদ্রির ছবি

প্রান্তিকের ছবি

পুরাণ কথা

সংহিতা

ত্রিলোক ও কৃষ্ণার্জুনের সাথে অগ্নিদেব

প্রথমে অগ্নি খান্ডব বনের চারদিকে ছড়িয়ে গেলেন। আর ঘিরে ধরলেন বনকে। রথে চেপে কৃষ্ণার্জুন প্রচন্ড ক্ষিপ্রতায় বন চিড়ে যাতায়াত করতে লাগলেন। তাঁদের অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল প্রাণভয়ে পালাতে থাকা জীবজন্তু, পাখির ঝাঁক। পালাবার চেষ্টায় ছুটন্ত চারপেয়ে জন্তু বা উড়ন্ত পাখি কেউই নিস্তার পেল না অর্জুনের বাণের থেকে। টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের ধারে। সমস্ত রক্ত মাংস আহুতি হয়ে পড়তে লাগল অগ্নিদেবের লেলিহান জিভে। কিছু পশুপাখি যাদের সাথে শিশুসন্তান বা বৃদ্ধ বাবা- মা, ঠাকুর্দা- ঠানদি ছিল তারা পালাতে পারল না, রয়ে গেল খান্ডব বনেই; আর আপনজনেদের জড়িয়ে ধরে মরে গেল অগ্নিদেবের আঁচে পুড়ে।

কৃষ্ণার্জুনের রথের বেগ আর তাদের অস্ত্রবর্ষণের ক্ষিপ্রতায় বোঝার উপায় ছিল না যে দুজন আলাদা আলাদা ভাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করছেন। মনে হচ্ছিল যেন কোনো মানুষ একাই চলেছেন রথে চেপে বনের এ মাথা থেকে ওপ্রান্ত। একসময় জ্বলন্ত বনের

তাত এতো বাড়ল যে যত পুকুর আর বিল ছিল তার জল বাষ্প হয়ে উবে যেতে লাগল। যত কাছিম, যত মাছ সবাই ডাঙায় উঠে পড়তে লাগল লাফিয়ে আর পুড়তে লাগল আগুনে। একটা সময় জ্বলন্ত জন্তু, জানোয়ার, পাখি, মাছ, কাঠ দেখে মনে হতে লাগল যেন আগুনই স্বয়ং নানান চেহারা নিয়েছে। মৃত্যু যন্ত্রণায়, প্রাণভয়ে জঙ্গলের সমস্ত আবাসিক এমন আকুল আর্তনাদ শুরু করল যে তা সমুদ্রগর্জনকেও হার মানাল। এত পশু, পাখি, পিশাচের দহনে কুন্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়াও উঠল প্রচুর। সেই ধোঁয়া দেবলোকে বাসিন্দা দেবদেবীদের কাশি ধরিয়ে দিল; চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিল। তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উপস্থিত হলেন দেবরাজ ইন্দ্রের দরবারে। আর্জি জানালেন এই দমবন্ধ আবহাওয়া থেকে তাঁদের নিষ্কৃতি দিতে হবে।

খান্ডব বন জ্বলার খবর এইভাবেই পৌঁছল ইন্দ্রের কানে। তিনি বন্ধু তক্ষকের কথা ভেবে আকুল হলেন। তৎক্ষণাৎ ঘনিয়ে তুললেন মেঘেদের বিশাল সমাবেশ। মেঘেরা একত্রিত হয়ে জমতে জমতে নামাল তুমুল বৃষ্টি। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত তারা পতাকাদণ্ডের মতো মোটা মোটা জলস্তম্ভ তৈরি করল। কিন্তু সেই বৃষ্টির জলও খান্ডব দহনের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে গেল। ইন্দ্র তখন আরও বিশাল ও বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার করলেন খান্ডব বনের আকাশ জুড়ে। নামালেন প্রবলতর বৃষ্টি। অগ্নি তাঁর শিখার তেজ বাড়িয়ে দিলেন ভয়ানক রকম। বজ্রের আওয়াজে, প্রচন্ড বৃষ্টিতে, জমাট মেঘে, তার মোকাবিলায় তীব্রতর হয়ে ওঠা আগুনের তেজে, প্রাণভয়সঙ্কুল জীবনের আর্ত চীৎকারে, বজ্রপাতের ঝলকে পুরো এলাকাটা ভয়ঙ্কর দেখতে হয়ে গেল।

নামুচিহন্তা বাসবের বর্ষণের মোকাবিলায় অর্জুনও সমান তেজে, সমান ক্ষিপ্রতায়, সমান পরিমাণে অস্ত্র বর্ষালেন। তাঁর তিরগুলো চাঁদোয়া হয়ে ঢেকে দিল জ্বলন্ত খান্ডব বন আর দাহক আগুনের তেজ। অগণিত তীরে বানানো চাঁদোয়া পেরিয়ে বৃষ্টি হয়ে পড়ছিল মৃদু, প্রায় কুয়াশার ঘেরে পূর্ণিমার প্রভার মতো। বাসববান্ধব তক্ষক কিন্তু তখন বনে ছিলেন না। ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেন। তক্ষক গিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। পুত্র অশ্বসেনকে নিয়ে পালানোর চেষ্টায় ছিলেন তক্ষকের স্ত্রী। বিপদ বুঝে তিনি অশ্বসেনাকে পুরো লুকিয়ে ফেলতে গেলেন নিজের শরীরের আড়ালে। তাই তিনি অশ্বসেনের মাথা থেকে লেজের দিকে তাকে গিলে ফেলছিলেন। যখন লেজটুকু মাত্র বাকি তখন ধনঞ্জয়ের চোখে পড়ে গেলেন তিনি। তেড়ে এসে তক্ষকের স্ত্রীর মাথাটা তিনি একটা ধারালো তিরের কোপে বাকি শরীর থেকে আলাদা

করে দিলেন। কিন্তু এতে অশ্বসেনের কবচ খসে পড়ল। তিনি অরক্ষিত হয়ে পড়লেন। এইসময় বন্ধু পুত্রের প্রাণ রক্ষায় বদ্ধপরিকর ইন্দ্র একটা ঝড় তুলে অর্জুনকে সংজ্ঞাহীন করে দিলেন। তাই অশ্বসেন পালানোর পথ পেয়ে গেলেন। এতে অগ্নি ও তাঁর দুই সহায়ক, বাসুদেব ও বিভাৎসু, সাংঘাতিক রেগে গেলেন। তাঁরা প্রবল অভিসম্পাত দিলেন অশ্বসেনকে। তাঁরা বললেন, "তুই কক্ষনো সুনাম পাবি না!"

অর্জুন কিন্তু আসলে রেগে ছিলেন ইন্দ্রের ছলে। তাই ইন্দ্রের সমস্ত জারিজুরি বন্ধ করার জন্য তিনি তিরে তিরে আকাশ ছেয়ে দিলেন। তাই দেখে ইন্দ্রও তাঁর ভয়ঙ্করতম অস্ত্রে টঙ্কারের শব্দে আকাশ ছেয়ে দিয়ে জানালেন তিনি রণে প্রস্তুত। তখন বায়ুও জড়ো করল মহাসাগরের বুক থেকে আনা মহাসাগর প্রমাণ বজ্রগর্ভ মেঘ। বজ্রগর্ভ মেঘের গর্জনে, বিদ্যুৎ চমকে মথিত হয়ে গেল খান্ডব বন কয়েক মূহুর্তের জন্য। কিন্তু তার মধ্যেই যথাযথ মন্ত্র পড়ে অর্জুন নিক্ষেপ করেছেন বায়াব্য নামে এক তির। সেই তিরে সমস্ত মেঘ তো উড়ে গেলই, তার সাথে অকেজো হয়ে গেল ইন্দ্রের

বজ্র। সমস্ত বৃষ্টি ধারা গেল শুকিয়ে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গোল সূর্য ঝলমলিয়ে উঠল। মৃদু মন্দ শীতল বাতাস বইতে লাগল।

অগ্নি খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁকে কেউ প্রতিহত করার নেই দেখে মহানন্দে নানা দিকে বিস্তার পেয়ে, নানান চেহারা নিয়ে তিনি গ্রাস করে চললেন খান্ডব বন আর তার জীবজগৎ। দারুণ পালকে ঢাকা দেহ নিয়ে গরুঢ় পাখির ঝাঁক ধেয়ে এলো আকাশ থেকে কৃষ্ণার্জুনকে ঠুকরে দিতে, যাতে তাঁরা হুতাশনের সাহায্য না করতে পারেন। তাঁদের সাথে আকাশ থেকে ধেয়ে এলো সাপের দল, জিভে আগুন আর বিষাক্ততম বিষের ফোয়ারা ছুটিয়ে। কিন্তু প্রচন্ড তেজে অর্জুন তাদের তির বিদ্ধ করে ফালাফালা করে দিলেন আর তারা গিয়ে পড়ল জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে। তারপরে প্রচন্ড হুঙ্কারে ধেয়ে এলো যত গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস আর নাগের দল। তাদের গলার ভেতর থেকে তারা উগরে দিচ্ছিল লোহার গুলির ছররা, লোহার টোটার বন্যা। গুলতি দিয়ে পাথরের টুকরো ছুঁড়ছিল বৃষ্টির মতো। তারা রাগের তাড়সে হই হই করে ধেয়ে আসছিল কৃষ্ণার্জুনের দিকে। কিন্তু অর্জুন স্থির লক্ষ্যে বাণবিদ্ধ করে শিরচ্ছেদ করছিলেন তাদের। অন্যদিকে বাসুদেবও সুদর্শনে শিরচ্ছিন্ন করছিলেন অগুণতি দৈত্যদানবের।

বাদবাকি অসুরেরা দেবরাজের কাছে নিবেদন করল, "এই দুজনের নাশ আবশ্যিক।" তাই শুনে দেবরাজ তাঁর বজ্র নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাঁর নেতৃত্বে নিজের নিজের অস্ত্র ধরলেন সমবেত সকল দেবতা। যম নিলেন তাঁর মৃত্যুদায়ী মুষল, কুবের নিলেন কন্টকিত গদা, বরুণ নিলেন তাঁর পাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র, স্কন্দ নিলেন তাঁর দীর্ঘ তরবারি, অশ্বিনীকুমারদের হাতে দেদীপ্যমান গাছ, ধাত্রীর হাতে ধনুক আর জয়ের হাতে গদা, ত্বস্ত্রি মাথার উপরে চাগিয়ে ধরলেন এক বিশাল পর্বত, সূর্যের হাতে উজ্জ্বল রশ্মি, মৃত্যু হাতে নিলেন কুঠার, আর্যমনের হাতে কন্টকিত মুগুর, মিত্র নিলেন তাঁর চক্র। পুষ, ভাগ ও সবিতৃ প্রচন্ড রাগে ছুটে গেলে কৃষ্ণার্জুনের দিকে খোলা তরবারি নিয়ে। তাঁদের সঙ্গ নিলেন রুদ্র, বসু, মরুত, বিশ্বদেব ও সাধ্য নানা অস্ত্রের ঝনঝনানিতে আকাশ বাতাস উত্তাল করে। সমস্ত জীবের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল সম্ভাব্য লয়ের আশঙ্কায়।

কৃষ্ণার্জুন হাতে তির ধনুক স্থির করে অপেক্ষা করছিলেন দেবতারা নিকটে আসা অবধি। অপরাজেয় দুই বীর তাঁদের তাড়া করে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া করে তবে থামলেন। তাঁরা অচিরে দেবরাজের আশ্রয় নিলেন। যতো মুনি এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিলেন সব্বাই

চমৎকৃত হলেন নর- নারায়ণের পৌরুষে। স্বয়ং শক্র (ইন্দ্র) দারুণ সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু পর মূহুর্তেই নতুন আঘাতে ব্যস্ত করে তুললেন বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে। অর্জুনের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য তিনি শুরু করলেন তীব্র পাথর বর্ষণ। সব্যসাচী অনায়াসে ক্ষিপ্র তিরন্দাজিতে লন্ডভন্ড করে দিলেন সেই আক্রমণ। তখন ইন্দ্র মন্দার পর্বতের একটি চূড়া ভেঙে ছুঁড়ে দিলেন অর্জুনের দিকে। বেগবান অগ্নিবাণে সেই চূড়াকেও খন্ডবিখন্ড, চূর্ণ- বিচুর্ণ করে দিলেন সব্যসাচী। আকাশ থেকে ঝরে পড়া জ্বলন্ত সেই পাথরের টুকরো দেখে মনে হতে লাগল যেন সূর্য, চাঁদ আর সমগ্র তারামণ্ডল বুঝি ঝরে পড়ছে।

এই প্রচণ্ড যুদ্ধের আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে জঙ্গলের যত হাতি, ভালুক, রাক্ষস, পিশাচ, দানব হুটোপাটি করে পালাতে গেল। তাতে কিছু মারা পড়ল হুতাশনের দহনে। কিছু দাহ হলো বাসুদেবের সুদর্শনে ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরে। বাদ পড়ল না পাখি, নাগও। দেবলোকের বাসিন্দারা যখন বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণার্জুনের বীরত্বের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে না, তখন তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন। দেবরাজ খুশিতে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানালেন কৃষ্ণার্জুনকে। তখন এক দৈববাণী হলো, "হে ইন্দ্র, আপনার বন্ধু তক্ষক খান্ডব দহন শুরু হওয়ার আগেই কুরুক্ষেত্রে রওয়ানা দিয়েছিলেন। তিনি এই মূহুর্তে জীবিত ও সুরক্ষিত। কৃষ্ণার্জুনের সাথে যুদ্ধে কেউ জিততে পারবে না। তাঁরা অপরাজেয় এবং আপনি জানেন তাঁদের পৌরুষ ও বীরত্বের কথা। তাঁরা সমগ্র দেবলোক, অসুর, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, গন্ধর্ব ও নাগেদের সমীহ ও সম্মানের দাবিদার। খান্ডব দহন তো ভবিতব্য মাত্র!"

বাণীতে তুষ্ট দেবরাজ ফিরে গেলেন স্বর্গে। তাঁর সঙ্গে গেলেন সমগ্র দেবলোকের দেবতা ও সেনানী। এতে প্রচন্ড খুশি অর্জুন ও কৃষ্ণ সিংহনাদ হাঁকলেন। তারপর বাকি যত পাখি, হাতি, শেয়াল ছিল খান্ডব বনে সবার প্রাণ গেল অর্জুনের বাণে। তাদের প্রাণহীন দেহ আহুতি হলো অগ্নিগর্ভে। যত রাক্ষস আর পিশাচ ছিল তাদের প্রাণ গেল জনার্দনের সুদর্শন চক্রে। তারপর তাদের দেহও আহুতি হলো হুতাশনের গহনে। এইভাবে প্রচুর রক্ত, মজ্জা, চর্বিতে পুষ্ট হয়ে আগের হারানো তেজ ফিরে পেলেন অগ্নি।

এর মধ্যে কৃষ্ণ দেখলেন ময়দানব ছুটে পালাচ্ছে খান্ডব বন ছেড়ে। অগ্নি বায়ুর সাহায্যে জটাজুটধারী ঋষির চেহারায় মেঘগর্জনে ধাইলেন সেই অসুরের দিকে তাকে

গিলে খাবেন বলে। পাশে সুদর্শন চক্র হাতে শ্রীকৃষ্ণ। ময়দানব হেঁকে বললেন, "হে অর্জুন, আমাকে বাঁচাও।" অর্জুন নামুচি অসুরের ভাই ময়দানবকে অভয় দিলেন। অগ্নিও তাই তাকে ছেড়ে দিলেন।

কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে অগ্নি পুড়িয়ে খাক করে দিলেন খান্ডব বন। রক্ষা পেলেন ছয় আবাসিক – অশ্বসেন, ময়, আর চার সার্ঙ্গক।

(চলবে)

টাইটেল ছবিঃ ইন্দ্রশেখর
ভেতরের ছবিঃ শিমুল

কাজুমার প্রতিশোধ (প্রথম পর্ব)

মূল সংগ্রহঃ বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ডের 'টেলস অব ওল্ড জাপান'।
বাংলা ভাষান্তরঃ সংহিতা

কথায় বলে, যে তলোয়ারের জোরে বাঁচে, তলোয়ারেই তার মৃত্যু হয়। তখন জাপানে একশ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর অস্ত্র ছিল। তাদের মোটেই বাঁধা আইনে শাসন করা যেত না। ফলে ঝগড়া, মারপিট নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেগুলো প্রায় রোজই রক্তারক্তি এমনকি মৃত্যুতে শেষ হতো। কেবল সেকালের এডিনবরার সাথেই বোধ হয় এই ইয়েডো বা কিয়োটোর তুলনা চলে।

অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়ে ছিল যে তলোয়ারই সামুরাইয়ের সেরা সম্পত্তি হয়ে উঠেছিল। তলোয়ারই তার সঙ্গী আর বন্ধু, আক্রমণের ও আত্মরক্ষার। কোনো কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি যে তলোয়ার কোমরে বাঁধতেন হাতল ছাড়া তার পাতের দামই পড়ত ছশো থেকে হাজার রিয়ো। হাতলের ধাতুতে নকশা কাটা থাকত বলে তার দামটাও যথোপযোগী হতো। তবে নামজাদা কামারের তলোয়ার বেশি দামী হতো। তলোয়ারগুলো বংশপরম্পরায় বাবার থেকে ছেলেরা পেত। কারো কারো তলোয়ারটাই হতো তার অস্তিত্বের অহঙ্কার।

শগুনদের শেষ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়েয়াসু একটা পরম্পরাপত্র লিখেছিলেন তাঁর উত্তরপুরুষদের জন্য। তাতে মূলত সম্রাট ও পারিষদদের নিয়মে বাঁধার জন্য কতকগুলো আইন বানিয়েছিলেন তিনি। সেই পরম্পরাপত্রেরই এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, "সামুরাইয়ের আত্মা থাকে তার কোমরে বাঁধা তলোয়ারে। কোনো সামুরাই তাঁর তলোয়ারের মর্যাদা ভুলে গেলে যথাবিধি ব্যবস্থা নিন; এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।"

তলোয়ার বানানোর কাজটাও বেশ সম্মানের ছিল। কারণ এটা বানানোর বিশেষ কায়দা ছিল। একেক কামারের একেক রকম ছাপও ছিল। তলোয়ারের মালিকানার মতো তলোয়ার তৈরির কাজটাও ছিল বংশগত পেশা। ফলে একটা তলোয়ারে কামারের ছাপও ঐতিহ্যবাহী এক পারিবারিক ইতিহাসের প্রতীক। এজন্য বেশ কিছু কামার আবার পয়সার বিনিময়ে নামীদামী কামারের ছাপ নকলও করত। তাই ছিল তলোয়ারের গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা। শোনা যায় যে একটার ওপর আরেকটা রাখা পরপর তিনটে মৃতদেহকে সত্যিকারের ঐতিহ্যবাহী গুণসম্পন্ন তলোয়ার এক কোপে কেটে ফেলতে পারত। এই পরীক্ষাটা করা হত মৃত্যুদণ্ডে মৃত অপরাধীদের

ওপর। পরীক্ষাটা করত রাজজল্লাদরা। ফলে অল্প কিছু ঘুষের বিনিময়ে তারা অনেক সময়েই সাধারণ কর্মচারীর সাধারণ তলোয়ারকে তার নিয়োজকের ঐতিহ্যমণ্ডিত তলোয়ার বলে জানাত। যদিও গৃহহীন ভিখারি বা পথের কুকুরের ওপরেও গুণ্ডারা যখন তখন যেখানে সেখানে পরীক্ষা করত তাদের তলোয়ারের ধার, তবুও এই কাজটায় রাজজল্লাদরা বেশ মোটা পারিশ্রমিক রোজগার করত।

প্রায় তিনশো বছর আগে ইনাবা প্রদেশের অধিকর্তা ছিলেন ইকেদা কোনাইশোয়ু। তাঁর অধীনস্থ দুই সম্ভ্রান্ত প্রজা ছিলেন ওয়াতাবি ইয়েকুয়ি এবং কাওয়াই মাতাজায়িমন। এঁদের ছিল খুব ভাব। প্রায়শই একে অপরের বাড়িতে যেতেন একসাথে সময় কাটাবেন বলে। একদিন যখন মাতাজায়িমনের বাড়িতে বসে দুজনে গল্প করছিলেন তখন হঠাৎ করেই ইয়েকুয়ির চোখ পড়েছিল তাকে রাখা একটা তলোয়ারে। তিনি কৌতুহল চেপে না রেখে বন্ধু মাতাজায়িমনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, "এটা তুমি কী করে পেলে হে?" মাতাজায়িমন বললেন, "তুমি তো

জানো যে যখন রাজা ইকেদা, রাজা তোকুগাওয়া ইয়িয়াসুকে তাড়া করছিলেন নাগাকুদেতে লড়াই করার জন্য, তখন রাজা ইকেদার দলে ছিলেন আমার বাবা। তিনি এই তলোয়ারটা নাগাকুদের যুদ্ধক্ষেত্রে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।" ইয়েকুয়ি এবার জানালেন, "আমার বাবাও গিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তবে তিনি নিহত হয়েছিলেন। তখন এই তলোয়ারটা খোয়া গিয়েছিল। এটা আমাদের বংশের বহু প্রজন্মের উত্তরাধিকার। এটা আমার কাছে দারুণ দামি। আমি আশা করি যে যদি এই তলোয়ারটার তোমার কাছে বিশেষ গুরুত্ব না থাকে তবে তুমি এটা আমাকে দিয়ে দেবে।" মাতাজায়িমন বললেন, "এ তো সামান্য কথা, না হলে আর আমরা বন্ধু কিসের! নিয়ে যাও ওটা।" ইয়েকুয়ি তলোয়ারটা নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলেন পূর্বপুরুষের স্মৃতি বলে।

পরের বছরের শুরুর দিকে মাতাজায়িমন অসুস্থ হয়েছিলেন। সেই অসুখেই তিনি দেহ রাখেন। বন্ধুবিয়োগে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন ইয়েকুয়ি। তিনি বেশ চিন্তায়ও ছিলেন এই ভেবে যে মাতাজায়িমন বংশের তলোয়ারটা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে যেমন মহানুভবতা দেখিয়েছেন তার প্রতিদানে তিনি কী দেবেন। তাই তিনি মাতাজায়িমনের বাইশ বছরের ছেলে মাতাগোরোকে নানাভাবে প্রচুর সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাতাগোরো মোটেই তাঁর বাবা মাতাজায়িমনের মতো উদার ছিলেন না। তাঁর মনটা ছিল সংকীর্ণ ও কুচুটে, স্বভাবটাও ছিল ইতর। তিনি মনে মনে বেশ অখুশি হয়েছিলেন তাঁর বাবা ইয়েকুয়িকে তলোয়ারটা দিয়ে দেওয়ায়। তাই তিনি সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগলেন যে ইয়েকুয়ি কখনই তাঁদের পরিবারকে মাতাজায়িমনের উপহারের তুল্য কিছুই উপঢৌকন দেন নি। এর ফলে ইয়েকুয়ি রাজদরবারে কৃপণ ও সংকীর্ণমনা বলে বেশ দুর্নাম কুড়োলেন।

ইয়েকুয়িরও বছর ষোলো বয়সের একটি ছেলে ছিল। তার নাম ছিল কাজুমা। সে ছিল রাজপুত্রের সাম্মানিক অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্য। একদিন সেই অশ্বারোহী বাহিনীরই একজন বন্ধু কাজুমাকে বলেছিলেন, "মাতাগোরো তো চতুর্দিকে বলে বেড়াচ্ছে যে তোমার বাবাকে সে একটা দারুণ তলোয়ার দিয়েছে আর তার বদলে তোমার বাবা তাকে কিছুই নাকি দেন নি। তাই নিয়ে লোকেরাও নানা কানাঘুষো শুরু করেছে।" শুনে কাজুমা বলেছিলেন, "সত্যিই। আমার বাবাকে মাতাগোরোর বাবা একটা তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন। সেটা ওঁদের মধ্যের বন্ধুত্বের স্মৃতি হিসেবে বাবা রেখে দিয়েছেন। তার বদলে ওঁদের কিছু টাকাকড়ি উপহার দিয়ে আমার বাবা ওঁদের অপমান করতে চাননি। তার বদলে আমার বাবা ওঁদের মহানুভবতার প্রতিদান করেন উপকার দিয়ে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে মাতাগোরো টাকাই চায়।"

কাজের শেষে বাড়ি ফিরে কাজুমা যা শুনেছিল বন্ধুর কাছে সে সবই তার বাবাকে জানিয়েছিল। তারপর খুব করে অনুরোধ করেছিল বাবা যেন উপযুক্ত উপহার পাঠিয়ে দেন মাতাগোরোকে। ইয়েকুয়ি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "তোমার বয়স অল্প। তুমি ঠিক বুঝবে না

এসব ব্যাপারে ঠিক কী রকম ব্যবহার করা উচিৎ। মাতাগোরোর বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাই আমাকে আমার পূর্বপুরুষের তলোয়ারটা নির্দ্বিধায় দিয়েছিলেন। আমিও তাঁর অকাল মৃত্যুর পরে মাতাগোরোর নানা কাজে সাহায্য করে সেই উপহারের প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিছু টাকা দিয়ে দিলে ব্যাপারটা এখানেই মিটে যায়। কিন্তু আমি বরং এই অভদ্র ছেলেটাকে তলোয়ারটাই ফিরিয়ে দেব। আমাকে আরও অপদস্থ করার কোনো সুযোগই আর ওকে আমি দেব না। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেলামেশার আদব- কায়দা কেই বা জানে না! ”

ইয়েকুয়ি রাগের মাথায় তলোয়ারটা নিয়ে মাতাগোরোর বাড়ি গিয়ে তাকে বললেন, “আমি তলোয়ারটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি আজ।” এই বলে তিনি তলোয়ারটা মাতাগোরোর সামনে রাখলেন। মাতাগোরো বললেন, “সত্যি! আমি বিশ্বাস করি যে আমার বাবা তোমাকে যে উপহার দিয়েছেন, তা তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে আরও দুঃখ দেবে না।” তখন ইয়েকুয়ি অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন যে, “উচ্চবংশের পুরুষেরা উপহারের বদলে প্রথমে উপকার দিয়ে থাকেন, পরে খোলামনে যথাযোগ্য উপহারের প্রতিদান দেন। কিন্তু তোমার মতো লোক যে সহবতের কিছু বোঝে না তার সাথে সহবতের কথা আলোচনা করার কোনো মানে হয় না। তাই আমি ভাবলাম যে তোমাকে তলোয়ারটা ফিরিয়ে দেওয়াই সম্মানের।”

ইয়েকুয়ি এইভাবে মাতাগোরোকে ভর্ৎসনা করায় সে প্রচণ্ড রেগে গেল। সেখানে সেই মূহুর্তে সে ইয়েকুয়িকে মেরে ফেলত, যদি না প্রৌঢ়ত্বেও ইয়েকুয়ি দুর্দান্ত ক্ষিপ্র তলোয়ারবাজ হতেন। সে তক্কে তক্কে রইল ইয়েকুয়ি অন্যমনস্ক হলেই তাঁকে আক্রমণ করবে বলে। ইয়েকুয়ি যেই নিজের বাড়িমুখো হলেন, মাতাগোরো তার সঙ্গ নিল, যেন সে ইয়েকুয়িকে সদর অবধি পৌঁছে দেবে। ইয়েকুয়িও কিচ্ছুটি সন্দেহ করেন নি। কিন্তু মাতাগোরো ইয়েকুয়িরই পারিবারিক তলোয়ারটা দিয়ে তাঁর কাঁধ কেটে দিল। যদিও নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে প্রৌঢ় ঘুরে দাঁড়ালেন কিন্তু প্রচুর রক্তপাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আর সেই সুযোগে মাতাগোরো তাঁকে হত্যা করলেন।

আওয়াজে থতমত খেয়ে মাতাগোরোর মা ভেতর বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছেলের কাণ্ড দেখে তিনি ভয়ে ডুকরে উঠলেন, "মাথাগরম ছেলে কোথাকার! করেছিস কী? তুই একটা খুনি। এবার তোর বাকি জীবন বন্দীদশা। এ কী ভয়ানক কাণ্ড রে!" ছেলে বলল, "আমি এঁকে মেরে ফেলেছি। এখন আর কিছু করার নেই। কথাটা চাউর হওয়ার আগেই চলো পালিয়ে যাই আমরা এখান থেকে।" তার মা বললেন, "আমি পরে আসব। তুই এখন গিয়ে রাজা আবি শিরোগোরোর কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাক। সে হাতামোতোদের একজন মাথাও বটে, আমার পালিতপুত্রও বটে। পালা তার আশ্রয়ে।"

তারপর? ????????? – পরের সংখ্যায়

যাদু চশমা

'যাদুচশমা' গল্পটিতে এই
ফাজিলটি খরগোশ
কোস্‌কার নতুন
কাণ্ডকারখানা নিয়ে।
আমাদের ছোট্ট পাঠকেরা তো
কোস্‌কা আর তার শত্রুমিত্রদের
সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত।
ছবি এঁকেছেন ভ. ইয়াকিভলেভ।

(১) বনে বেড়াতে বেড়াতে কোস্‌কা পেয়ে গেল একটা চশমা। বৈঁচি তুলতে এসে এক খুকি সেটা হারিয়ে ফেলেছিল। কোস্‌কা চশমাটা পরতেই চার-পাশের সবকিছু হয়ে উঠল গোলাপী। ভাবলে, নিশ্চয় এটা যাদু চশমা। বনে এমনটি আর কারও কাছে নেই। এবার সবাই আমায় ভয় করবে।

(২) শেয়াল লারিস্‌কা তার দিকে তাকিয়েই ধপ করে বসে পড়ল অবাক হয়ে — এ আবার কোন নতুন জন্তু? কোস্‌কা খরগোশ গাছের একটা কাটা গুঁড়ির ওপর বসে হাসলে: 'নমস্কার লারিস্‌কা শেয়াল! তোমার লেজ কাঁপছে কেন? ভয় পেয়েছ বুঝি? চিনতে পারছ না আমায়। আরে, এ যে আমি, কোস্‌কা খরগোশ!

(৩) 'চোখদুটো তোমার কেমন যেন।' 'এ আমার যাদু চশমা। আমি এখন সবকিছু আর সবারই ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাই। আচ্ছা বলো তো কেমন তোমার লোমের রঙ?' 'পাট-কিলে।' কোস্‌কা বললে, 'পাটকিলে নয় গো, গোলাপী?' ভয় পেয়ে গেল লারিস্‌কা শেয়াল: 'সে কী, আমার লোম নষ্ট হতে শুরু করল নাকি?'

(৪) 'আমি শুধু তোমার লোম নয়, ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি,' কোস্‌কা বললে, 'যেমন দেখতে পাচ্ছি সকালে প্রাতরাশ সেরেছ দুটি ইঁদুর খেয়ে। দেখতে পাচ্ছি পেটের ভেতর।' কোস্‌কা খরগোশ অবিশ্যি মিথ্যে বললে, কোনো ইঁদুর সে দেখতে পায় নি। সকালে চোখে পড়েছিল যে লারিস্‌কা শেয়াল ইঁদুর খাচ্ছে। লারিস্‌কা বিশ্বাস করলে ওর কথা।

(৫) সরে থাকাই বাপু ভালো, ভেবে লারিস্‌কা সরে গেল কিন্তু দূরে। 'আর কী করতে পারে তোমার চশমা?' 'সব পারে,' বললে কোস্‌কা, 'পারে আকাশকে অন্য রঙে রাঙাতে, সবকিছু জানতে। জানতে চাও কে কী করছে এখন?..

(৬) বীবর বোর্‌কা বাঁধ বানাচ্ছে, ভালুক পতাপ মাছি তাড়াচ্ছে নাক থেকে, কিরিউখা সজারু গুবরে পোকা ধরছে, রেকুন এরোখা গেঞ্জি ধুচ্ছে নদীতে। আর বনের কিনারে এক শিকারী এখন জন্তু-জানোয়ারের পথ খুঁজছে, তোমার চামড়া দিয়ে কলার বানাতে চায়।'

(৭) 'ওহ্, আমি পালাই,' বললে লারিস্কা শেয়াল, 'অনেক বকবক করলাম তোমার সঙ্গে, ওদিকে কত কাজ রয়েছে পড়ে।' 'হ্যাঁ, যাও,' সায় দিলে কোস্কা, 'তবে দেখো, আমার সঙ্গে আর চালাকি মারতে এসো না, মজা বুঝবে।'

(৮) শেয়াল পালাল, খরগোশ কোস্কা গেল আরও এগিয়ে। দেখে খটাশ পাখম তার গর্তের কাছে বসে সুঁইয়ে সুতো পরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। 'নমস্কার পাখম খটাশ, — খরগোশ কোস্কা বললে, 'কী করছ?' 'ভাবছিলাম দস্তানা সেলাই করব, কিন্তু সুতো আর পরাতে পারছি না, চোখ খারাপ হয়েছে গো।'

(৯) 'ভাবনা নেই, এখখুনি পরিয়ে দিচ্ছি' — এই বলে কোস্কা সুঁই নিয়ে সুতো গলিয়ে দিলে তার ফুটোর ভেতর দিয়ে। বাস্! অবাক হল পাখম: 'বাঃ, বাঃ!' 'এ আমার যাদু চশমার দৌলতে, সব ও পাবে।'

(১০) শিগগিরই বনের সবাই জেনে গেল যে কোস্‌কা খরগোশের আছে এক যাদু চশমা — তা দিয়ে বাইরে ভেতরে সবই দেখা যায়, সুতো পরানো যায় সুঁইয়ে, রাঙিয়ে দেওয়া যায় আকাশ, জলকে করে দেওয়া যায় কালি।

(১১) বনের ফাঁকাটায় ছুটে এল ভালুক পতাপ, কাঠবেড়ালি লেন্‌কা, রেকুন এরোখা, হরিণ ফিলিয়া। এমনকি ছুঁচো ক্রতও তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এল যদিও কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। কোস্‌কা পাইন গাছের গুঁড়িতে উঠে মোচে তা দিয়ে বড়াই করলে: 'সবাই আমি দেখতে পাই, সবই দেখি।

(১২) নদীর পারে ট্রাক এখন বিচালি বইছে — দেখতে পাচ্ছি। জাহাজ ভাসছে — সাগরে, মাল্লারা পাটাতন ধুচ্ছে। মহাকাশে রকেট ছেড়েছে, উড়ে যাচ্ছে মঙ্গল গ্রহের দিকে — দেখতে পাচ্ছি।' সবই অবশ্য বানিয়ে বানিয়ে বলছে, কিন্তু যাচাই করবে কে? তাই বিশ্বাস করছিল সবাই।

(১৩) কিন্তু সন্ধে ঘনিয়ে আসতে কোস্‌কার ইচ্ছে হল কিছু খাবে। সে গেল খাবার খুঁজতে। বেশ এক গুছি ঘাস পেলে, দেখতে তো ঘাসের মতোই, কিন্তু কেন জানি সবুজ নয়, গোলাপী। আরেকটা গুছি — সেটাও গোলাপী। ভাবলে, সব ঘাসকেই রোগে ধরেছে। বরং অ্যাস্পেন পাতা চিবানোই ভালো। দেখা গেল অ্যাস্পেন পাতাও গোলাপী।

(১৪) ছুটছে খরগোশ, ছুটছে, সূর্য নেমে এসেছে গাছের চূড়োগুলোর পেছনে, কিন্তু না পেল সে সবুজ ঝাড়, না সবুজ ঘাস, না সবুজ অ্যাস্পেন পাতা। এই সময় পুরনো ওক গাছে ঘুম থেকে জেগে উঠল বুনো প্যাঁচা — সারা দিন সে তো ঘুমোয়, জাগে কেবল রাত্রে। চোখ রগড়িয়ে তাকাল সে, দ্যাখে খরগোশ বসে আছে কাঁদোকাঁদো মুখে।

(১৫) সেম্‌কা প্যাঁচা জিগ্যেস করলে, 'অমন মন ভার কেন গো?' 'কী আর বলব, খিদেয় মরছি, কিন্তু না পাচ্ছি সবুজ ঝাড়, সবুজ ঘাস, সবুজ অ্যাস্পেন পাতা। সবই গোলাপী।' 'বোকা তুমি কোস্‌কা খরগোশ। সবুজ কিছু তুমি কখনোই পাবে না, কেন না নাকে যে চাপিয়েছ গোলাপী চশমা। ওটাই সব রাঙিয়ে দিচ্ছে, ওটা বরং দাও আমায়।'

(১৬) আর কোস্‌কা খরগোশের নিজেরই বিরক্তি ধরে গিয়েছিল চশমায়, ছাল উঠে গেছে নাকের। ভাবলে, দূর ছাই, মোটেই কোনো যাদু চশমা নয়। দিয়ে দিলে চশমা। সেই থেকে তা পরে আসছে সেম্‌কা প্যাঁচা। রাতে বসে থাকে বুড়ো ওক গাছটায় বন ফাটিয়ে চ্যাঁচায়: উ°-উ°-উ°-উ° ! তার মানে বলতে চায়: 'কী খাশা আমার চশমা !'

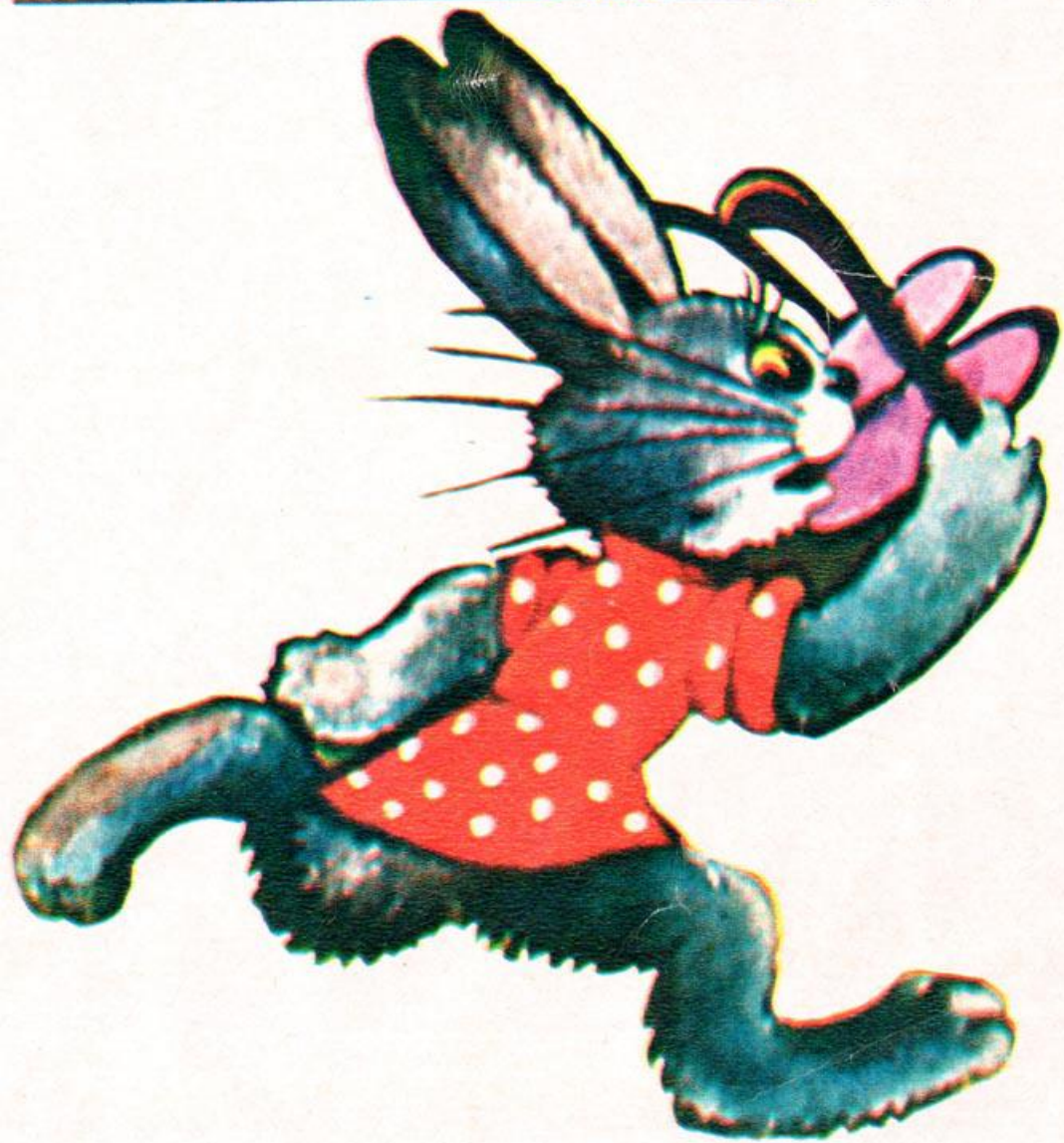

ল্যুক্স—আমার ল্যুক্স

পুরোন সোভিয়েত ইউনিয়নের একখানা ছেঁড়া পাতা সেদিন খুঁজে পেলাম আমাদের পুরনো কাগজের দপ্তরে। সেখানে নাম না জানা এক রাশিয়ান সার্কাসকর্মীর বলা এই কুকুরের গল্পটা ছিল। এ গল্পটা আমি এর আগে কোথাও পড়িনি। তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম।

-- মিখাইল শুইদিন আর আমি যখন সার্কাসে ফরাশ ভূতের ভূমিকায় হাস্যরস উদ্রেকের কাজ শুরু করলাম তখন জাদুশিল্পী ইগর কভালেংকোর কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেলাম। তিনি কুকুরের ভূমিকা সহযোগে আমাদের অনুষ্ঠানটি নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব দিলেন। আমাদের কুকুরটি হল গাঢ় বাদামি রঙের আয়ার্ল্যান্ডিয় সেটার- ল্যুক্স। তার কাজ ছিল অলক্ষ্যে চুপিসারে এসে আমার মাথা থেকে তুপি ছিনিয়ে নিয়ে উইংসের আড়ালে পালিয়ে যাওয়া। আমাদের কোট ও প্যান্টের পকেট নানারকম টুপিতে বোঝাই করে রাখতাম, আর প্রতিবারই চুরি যেতে আমি একএকটা নতুন টুপি বের করে পরতাম। নতুন হাস্যরসের আদত ব্যাপারটা ছিল এই যে, কে আমার টুপি চুরি করেছে তা ঠাহর জকরতে না পেরে আমি আমার সম্পূর্ণ নিরাপরাধ সঙ্গীকে দোষী সাব্যস্ত করছি, আর সে রিঙের ওপর বসে হি হি করে হগাসছে। শেষে কেলেংকারিটা অখন বেশ জমে এসেছে তখনামি আসল চোরকে আবিষ্কার করব।

মনে পড়ে একটা ঘটনা, যা আমাদের সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। শোয়ের সময় আমি সাধারণত ল্যুক্সের দিকে পিঠ করে চেয়ারে বসে থাকতাম। ল্যুক্স সচরাচর উইংসের আড়াল

থেকে চটপট আমার দিকে দৌড়ে আসত এবং এক লাফে আমার মাথা থেকে টুপি ছিনিয়ে নিয়ে সামনের দু পায়ের থাবা দিয়ে আমাকে সজোরে ঠ্যালা মারত। একদিন এইরকম একটা প্রদর্শনীর সময় সহকারীরা আসরে কুকুর ছাড়ার সময় লক্ষ্য করলেন, ল্যুক্স অভ্যাসমত আমার দিকে ছুটে গেল বটে কিন্তু চেয়ারের মিটারদুয়েক আগি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে চেয়ারের পেছনদিকে এগিয়ে এল। তার দুই থাবা রাখল চেয়ারের পিঠে।অথচ সাধারণত সে থাবা রাখে আমার কাঁধের ওপর! এবং, যেন এক ভঙ্গুর পদার্থ, এইরকম ভঙ্গীতে সে সন্তর্পণে আমার মাথা থেকে টুপি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে উইং- এর আড়ালে চলে গেল। আশেপাশের সকলে তো অবাক। কুকুরের কী এমন ঘটল? আসলে যা ঘটেছিল তা এই যে, আমি সেদিন অসুস্থ ছিলাম। এর ক মিনিট আগে অবধি আমার অর্বাঙ্গ তীব্র বেদনায় হয়ে যাচ্ছিল। স্নায়ুমূল প্রদাহ রোগের প্রকোপ! আমি যন্ত্রণা চেপে বসে ছিলাম। আতংকের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম কাঁধের ওপর ল্যুক্সের থাবার আঘাতের। আর কুকুর কোনও এক ব্যাখ্যাতীত অনুভূতিবলে টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমার অবস্থা খারাপ।

ল্যুক্সের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটল অপ্রত্যাশিতভাবে। একদিন রাতে ডিউটিরত সহিস আমাকে ফোন করে জানাল যে ল্যুক্স বিপন্ন। আমি আর আমার স্ত্রী যখন এসে পৌঁছালাম তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী। ডাক্তার ডেকে আনতে যতক্ষণ লাগল ততক্ষণে সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এক কর্মচারী আঙিনা থেকে প্লাইউডের একটা পুরনো তক্তা টেনে নিয়ে এল। তার ওপরে কুকুরকে শুইয়ে দিয়ে গাড়িতে তোলা হল। তক্তাটির ওপর চোখ পড়তেই আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। নোংরা তক্তার গায়ে কালো রঙে আঁকা টুপিও ছড়ি আর গোটা তক্তা জুড়ে লেখা এনগিবারভ!! এটা হল এক বছর আগে যিনি ইহলীলা সম্বরণ করেছেন সেই সং, কুকুরের আগের মালিক লিওনিদ এনগিবারভের প্যাকিং বাক্সের একটা টুকরো!

কে যেন বিষণ্ন সুরে বলল, সব কেমন ওতপ্রোত বাঁধনে বাঁধা। মানুষ ও কুকুর!

দিলীপ রায়চৌধুরী

শ্রাবণ পূর্ণিমার রাত্তির। চারিদিক জ্যোস্নায় একেবারে থৈ থৈ করছে। কোথায় যেন কে গান ধরেছে—"আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।" শুধু, ৭নং প্রফুল্লচন্দ্র স্ট্রিটে তেতলার ছাদের ওপর অধ্যাপক সুশোভনবাবুর মনে এই ফুটফুটে আলোতেও কোন কবিতা জাগছে না। অপলক নয়নে তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন আর ভাবছেন,শতাব্দি ধরে ঐ যে উপগ্রহটি পাক খাচ্ছে ওখানে গিয়ে কী করে একটা মস্তবড় টেলিস্কোপ বসিয়ে ওর ওপর থেকে বিশ্বব্রহ্মান্ড পর্যবেক্ষণ করা যায়। কোলকাতা শহর। পাশের বাড়ির উনুন থেকে ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে। মাঝে মাঝে চোখ জ্বালা করে। বিরক্তিভরে সুশোভনবাবুর হঠাৎ মনে হলো, চাঁদের থেকে গ্রহ তারা দেখবার সময় মানুষকে নিশ্চয়ই এই অস্বস্তি পোয়াতে হবে না। মাথার ভিতর চিন্তার জাল বুনে চলেছে এক অদৃশ্য মাকড়শা। চাঁদের এই অস্বাভাবিক দ্যুতি—কাল কি বৃষ্টি হবে? অবশ্য সুশোভনবাবু বৈজ্ঞানিক! এক জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে চাঁদের যোগাযোগ ছাড়া, ঐসব মানুষের লেখা 'খনার বচন' কি জ্যোতিষঠাকুরদের 'চন্দ্র লগ্নের' ব্যাখ্যা তিনি কানেই তোলেন না। তবু মনটা যেন কিরকম

চঞ্চল হচ্ছে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। আজ রাত্তিরে যে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা যেন অন্য রাত্তিরগুলোর চেয়ে একটু আলাদা।

সুশোভনবাবুর চিন্তা আর থই পায় না। এ যদি অরিয়ন নীহারিকা হোত তবে গ্যাসীয় রাজ্যে এরকম দুঘটনা ঘটা আশ্চর্য ছিল না। অথবা জুপিটার গ্রহের চৌহদ্দিতে এ রকম বিস্ফোরণ বিরল নয়। এমন কি অমন যে চেনা পৃথিবীর বাইরে থেকে ক্রিসমাস আইল্যান্ডের হাইড্রোজেন বোমা ফাটানোর পরীক্ষা দেখলে যে কোনও অন্য গ্রহবাসী এক মারাত্মক ব্যাপার বলে ভুল করতে পারে। কিন্তু ধূসর চাঁদ যে একেবারে মৃত প্রেতপুরী। সেই বন্ধ্যা মাটির ঘুম ভাঙালে কে? চাঁদের জগতের হাঁড়ি- হদ্দ নাড়ি- নক্ষত্র বৈজ্ঞানিকদের জানতে আর বাকি নেই। পৃথিবীর উত্তর মেরুর পুরো খবর পাবার আগেই মানুষ চাঁদের উত্তর মেরুর সব খবর পেয়ে গেছে। অষ্ট্রেলিয়া কি আফ্রিকার দুর্গম রাজ্যের সব খবর মানুষ এখনও না জোগাড় করে থাকলেও সেই কেপলারের আমল থেকেই চাঁদের গিরি- গুহা- কন্দরের ইতিবৃত্ত পাতার পর পাতা লেখা হয়ে গেছে। তখন কি- ই বা সম্বল ছিল মানুষের? কেবল গোটাকতক টেলিস্কোপ। আর আজ! মহাকাশভ্রমণের কতো সুবন্দোবস্ত হয়েছে।

এই সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল রাশিয়ানরা ৮৬০ পাউন্ড ওজনের একটা ক্যাপসুল চাঁদের উপর নামিয়েছে। তারপর ওদের তিন নম্বর ল্যুনিক চাঁদের ওপিঠের সব ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। তবে কি ওরা চাঁদে এর মধ্যেই লোকলশকর নামিয়ে ফেলেছে? এখানে না হয় আমেরিকানদের সঙ্গে পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার চুক্তি করেছে তা বলে কি সে চুক্তি অন্য গ্রহ উপগ্রহেও বলবৎ থাকবে? ঐ যে অস্বাভাবিক জ্যোতি- ওটা কি চাঁদে রাশিয়ানদের পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফল! যদি নেমেই থাকে তবে এতক্ষণে ওরা টেলিভিশন ক্যামেরা লাগিয়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের যা ছবি নিয়ে ফেলেছে তাতে কাল সকালে কলকাতায় বৃষ্টি হবে কিনা এখন হয়তো মস্কো বেতারের রাত্রিকালীন অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে ঘোষণা করতে আরম্ভ করবে।

রাত অনেক হলো। দূরে কোথায় পাড়ার একটা কুকুর একবার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর আবার নিশুতি নিস্তব্ধ রাত্তির, গলির মোড়ের গ্যাসের বাতিগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। কোথায় যেন ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ... সুশোভনবাবুর একবার মনে হল উঠে ঘরে গিয়ে শোবেন। কিন্তু কানের কাছে ভেসে আসছে একটানা টারবো জেটের আওয়াজ শিঁ- ই- ই- ই.....

আর তারপরই শোনা গেল কে যেন তাঁকে বলছে মৃদুস্বরে, "স্যার উঠতে পারবেন তো?আমরা পৌছে গেছি- "

স্পেসস্যুটের গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সুশোভনবাবু বললেন, "আই অ্যাম অলরাইট অমরেশ! আমাদের যন্ত্রপাতির প্যারাসুটটা এখনো পৌঁছায়নি দেখছি। এ্যান্টিগ্রাভিটি সিগমাটা তবে কি ফাংশান করছে না?"

অমরেশ সুশোভনবাবুর আতি প্রিয় ছাত্র এবং সেই সঙ্গে মহাকাশবিজ্ঞানের একজন নামকরা স্কলার। অক্সিজেন মাস্কটা ঠিক করে নিতে নিতে সে বললে "স্যার, আমাদের

আয়েঙ্গারের কষা অঙ্ক শিকাগোর ভ্যারিয়াক ইনস্টিট্যুট মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ও ভুল হবার নয়। ঐ তো ওখানে ধুলোর মধ্যে কি যেন উকি মারছে!"

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সব যন্ত্রপাতি উদ্ধার হলো। চারিদিকে ধুলো আর ধুলো— একেবারে সমুদ্রের মত। ফাঁকা, নিস্তব্ধ। যেন মৃতের রাজ্য। হাওয়া নেই একেবারেই। অমরেশ পকেট থেকে পিস্তল বার করে একবার ওপরের দিকে ট্রিগার টিপলে – কোনও শব্দ হোল না। বাতাস না থাকলে শব্দতরঙ্গ আসবে কোথা থেকে। অক্সিজেন- প্রেসার দেওয়া নলের মধ্যে দিয়ে ট্রানজিস্টার সেটের মারফত কথা না বললে ওঁদের এখানে বোবা কালা হয়ে থাকতে হত। এখন দিনের বেলা অসহ্য গরম। প্রায় একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

সুশোভনবাবু বললেন, "পৃথিবীর হিসাবে দু'সপ্তাহ এইরকম রোদে পোড়া দিন থাকে। তবে ভাগ্যক্রমে আমাদের রোদ্দুরে পুড়তে হবে আর চব্বিশটি ঘন্টা। তারপর রাত নামলে অসহ্য শীত; শূন্যের তলায় পারা নেমে যাবে ২৪৩ ডিগ্রি। এই অবস্থায় কাটবে আরও দু সপ্তাহ। যদি ধুলোর তলায় ঢোকা যায় তাহলে এই শীত কি গ্রীষ্মের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তবে চিন্তা করার কিছু নেই। আমাদের স্পেস- সুটের এসব সহ্য করবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে হে!"

হঠাৎ অমরেশ চেচিয়ে উঠলো- "সরে আসুন, শিগগির সরে আসুন স্যার। কোথা থেকে কারা যেন আমাদের গুলি করছে। অজস্র অগ্নিবর্ষী বুলেট ছুটে আসছে।"

হো হো করে হেসে উঠলেন সুশোভনবাবু, "আরে ওগুলো ছুটন্ত উল্কাপিন্ড মাত্র। আমাদের স্পেস সুটের ভেতর সিলিকা লাইনিং দেওয়া আছে ওগুলো থেকে বাচঁবার জন্য।"

ধীরে ধীরে সুশোভনবাবু যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে চাঁদের ধুলোর ওপর দিয়ে চলবার উপযোগী ভাঁজ করা বিশেষ ধরনের 'হোভারক্রাফট' খানা বার করে লাগিয়ে ফেললেন। গাড়িখানা বেশ ভাল। ডাঙায় চলে, জলেও চলে, তবে ডিজাইন অনুযায়ী চাঁদের ধুলোর ওপরই সব চেয়ে ভাল চলবে। গতি ঘন্টায় প্রায় পাঁচশো মাইল। সুশোভনবাবু হিসেব করে দেখেছেন আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে চাঁদে সন্ধ্যা নামবে কারণ প্রায় শেষভাগে ওঁরা এসে নেমেছেন এখানে। বিকেল বেলাটায় গরম বেশি লাগছে। সন্ধ্যা নামলেই ঠান্ডা পড়লে ওঁরা বেরিয়ে পড়বেন চাঁদের আগ্নেয়গিরির দিকে এবং তারপর হয়তো উদঘাটিত হবে ঐ বিস্ফোরণের রহস্য।

অচেনা অজানা এই বিদেশ বিভুঁয়ে বেশিক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখা চলে না। খুব তাড়াতাড়ি ম্যাপের সঙ্গে গোটাকতক জায়গা মিলিয়ে নিতে হবে বেরিয়ে পড়বার আগে। কারণ তা না হলে ফিরে আসার সময় মুশকিল হবে। অবশ্য এই সব পাহাড়পর্বত, উপত্যকা আগে এতবার করে ম্যাপে ওঁরা দেখেছেন যে পথঘাট সবই চেনা। কতবার টেলিস্কোপে দূরের ওই পাহাড়ের কোলের ছায়াখানি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখেছেন দুজনে। যদিও ত্রিশ মাইল লম্বা ঐ উপত্যকাটা পৃথিবী থেকে সব চেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপেও দেখায় একটা বিন্দুর মত। দিগন্তে অসংখ্য আগ্নেয়গিরির চূড়া দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে কিছু মৃত আগ্নেয়গিরি দেখেছেন সুশোভনবাবু। কিন্তু এরকম বিরাটাকার শত শত নির্বাপিত আগ্নেয়পর্বত দেখলে কি বিচিত্র এক অনুভুতি হয়। কে জানে কিভাবে ওদের জন্ম হয়েছিল! উঁচু উঁচু গির্জা- ক্যাথিড্রালের মতো দেওয়ালগুলো খাড়া উঠে গেছে।

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ নেই বললেই চলে। অতবড় গাড়িখানা পাহাড় পেরিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে অমরেশের কোনই কষ্ট হচ্ছে না। এছাড়া অন্যান্য ভারি যন্ত্রপাতিগুলো সুশোভনবাবুর কাঁধে। চড়াই- উতরাই পেরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়লেন একটি ছোট আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি। ভেতরে তাকালে দেখা যাবে সুদুর অতীতে ফাটলের মধ্যে দিয়ে লাভার স্রোত বেরিয়ে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে জমে অতিকায় স্তম্ভের সৃষ্টি করেছিল। খুব ভাল করে লক্ষ করে সুশোভনবাবু বুঝতে পারলেন, দেখতে ছোট হলেও চাঁদের এই আগ্নেয়গিরি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর যে কোন বড় আগ্নেয়গিরির চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে সুশোভনবাবু চেরেনকভ কাউন্টারটা বার করলেন। গহ্বরের ভেতরে যন্ত্রের এই গণনা থেকে হয়তো বোঝা যাবে কোন দুরাগত উল্কাপিন্ডের আঘাতে এই আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়েছিল কিনা। ঠিক তাই! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সহস্র সহস্র বছর আগে কবে যেন মহাকাশ থেকে একটা উল্কাপিন্ড ঢুকে গিয়েছিল চাঁদের বুকে। তারপর সেই উত্তপ্ত পিন্ড ভেতরকার মাটিকে গ্যাস করে দিল। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল বিস্ফোরণ প্রচন্ড বেগে।

কালিঢালা রাত্রি নামল ধূসর ঠান্ডা চাঁদের বুকে। এখন হোভার ক্রাফটে চড়ে ওঁরা বেরালেন মূল রহস্যের সন্ধানে। চাঁদের ব্যাস ২১৬২ মাইল । পুরো রাজ্যটা ঘুরতে পৃথিবীর সময়ে ঘন্টা আটেকের বেশি লাগা উচিৎ নয়। গাড়ির পাশ দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে জোনাকির মত ছুটে চলেছে অসংখ্য ছোট ছোট উল্কাপিন্ড। তলায় অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে সহস্র সহস্র আগ্নেয়গিরির গহ্বর। কোথাও কোথাও দেখা যায় সরু ফিতের মত রশ্মিরেখা। হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে সুশোভনবাবু বললেন “বুঝলে হে অমরেশ, ওগুলো প্রায় নিভন্ত আগ্নেয়গিরির তেজস্ক্রিয় ছাইয়ের স্তুপ। অবশ্য গতবছর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমার বন্ধু জাপানি বৈজ্ঞানিক নিশিহারা বলেছিলেন ওগুলো আকরিক উল্কার অবশেষ মাত্র।” অমরেশ গভীর মনযোগ দিয়ে তখন তীব্র সুদুরপ্রসারী আলো ফেলে চাঁদের পর্বতমালার সঙ্গে পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপে তোলা কতগুলো ফটো মিলিয়ে দেখছিল। দূরে দেখা যাচ্ছে মাউন্ট হুইগেনস- যেন বিশ্বাস হতে চায় না, এত কাছে। সুশোভনবাবুর কথায় ওর সম্বিত ফিরলো। লজ্জিতভাবে বললো, “হ্যাঁ স্যার। আমি কিন্তু বরাবরই ভাবতাম গুঁড়ো ধুলোর আলোক প্রতিফলন ক্ষমতা খুব বেশি। কাজেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলো পড়লে তা ওভাবেই দেখা দেবে।”

পথ যেন আর ফুরোয় না। হোভারক্রাফটের তলা দিয়ে সরে গেল অসংখ্য পাহাড়ের শ্রেণী- পৃথিবীর চেনা পর্বতগোষ্ঠীর নামেই তাদের নাম- পিরেনিজ, এপেনাইন, কার্পেথিয়ান এবং সবশেষে ককেশাস। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো; চেনা ম্যাপের রাজ্য ফুরিয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন ওঁরা এসে পড়েছেন রাশিয়ানদের ফটো তোলা চাঁদের অদেখা পাশটিতে। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা এই সেদিন পর্যন্ত জোর গলায় বলেছে থিওরি অনুযায়ী এদিকটাতে নিশ্চয়ই অনেক বেশি গিরি- গুহা- কন্দর- আগ্নেয়গিরি আছে- কতকটা মানুষের মুখে বসন্তের দাগের মত ঘন। কারণ, ছুটন্ত উল্কার ঝাপটা ওপাশেই বেশি। এই নিয়ে গতবছর সানফ্রানসিস্কোর আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে মার্কিনি প্রফেসর খারাশের সঙ্গে কত তর্কই না করেছেন। আমেরিকানরা গলাবাজি করে নিজেদের কথা প্রমাণ করতে চাইছিল। সুশোভনবাবু কিন্তু বরাবর

বলে এসেছেন যে চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো সেদিকটাতে মাধ্যাকর্ষণ বেশি আছে। তাই পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে গুহা উপত্যকা। তাই উল্টোদিকটা নিশ্চয় মসৃণ হবে। রাশিয়ার অধ্যাপক মিখাইলভ তিন নম্বর লুনিকের তোলা টেলিভিশনের ছবি দিয়ে যখন সুশোভনবাবুকে সমর্থন করলেন, খবরের কাগজে বাঙালি বৈজ্ঞানিকের প্রশংসার ঢেউ উঠেছিল। আর আজ প্রফেসর খারাশ যদি সঙ্গে থাকত!

"স্যার এই মিখাইলভের নাম দেওয়া মেছতা সাগরের দিকটাতে তাকিয়ে দেখুন তো- কিছু কি দেখা যাচ্ছে?"

অমরেশের কথায় ওঁর চিন্তার জালে ছেদ পড়লো। ভাল করে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন ছোট ছোট তারার বিন্দু। হোভারক্রাফটের গতি বাড়িয়ে দিলেন সুশোভনবাবু। খুব তারাতাড়ি মস্কো সাগর পাড়ি দিয়ে মেছতা সাগরের আরো কাছাকাছি এসে মনে হল যেন অসংখ্য স্ফটিকের স্তম্ভ । তারপর আরো কাছে—

"মাই গড, প্লুটোনিয়ান!" নিমেষে অমরেশের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। গ্রহান্তরবাসীদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তায়, বৈজ্ঞানিক কৌশলে এবং সেই সঙ্গে হিংস্রতায় এদের আর জুড়ি নেই। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের এ সম্বন্ধে সন্দেহ ও বিতর্কের অবসান ঘটেছে। আগে মার্শিয়ানদের সম্বন্ধে ভয় ছিল কিন্তু প্লুটোনিয়ানদের বিভীষিকায় এয়ার কন্ডিশান করা স্পেসস্যুটের মধ্যেকার দুঃসাহসীদের মেরুদন্ড বেয়ে ঠান্ডা ঘামের স্রোত বইতে লাগলো।

"শিগগির রেডিওএক্টিভ ব্যারিয়ার শিল্ডটা বার করবার বন্দোবস্ত করো। বোঝাই যাচ্ছে, ওরা নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশানের জন্য রেডি হচ্ছে। কুইক! দেরি হলে চাঁদের ধুলোয় মিশিয়ে দেবে," উত্তেজনায় সুশোভনবাবুর গলা থর থর করে কাঁপছে। নিমেষে হোভারক্রাফটখানা পুবমুখো ঘুরিয়ে নিলেন। রিয়ারভিউ আয়নাখানায় তখনও ভাসছে স্পষ্ট ছায়া- উজ্জল ছুটতারার মত ক্ষিপ্র, চঞ্চল, অসংখ্য চলমান স্ফটিক স্তম্ভ।

বিশগজ যেতে না যেতেই চোখধাঁধানো আলোয় চারিদিক ভেসে গেল। কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল অজস্র আগ্নেয়গিরির লাভা। ফুল স্পিডে চলছে হোভারক্রাফট।

"ফলআউট শুরু হবার আগে আমাদের পালাতেই হবে স্যার! এভাবে জতুগৃহে পুড়ে মরতে পারবোনা। ফুল থ্রটাল চালান।"

"তুমি কন্ট্রোলটা নাও অমরেশ। আমি রেট্রোরকেটগুলো রেডি করি। আমাদের সময় নেই আর। এখন তৈরি না হলে এখান থেকে পাড়ি দেওয়া যাবে না।"

কিন্তু একি? থর থর করে কেঁপে হোভারক্রাফট খানা মন্থর হয়ে এল। কন্ট্রোল- না কন্ট্রোল তো ঠিকই আছে। ফিউয়েল – না যথেষ্টই আছে। তবে , তবে কি-- হঠাৎ মনে পড়ে গেল-

"আমরা প্লুটোনিয়ানদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডে বন্দি অমরেশ! শিগগির অঙ্ক করে বার করতে হবে কিভাবে ডিগাউসিং করা যাবে। কিন্তু কিন্তু পেছনে ওটা কী।"

আয়নায় ছায়া পড়েছে । সেই স্ফটিক। প্রথমে ২০০ গজ দূরে, তারপর তড়িৎগতিতে ছুটে আসছে ওদের ক্রাফটের দিকে। সেকেণ্ড, মিনিটগুলো যেন মাস ও বছর। ক্যালকুলেটিং মেশিন

যেন আর চলে না। এ রাতও ফুরোবে না । ওদিকে স্ফটিক এগোচ্ছে যেন আলোর গতিতে। হোভারক্রাফট ছোঁয় ছোঁয়।

লাফিয়ে উঠলেন সুশোভনবাবু। "কুইক অমরেশ। স্টার্ট ডিগাউসিং। আই হ্যাভ গট দি ফরমুলা।"

উর্ধশ্বাসে হোভারক্রাফট ছুটলো। পাহাড়গুলো পেরোতে পারলেই লঞ্চিং প্যাড বসানোর জায়গা পাওয়া যাবে । আর একবার পৃথিবীমুখো রকেটে চড়ে বসতে পারলেই ... কিন্তু সে চেষ্টা করতে ওরা দেবে কি?

চাঁদের মরা রাত্তিরে রকেটের চোখ- ঝলসানো আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই স্ফটিকের মধ্য দিয়ে প্লুটোনিয়ান্দের গামা রে চোখ ! সামান্যই দূরে।

এক্স- মাইনাস টু- এক্স- মাইনাস ওয়ান। টেক অফ- শিঁ- ই- ই...

"বাবু, ও বাবু। বৃষ্টি পড়ছে যে! ঘরে গিয়ে শোবেন চলুন।"

একি! সুশোভনবাবু ভাবলেন, ও কে? চাকর মহেশ না ছদ্মবেশী প্লুটোনিয়ান? চোখ রগড়ে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত আড়াইটে । কখন জ্যোৎস্না হারিয়ে গেছে মেঘে। এখন বৃষ্টির নুপুর বাজে- টুপ- টাপ।

শারদীয় তরুণতীর্থ ১৩৭০

লেখকের কন্যা শ্রীমতি যশোধরা রায়চৌধুরীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

টাইটেল ছবিটি এঁকেছিলেন লেখকের স্ত্রী শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরী।

দ্বিতীয় ছবিটি এঁকেছেন দীপংকর

স্মরণীয় যাঁরা

বাংলাদেশের জিম করবেট -পচাব্দী গাজি।

উমা ভট্টাচার্য

পচাব্দী গাজির কথা আমি সেদিন অবধি জানতাম না। এরকম হয়তো অনেকেই জানেনা। আসলে সুন্দরবনের বাঘশিকারির খবর দেশের মানুষ বিশেষ রাখেনা, যাঁদের শিকারে উৎসাহ আছে বা বনভ্রমণের নেশা আছে তাঁরাই কেবল এই সাধারণ মানুষদের খবর রাখেন। দেশে দেশে জঙ্গল ভ্রমণকারীরা এঁদের সাহায্য নেন, তাই খবর রাখেন এঁদের। এঁদের খবর সাধারণ মানুষের নজরে আসে বিদেশীদের লেখা থেকে।

এরকমই একজন দুর্ধর্ষ বাঘশিকারি ছিলেন পচাব্দী গাজি। অধুনা বাংলাদেশের সুন্দরবনের কাছাকাছি সাতক্ষীরা জেলার গাবুরা গ্রামের বাঘশিকারি গাজি পরিবারের সন্তান ছিলেন আব্দুল হামিদ গাজি- যিনি পচাব্দী গাজি নামেই প্রসিদ্ধ। একবার কয়েকজন বিদেশী শিকারি আসেন বাংলাদেশের সুন্দরবনে বনভ্রমণ ও বাঘশিকার করতে। আর আসেন কিছু কূটনীতিক আর সাংবাদিক। পৃথিবীর হিংস্রতম বাঘেদের বাসভূমি সুন্দরবনে স্থানীয় কোন অভিজ্ঞ বাঘশিকারি গাইডের অবশ্যই প্রয়োজন হয়। এই সময়ই ডাক পড়ে বাংলাদেশের

নরখাদক বাঘশিকারি পরিবারের পচাব্দী গাজির। তাঁর সাহায্যে সুন্দরভাবে সুন্দরবন ভ্রমণের পর বিদেশীরা ফিরে যান এবং এরপরই জার্মানি আর ফ্রান্সের কিছু সংবাদমাধ্যমে তাঁর নাম প্রকাশিত হয়।

এর আগেও পাক অধীনস্থ বাংলাদেশে, ইংরেজ আমলেও অনেক গভর্নর, মেজর, সেনাঅফিসার আর কূটনীতিকরা, এমনকি রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিদর্শকরাও যখন সরকারী পরিদর্শন, আনন্দ ভ্রমণ বা শখের শিকার করতে এসেছেন সুন্দরবনে সবসময়ই তাঁদের সঙ্গে যাবার ডাক পড়েছে এই ডাকসাইটে অথচ প্রচারবিমুখ মৃদুভাষী মানুষটির।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান, তাঁর ছেলে, পূর্ব পাকিস্তানের একদা গভর্নর মনায়েম খানের, এমনকি নেপালরাজ মহেন্দ্ররও সফরসঙ্গী ছিলেন পচাব্দী গাজি। গ্রামের ছেলে বাংলাদেশের এই অবিখ্যাত শিকারি যে কোন শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ শিকারির মতই তাঁদের গাইড করেছিলেন। একথা নেপালরাজের মন্তব্য থেকেই জানা গেছে। বিদেশের বিভিন্ন শিকারি আর ঐতিহাসিকদের লেখাতে তাঁর নাম ও তাঁদের শিকারি পরিবারের কৃতিত্বের কথা লেখা হলেও তাঁর নাম প্রথমে ভারত –বাংলাদেশের জনসমক্ষে প্রচারিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টির পরে। লেখক খসরু চৌধুরী ও হুমায়ুন খানের লেখাতে পচাব্দী গাজির কথা প্রথম দেশে প্রচারিত হয়। হুমায়ুন খানের লেখা প্রবন্ধ "দি ম্যানইটার্স অফ দি সুন্দরবন"এর বিষয়বস্তুর পুরোটাই ছিল পচাব্দী গাজির মুখে শোনা সুন্দরবনের বাঘেদের বিষয়ে আর বাঘশিকারের বর্ণনা নিয়ে লেখা। ১৯৮০ সালের এই ঘটনাই পচাব্দী গাজিকে সাধারণের নজরে নিয়ে আসে।

পচাব্দী গাজিদের পরিবার তিন পুরুষের বাঘশিকারি। পচাব্দীর ঠাকুর্দা কিনু শেখ ছিলেন গাবুরা গ্রামের সাধারণ পরিবারের মইনুদ্দিন শেখের ছেলে। তিনিই প্রথম মানুষখেকো বাঘ শিকার করে গ্রামের মানুষদের রক্ষা করেন,বাঘ মারার পরে 'গাজি' উপাধি পান। সেই থেকে তাঁদের পরিবার 'গাজি'পরিবার। লোকমুখে প্রচারিত যে কিনু গাজি প্রায় ৮০/৯০ টা বাঘ মেরেছিলেন। মানুষখেকো বাঘশিকারি হিসাবে বাংলাদেশের মানুষদের কাছে সাতক্ষীরার এই গাজি পরিবারের অবদান অপরিসীম। এই পরিবারের অনেকেই বাঘ শিকার করেছেন আবার বাঘের শিকারও হয়েছেন। ব্যতিক্রম পচাব্দী গাজি। বহু বাঘ শিকার করেও বিংশ শতাব্দীর শেষে, প্রায় ৭০ বছর বয়সে গ্রামে নিজের বাড়িতে স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাঁর। আমৃত্যু ঢাকায় নিজে এসে নিজের পেনশন তুলে নিয়ে গেছেন তিনি।

আসলে জল- জঙ্গলের সাথে বাস সুন্দরবনের মানুষের। সেখানে জলে কুমীর,আর ডাঙায় হিংস্রতম "বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগার"। একবার এই বাঘ মানুষখেকো হয়ে উঠলে "বিপদসঙ্কুল বনজীবিকার" মানুষদের হয় মহাবিপদ। বাঘের ত্রাসের ফলে বনে ঢোকা হয়ে যায় বন্ধ। নিজেদের দিন গুজরানের রাস্তা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারেরও রাজস্ব ক্ষতি হয়।

জীবিকার কারণে নিয়মিত বনে যেতে হয় মধুসংগ্রহকারী "মৌলি"- দের, জেলেদের, শামুক- গুগলি সংগ্রহকারী "জোংড়াখোটা"- দের, কাঠুরে আর সরকারী কাঠসংগ্রহকারী বাওয়ালিদের। এরাই প্রধানত হয় নরখাদক বাঘের শিকার। বাঘের শিকার হয়ে যাওয়া মানুষদের পরিবারে নেমে আসে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার। তখন ডাক পড়ে শিকারীদের।

আগে বনদপ্তরের নিয়োজিত শিকারীরা বাঘ মেরে সেটির মাথা আর চামড়া জমা দিলে একশ বা দুশো টাকা পেত। ভয়ঙ্কর এই বিপদের কাজে লোক পাওয়া যেত কম। এই কাজেই

এগিয়ে এসেছিলেন সমাজের মানুষের কল্যাণকামী গাজি পরিবারের শিকারিরা। অর্থের জন্য তাঁরা কাজ শুরু করেননি। তাঁরা বাঘের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে নিঃস্বার্থেই এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

কিনু গাজির ছেলেদের মধ্যে মেহের গাজি, নিজামদি গাজি, আর কিনু গাজির ভাই ইসমাইল গাজিও ছিলেন দুর্ধর্ষ বাঘশিকারি। তাঁদের হাতিয়ার ছিল একটি বা দুটি দোনলা গাদা বন্দুক, লাঠি আর অপরিসীম সাহস। আর ছিল অসহায় মানুষকে বাঁচানোর তাগিদ। এই মেহের গাজি আর ক্ষান্তবিবির এক সন্তান পচাব্দী গাজির জন্ম হয় তাঁদের অনেকগুলি মৃত সন্তানের জন্মের পর। তাই গ্রামীন বিশ্বাসে যমের অরুচি করার জন্য ছেলের নাম দেন পচা, তা থেকে হয়ে পচাব্দী। ছোট থেকে রোগাভোগা চেহারার পচাব্দী গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করে বেড়াতেন, দুষ্টুমিতেও কম ছিলেন না। বাড়ির কাছেই সবুজে আর বিপদে ভরা সুন্দরবন। রাতবিরেতে অহরহ শোনা যেত বাঘের বুক কাঁপানো গর্জন আর ভয়ার্ত আক্রান্ত হরিণের ডাক। এসব ছিল তাদের গা সওয়া। ছোট্ট ছেলেটি বাড়িতে মাঝে মাঝেই দেখতো বাবা কাকাদের বাঘ শিকারে যাওয়া , কখনও সফল হয়ে,আবার কখনও বাঘের আক্রমণে আহত ,রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসা। আর দেখতো মায়ের চোখেমুখে প্রতিদিনই স্বজন হারানোর আতঙ্ক। পড়তেন গ্রামের কাছেই খোলসাপুরি প্রাইমারি স্কুলে। কিন্তু পড়াশোনায় মন নেই, বেশি লেখাপড়া হলনা। ভালো লাগতো মধুসংগ্রহ, বড় হয়ে মউলেই হবেন ভেবেছিলেন। সুন্দরবনে গাছে গাছে দেদার মৌচাক, চাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করবেন। বাড়ির পাশেই খোলাপোতা নদী, পার হতে পারলেই সুন্দরবন, একটু বড় হওয়া অপেক্ষা ।

এমন সময়ের একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা তাঁর জীবনকে অন্য খাতে বইয়ে দিল। নিরীহ, চুপচাপ কিশোরটি হয়ে উঠল বাঘ শিকারি। পচাব্দী গাজি তখন ১৭/ ১৮ বছরের যুবক। তাঁদের বাড়ির থেকে প্রায় চার- পাঁচ মাইল দুরত্বে অবস্থিত পাইকগাছা থানার গোলখালি গ্রামে এক নরখাদক বাঘের উৎপাত শুরু হল। বাঘের উপদ্রবে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ, হাটবাজার, দোকানপাট সবই বন্ধ, গরুছাগল বাইরে চড়তে পাঠানো তো বন্ধ, বাঘ গ্রামে ঢুকে গোয়াল থেকেও রাত- বিরেতে তুলে নিয়ে যায় পালিত পশু। বনজীবি মানুষদের জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ, মাছ ধরা, মধু আহরণ, সব বন্ধ। বন বিভাগ এই বাঘ মারার জন্য তিনশত টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল। বনবিভাগের চেষ্টাতেও কোনও লাভ হলনা দেখে ডাক পড়লো সাতক্ষীরার নামকরা নরখাদক বাঘশিকারি গাজি পরিবারের মেহের গাজির। যদিও তিনি বনবিভাগের চাকুরে নন, তবুও এইরকম সঙ্কটে বনবিভাগ থেকে তাঁদের ডাক পড়তো। এছাড়া তিনপুরুষের বাঘশিকারি গাজি পরিবারের পুরুষরা নরখাদক বাঘ মেরে মানুষকে রক্ষা করা তাঁদের নৈতিক কর্তব্য বলেই মনে করতেন আর সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন জীবন বাজি রেখে।

এবারেও ব্যতিক্রম হলনা। মেহের গাজি তাঁর দোনলা গাদা বন্দুকটির দুই নলে বারুদ ও ছররা ভরলেন পাট দিয়ে ঠেসে। চললেন ভাই নিজামদী গাজি আর ছেলে পচাব্দীকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁকে দেখে গ্রামের মানুষের মনে সাহস এল খানিকটা। দিনের আলোতে প্রায় ত্রিশ- চল্লিশ জন মানুষ লাঠিহাতে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে অর্ধভুক্ত গরুটির অবস্থান বের করে দিয়ে ফিরে এল গ্রামে। সেদিন বনে ঢুকে আধঘন্টা চলার পর বাঘের পায়ের তাজা ছাপ দেখে তাঁরা বুঝতে পারলেন বাঘটি কাছেপিঠেই আছে। সতর্ক হয়ে হুদোবন বা টাইগার গ্রাসের বনের মধ্যে দিয়ে বাঘের খোঁজ করে চলতে চলতেই হঠাৎ বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল মেহের গাজিকে লক্ষ্য করে। বিদ্যুত গতিতে

মেহের গাজিও উদ্যত বাঘের বুক লক্ষ্য করে গুলি করলেন। বাঘ আচমকা গুলি খেয়ে সামান্য আহত হয়ে পালিয়ে গেল, মারা পড়লনা। বাঘকে অনুসরণ করে কিছুদূর এগিয়ে ঘাসের উপর রক্তের দাগ দেখে বুঝলেন গুলি খেয়ে আহত বাঘ কাছেপিঠেই আছে।

এদিকে দিনের আলো কমে এসেছিল। তাই সেদিন তাঁরা ফিরে এলেন গ্রামে। সে রাতটা গ্রামের সবাইকে সজাগ থাকতে বললেন। পরদিন সকালে আবার রওনা হলেন, নিজের হাতে বন্দুক, ভাইয়ের হাতেও অস্ত্র, আর ছেলে পচাব্দীর হাতে লম্বা এক লাঠি। মনে প্রবল সাহস নিয়ে এগোলেও সেদিন তাঁদের অনুকুলে ছিলনা ভাগ্যদেবী। সার বেঁধে আগেপিছে চলছিলেন তিনজনে। ঘাসের উপরে রক্তের হালকা দাগ দেখে বুঝলেন বাঘ খুব বেশি আহত হয়নি। সতর্ক হলেন তাঁরা। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগোচ্ছিলেন ঘন হুদোঘাসের জটাজালের মধ্য দিয়ে। কোন দিকেই চার- পাঁচ হাতের বেশি দূরে দেখা যাচ্ছিল না।

দুশো হাত মত যাবার পর দেখলেন তাঁদের সামনের দিকে সাত- আট হাত দূরেই একটা হুদো ঘাসের ঘন ঝোপের সামনে অবধি গিয়ে শেষ হয়েছে বাঘের পায়ের ছাপ।

তাঁরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ বিদ্যুতগতিতে হলুদ ডোরাকাটা এসে পড়লো মেহের

গাজির মাথায়। এক থাবায় মেহের গাজির মাথার তালু, কপাল, কান, আর চোখ নিয়ে মুখের বাঁদিকের মাংস নেমে এসে ঝুলতে লাগলো ঘাড়ের কাছে, তাঁর মাড়ি থেকে দাঁত বেরিয়ে এল। তাঁকে আহত করেই, পলকের মধ্যেই নিজামদী গাজির একটা হাতে এমন কামড় বসালো যে

তাঁর হাতটা ছিঁড়ে কনুই থেকে ঝুলতে লাগলো নিচে। সেই অবস্থাতেও মেহের গাজি পচাব্দীকে বাঘের পিছু তাড়া করতে বললেন। পচাব্দী গাজি তখনকার মত ক্ষান্ত দিলেন বাঘের পিছু ধাওয়া করা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুজন দুর্ধর্ষ শিকারীর এভাবে ঘায়েল হওয়া দেখে বুঝলেন এই বাঘকে মারতে হলে কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। তখন তাঁর কর্তব্য হল দুজন আহত বিপর্যস্ত মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। সতেরো বছর বয়সী ছেলেটি অনেক কষ্টে দুজনকে নিয়ে গোলখালি গ্রামে পৌঁছুলেন। সেখান থেকে গ্রামের মানুষদের সাহায্যে বাড়ি ফিরে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন এই বাঘকে নিজে মারার প্রতিজ্ঞা। নিজামদী গাজির হাত কনুই থেকে বাদ গেল। তাঁর শিকারি জীবন শেষ হয়ে গেল। কিন্তু শক্তিশালী মেহের গাজি তিনমাসের ভেষজ চিকিৎসায় সুস্থ হলেন। এর পরেও ১৮ বছর বেঁচে ছিলেন আর আরও পাঁচটা বাঘ মেরেছিলেন মেহের গাজি ।

এই হার মানতে রাজী নয় গাজি পরিবার। এই ঘটনার দশ- বারো দিন পরেই ভয়ার্ত, বিপদগ্রস্ত গোলখালির বাসিন্দাদের রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন মেহের গাজির কাকা ইসমাইল গাজি, আর পচাব্দীর দুই কাকা আতাব্দী গাজি আর মাদার গাজি। ঘটনাস্থল চিনিয়ে দেবার জন্য খালি হাতে তাঁদের সঙ্গে পিছনে পিছনে গেলেন পচাব্দী গাজি। ইতিমধ্যে বাঘ গ্রামের আরও কয়েকজন মানুষকে তুলে নিয়ে গেছে, আর তাঁদের আসার আগের দিন রাতেই গ্রাম থেকে একটা বাছুর ধরে নিয়ে গেছে।

বনে ঢুকে হাত পঞ্চাশেক চলার পর হঠাৎ বিকট গর্জনে হুঙ্কার দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে তাঁদের ডানদিক থেকে এসে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো ইসমাইল গাজির মাথার উপর, এক কামড়ে ইসমাইলের মাথা চ্যাপ্টা করে দিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো আবার হুদোবনের আড়ালে। প্রায় কুড়িটি বাঘের সফল শিকারি ইসমাইল গাজি সেখানেই প্রাণ দিলেন বাঘের কামড়ে। দাদুর মৃতদেহ নিয়ে পচাব্দী গাজি ফিরে এলেন গ্রামে। সৎকার করলেন দাদুর, আর মনে মনে তৈরি হলেন তাঁদের পরিবারের এতবড় ক্ষতিকারী বাঘটিকে মোক্ষম আঘাত হানতে। এদিকে তিনজন নামকরা আর সাহসী শিকারীর এইরকম ঘায়েল হয়ে যাওয়ায় গ্রামের মানুষ আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। রটে গেল যে ,ওই বাঘ কোন সাধারণ বাঘ নয়, মানুষ একে মারতে পারবেনা, এর গায়ে গুলিও লাগেনা। এটা নিশ্চয়ই বাঘের রূপধারী কোনও দুষ্ট নরখাদক প্রেতাত্মা । তখনও মেহের গাজি আর নিজামদী গাজির চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় সবার মন খারাপ, পচাব্দী গাজি মনে মনে তৈরি হচ্ছেন এই নরখাদককে নিজের হাতে শিকার করবেন।

এই ঘটনার পনের দিনের মাথায় সুযোগ এসে গেল , তাঁর আব্বাজান তখন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। একদিন ছেলেকে কাছে ডাকলেন। আর স্ত্রীকে ইশারায় বললেন তাঁর দোনলা বন্দুকটি আনতে। ছেলে পচাব্দীর হাতে তুলে দিলেন তাঁর হাতিয়ার ,আর ইশারায় নির্দেশ দিলেন বাঘটিকে শিকার করতে যেতে। আশীর্বাদ দিলেন, আশা নিয়ে যে পচাব্দীই পারবেন এই কাজ করতে। আর শুরু হল পচাব্দী গাজির শিকারী জীবন।

বার বার বাবার সাথে বনে গিয়ে গিয়ে পচাব্দী গাজি কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন আর বাঘ শিকারের কিছু নিজস্ব কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন। তাঁর শিকারের পরিকল্পনার ধরণধারণ ছিল তখনকার দিনের এদেশের অন্য শিকারিদের থেকে আলাদা। বাঘের পায়ের ছাপ দেখে সেটির জাতি, প্রজাতি, আকৃতি ও আয়তন,গতিবিধি, আন্দাজ করার নিপুন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। স্ত্রী কি পুরুষ বাঘ তাও বুঝতে পারতেন। কখনও দিনের পর

দিন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নীরবে বাঘের পায়ের চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করে কাটিয়ে দিতেন। বাঘকে লুব্ধ করে ডেকে আনার জন্য শিখেছিলেন বাঘিনীর ডাক, গাছের শুকনো পাতা পড়ার শব্দ, শুকনো পাতার উপর দিয়ে মানুষের হেঁটে যাওয়ার শব্দ (যেন কাঠুরিয়া বা কাঠকুড়ুনিরা হেঁটে যাচ্ছে)। প্রায় পনেরো ফুট উঁচু গাছের ওপর থেকেও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন। শব্দের উৎস তাক করেও লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন। এই গুণটি কাজে লাগিয়েই তিনি শেষে 'গোলখালির ত্রাস' সেই দশফুট লম্বা বয়স্ক পুরুষ বাঘটিকে মেরেছিলেন।

বাবার আশীর্বাদ আর অস্ত্রটি নিয়ে চললেন গোলখালির দিকে। সঙ্গে চললেন তাঁর ছোট এক ভাই হাসেম গাজি। গ্রামে পৌঁছে জানলেন ইতিমধ্যেই ঐ বাঘ আরও কয়েকটি মানুষকে মেরেছে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। আগের রাতেও একটি গোয়াল থেকে তুলে নিয়ে গেছে একটি বাছুরকে। আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য গ্রামে এসে রয়েছেন বনবিভাগের দুজন ডেপুটি রেঞ্জার, আর দুজন ভাড়াটে শিকারি। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। পচাব্দী গাজিকে নিয়ে শিকারির সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচজন। আগের তিনবারের বিফলতার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ঠিক করে নিলেন এই বাঘকে "মাঠাল" পদ্ধতিতে মারা যাবেনা, একে মারতে গেলে তাঁর নিজস্ব "গাছাল" পদ্ধতিই উপযুক্ত। সেইমত সব ব্যবস্থা করলেন। বনের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে একটি গাছের গোড়ায় একটি 'মড়ি', মানে একটি মৃত গরু বেঁধে রাখতে হবে বাঘকে প্রলুব্ধ করতে, আর শিকারিরা খানিকটা দূরে দূরে গাছের উপর, নিরাপদ অবস্থানে, নিঃশব্দে বাঘের আসার প্রতীক্ষা করবে। সে সময়টা দীর্ঘও হতে পারে।

চারজন শিকারি বসলেন নিজেদের সুবিধামত, বেঁধে রাখা 'মড়ি'র কাছাকাছি চারটি গাছের উপর। পচাব্দী গাজি বসলেন 'মড়ি' থেকে প্রায় পনেরো হাত দূরে থাকা একটি কেওড়া গাছের উপরে, মাটি থেকে প্রায় নয়–দশ ফুট উঁচুতে। ভাইকে বসালেন আরও উঁচুতে একটি ডালের ওপরে, নিরাপত্তার জন্য। এবার স্বজন হারানোর কোনও ঝুঁকি নিলেন না। পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথির চাঁদ আকাশে উপরে উঠলো সন্ধের কিছু পরেই। চারদিক স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল উঁচুতে গাছের উপর থেকে। প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে চলল বাঘের আসার অপেক্ষায়। গাছের উপর নিঃসারে অবস্থান, চোখে অতন্দ্র, প্রখর দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্যও তন্দ্রা এলেই সর্বনাশ আর কর্মনাশ।

বাঘ দেখা দিল রাত গভীর হলে। মড়ির দিকে এগোচ্ছে বাঘ নিস্তব্ধ ,প্রাণহীন জঙ্গলে অতি নিশ্চিন্তে। বাঘ সুবিধাজনক অবস্থানে এসে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই উঁচুতে থাকা সতর্ক পচাব্দী গাজি গুলি করলেন বাঘের বুক লক্ষ্য করে। অব্যর্থ নিশানা। বুকে গুলি লাগতেই এক বিকট হুঙ্কারের সঙ্গে বাঘ মড়ি ছেড়ে লাফ দিয়ে ঢুকলো হুদো ঘাসের জটলায়, শুরু করলো আর্তনাদ আর দাপাদাপি। সেই শব্দ লক্ষ্য করেই আবার সঠিক নিশানায় গুলি করলেন পচাব্দী গাজি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব চুপচাপ। ভোরের অপেক্ষায় গাছের উপরেই বসে রইলেন সবাই। আলো ফুটলে সকলে নেমে এলেন গাছ থেকে। ঝোপের মধ্যে থেকে খুঁজেপেতে টেনে বের করে আনা হল পচাব্দী গাজির শিকার "গোলখালির ত্রাস" বিরাট নরখাদক 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'কে। গ্রামের মানুষজনও রাতে গুলির শব্দ শুনেছে, আর শুনেছে বাঘের আর্ত হুঙ্কার। সকাল হতেই সবাই লাঠি হাতে ছুটে এসেছে জঙ্গলে। সবাই আনন্দে আত্মহারা ,সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল সতেরো বছরের কিশোর পচাব্দী গাজিকে।

১৯৪১ সালে এইভাবেই শুরু হল তাঁর শিকারি জীবনের জয়যাত্রা। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সুন্দরবনের যেখানেই নরখাদক বাঘ দেখা দিয়েছে, বনবিভাগ থেকেও ডাক পড়েছে তাঁরই। সারা জীবনে মেরেছিলেন তাঁর বাবার থেকে সাতটি বেশি, মোট সাতান্নটি বাঘ, যার মধ্যে কুড়িটিই ছিল নরখাদক রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আর সুন্দরবনের সেই সময়ের সবচেয়ে দীর্ঘ প্রায় বারোফুট বাঘটি শিকার করেছিলেন "বুড়ি গোয়ালিনির" জঙ্গলে।(এ কথা জানা গেছে মেহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরী নামে একজনের লেখার সুত্র থেকে)।

এই ঘটনার পর বনদপ্তর তাঁকে প্রথমে রেঞ্জার সাহেবের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করে। তারপর তাঁর বাঘ শিকারের সংখ্যা বাড়তে শুরু করলে বনদপ্তর তাঁকে সরকারী শিকারি হিসাবে নিয়োগ করে। নরখাদক বাঘ বেরোলে তাঁকেই শিকারে পাঠাতো বনদপ্তর। এই বিপদসঙ্কুল কাজের জন্য বাংলাদেশের তৎকালীন "ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার" ,আবদুল আলিমের কাছ থেকে তিনি সবরকম সাহায্য ও সহায়তা পেতেন। বনরক্ষী হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন তিনি, কারণ সারা সুন্দরবন ছিল তাঁর নখদর্পণে, ছোট বড় সবকটি খাল- বাওড়ের নাম জানতেন ও চিনতেন তিনি। তিনি বনরক্ষী হিসাবে বনের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অসংখ্য বনকর্মী আর বনজীবি মানুষের প্রাণরক্ষা করেছেন তিনি। সুন্দরবনের মানুষ তাঁকে 'বিপদতারণ' বলেই শ্রদ্ধা করতো। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিশেষ সম্মানের "সনদ- ই- খিদমত" উপাধি।

পাতলা গড়নের ছোটখাটো, আর নিরীহ চেহারার পচাব্দী গাজি নিরহংকার, মিতভাষী । একমাত্র ভয়ঙ্কর হিংস্র বাঘকে প্রলুব্ধ করে কাছে ডেকে আনার জন্য বাঘিনির ডাক ডাকার সময় তাঁর স্বরের দৃঢ়তা আর তীব্রতা ধরা পড়তো। চোখের চাহনি ছিল প্রায় পলকহীন, দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ আর অন্তর্ভেদী। খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন না মানুষটি, তবে নীচু স্বরে ধারাবাহিকভাবে ছোট ছোট বাক্যে বর্ণনা করতেন তাঁর জীবনের নানা ঘটনার কথা। তাঁর খুব পরিচিত মানুষজনের কাছে বলা ঘটনাগুলিই পরবর্তী সময়ে তাঁদের স্মৃতি থেকে লেখা হয়েছে বলেই আজ তাঁর বিষয়ে কিছু কিছু জানা গেছে।

এই মানুষটি যদি লেখাপড়া জানতেন, আর নিজের শিকারের ভয়ঙ্কর কাহিনিগুলি লিখে যেতে পারতেন , তাহলে হয়তো বিশ্ববিখ্যাত বাঘশিকারি জিম করবেটের মতই বিখ্যাত হতেন তিনি। সেই পিছিয়ে পড়া সময়ে ,সাধারণ গাদা বন্দুক সম্বল করে তাঁর রোমাঞ্চকর নরখাদক বাঘ শিকারের ঘটনা পরম্পরা ও অভিজ্ঞতা যদি লিপিবদ্ধ করে যেতেন তবে সে লেখা হয়ত করবেটের লেখা "ম্যানইটারস অফ কুমায়ুন" প্রভৃতি বইয়ের থেকে কম জনপ্রিয় হতনা।

তাঁদের পরিবারের পরিচিত বর্তমান বাংলাদেশের তৎকালীন একজন বনসংরক্ষকের বাবার ছিল হরিণ শিকারের শখ। সেই সুত্রেই এই গাজি পরিবারের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল। প্রথম পরিচয় থেকে কালে তাদের মধ্যে ঘনিষ্টতা হয় আর পচাব্দী গাজির সঙ্গে হয় তাঁর বেশ সখ্য। সময়টা ১৯৬৪ /১৯৬৫ সাল। পচাব্দী গাজির মুখে কিছু দুর্ধর্ষ নরখাদক বাঘ শিকারের কাহিনী শুনেছিলেন তিনি। তাঁরই স্মৃতি থেকে লেখা একটি ভয়ঙ্কর বাঘ শিকারের কাহিনি না বললে পচাব্দী গাজির সাহসের পরিচয় দেওয়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১৯৫৮ সালে তিনি বনদপ্তরের বোটম্যান হিসাবে কাজ করছিলেন। একবার এক গ্রামে নরখাদক বাঘের উৎপাত শুরু হয়েছে ,পচাব্দী গাজি চললেন বাঘের খোঁজে। কিছুতেই বাঘের দেখা পাওয়া যায়না। এদিকে গ্রামে বাঘের আক্রমণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

দোনলা বেলজিয়ান বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে নৌকায় করে চললেন ভাটির টানের দিকে, কারণ নদীর টানের দিকের জঙ্গলে শোনা গেছে বাঘের গর্জন। ক্রমাগত ডাক নিকটে আসতে তিনিও বন্দুক হাতে নেমে পড়লেন নৌকা থেকে ,নদীর পাড় ঘেঁষে চললেন জঙ্গলের ধারে ধারে। ডাঙায় নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জঙ্গল থেকে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে এসে বিরাট বাঘ পড়লো তাঁর ওপরে। ধাক্কায় দু- পা পিছিয়ে গেলেন পচাব্দী, সামলে নিয়ে ফের বন্দুক তাক করার আগেই বাঘ পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সামনের থাবা উঁচিয়ে দাঁড়ালো তাঁর সামনে। ট্রিগার টিপলেন, কিন্তু গুলি ছুটলোনা।

বাঘ আরও হিংস্র হয়ে উঠে বিরাট হাঁ করে গা গা শব্দ করে তাঁর মাথা তাক করে থাবা ছুঁড়লো। স্থিতধী পচাব্দী সেই অবস্থায় বাঘের হাঁ করা মুখ নিশানা করে আবার ট্রিগার টিপলেন,এবারেও গুলি ছুটলো না। পচাব্দী বাঘের মতই মুখে শব্দ করতে লাগলেন বাঘকে ঘাবড়ে দিতে। সমান হুঙ্কার দিয়ে বাঘও এগিয়ে এল পচাব্দী গাজির মাথা কামড়ে ধরতে। মুখটা চকিতে সরিয়ে নিলেন ,মাথাটা বেঁচে গেল, বাঘের লালা ছিটকে লাগল তাঁর মুখে আর কপালে, গোঁফ ছুঁয়ে গেল তাঁর হাত। তিনি তখন পিছিয়ে যাচ্ছেন আর বাঘও এগোচ্ছে মরীয়া হয়ে, তবে কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে বাঘ তার যমদূত শিকারিকে কামড়ে ধরতে এগোচ্ছে। মূর্তিমান যমের সামনে পড়ে প্রায় সম্বিতহীন অবস্থায় বন্দুকের নলটা বাড়িয়ে ঢুকিয়ে দিলেন বাঘের হাঁ- করা মুখের মধ্যে আর প্রাণপণে ঠেলতে লাগলেন , বাঘের গলার মধ্যে বন্দুকের নল নিয়েই বাঘ তাঁকেও ঠেলে এগোচ্ছে। পিছোতে পিছোতে হঠাৎ পচাব্দী গাজি পায়ে জলের ছোঁয়া পেলেন, বুঝলেন ঠেলাঠেলি করতে করতে, কখন পৌঁছে গেছেন নদীর জলে । প্রাণপণে বন্দুকটি ঠেলে দিলেন বাঘের গলা ভেদ করে আর বিপরীতমুখী ধাক্কায় নিজে পড়লেন কিছুটা দূরে গভীর জলে। ডুব সাঁতার দিয়ে চলে গেলেন অনেক দূরে । আহত বাঘ মরণাপন্ন হয়ে পড়ে রইল সেখানে, আর পচাব্দী গাজি সাঁতরে গিয়ে উঠলেন অনেক দূরে । সাহসের জোরে বাঘের মুখ থেকে বেঁচে ফিরলেন পচাব্দী গাজি।

তথ্যঋণঃ—

- পশ্চিমবঙ্গ—সুন্দরবন সংখ্যা।
- শ্রীখন্ড সুন্দরবন – সামশুর রহমানের লেখা প্রবন্ধ।
- বাংলাপিডিয়া।

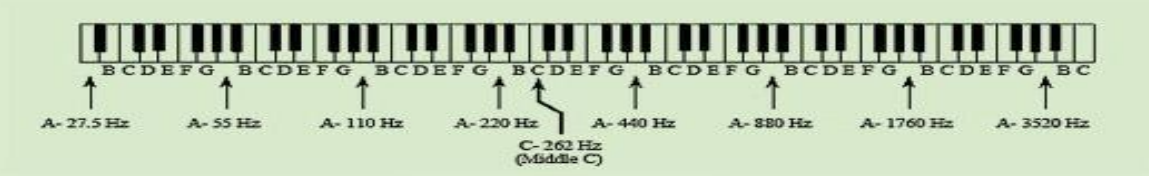

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

Link for the sound clip

একবার এক ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ি থেকে ক্রোশখানেক (কিলোমিটার দুয়েক) দূরে এক শিষ্যবাড়িতে যাগযজ্ঞ করে একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট কচি পাঁঠা প্রণামী পেয়েছেন। মনের আনন্দে ছাগ- শিশুটিকে কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলেন বাড়ির পথে। কিন্তু অর্বাচীন চার- পাঁচটা বিচ্ছু ছেলে মিলে ঠিক করল যে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ওটা হাতাতে হবে যে করে হোক। আঁটা হয়ে গেল জব্বর ফন্দি –দৌড়ে দৌড়ে ব্রাহ্মণের আগে আগে বেশ কিছুটা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে গেল এক একজন। ব্রাহ্মণ পাশ দিয়ে যেতেই প্রথমজন বলল, "এ হে হে, ঠাকুরমশাই কাঁধে করে কুকুরছানা নিয়ে কোথায় চললেন?" ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে তাকে বকেঝকে নিজের পথে এগিয়ে চললেন। খানিক দূর যাবার পর দ্বিতীয়জনের সাথে দেখা। "সে বলে উঠল, "কী হয়েছে দিনকাল – বামুনের কাঁধে কুকুর শৃগাল।" এবারও যথারীতি ব্রাহ্মণ গাল পাড়লেন, কিন্তু মনের কোনে একটা সন্দেহ যেন উঁকি মারল – কি জানি, শিষ্য তাঁকে কচি পাঁঠার বদলে সত্যিই কুকুর দিয়ে দেয় নি তো! কাঁধ থেকে নামিয়ে দেখলেনও ভাল করে – তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পাঁঠাটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে লাগলেন। এরপর তৃতীয়জনও যখন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মন্তব্য করল, "বামুনের কি কুকুরকে একেবারে কাঁধে তোলা শোভা পায়?" তখন সন্দেহটা আবার বেশ প্রবল হল ব্রাহ্মণের। তবু দোনামোনা করে চলতে লাগলেন – মনে সন্দেহের কাঁটাটা রয়েই গেল যদিও। শেষকালে যখন চতুর্থজনও বলল, "ঠাকুরমশাই কুকুর কাঁধে পাড়ায় ঢুকলে তো ঢি ঢি পড়ে যাবে," তখন আর সন্দেহ রইল না যে তিনি সত্যিই কুকুরছানা নিয়ে চলেছেন। শিষ্যের ওপর প্রচন্ড রেগে তক্ষুণি ওটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে হন হন করে হাঁটা দিলেন বাড়ির পথে। আর বিচ্ছুগুলো নধর পাঁঠাটা নিয়ে নাচতে নাচতে চলল চড়ুইভাতি করতে।

ভারতীয় তথা প্রাচ্যের শ্রুতিনির্ভর(Microtone based) সঙ্গীতের কালক্রমে ওই দশাই হয়েছে পাশ্চাত্যের ইকোয়াল টেম্পারেট স্কেলের স্বরস্হান অনুযায়ী পরিবেশন করার ফলে। আর যেহেতু বিশ্ব- বাজার ব্যবস্হার কারণে ওই ই.টি. স্কেল ছাড়া অন্য কিছু শতকরা নিরানব্বুই ভাগ মানুষের অজানা, তাই ওই স্কেলের স্বরে তৈরি গান- বাজনকেই সকলে সঙ্গীত বলে জানছে ও মানছে। নিজেকে জানা, 'আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ'- এর মাঝে নিজের স্হান দেখে বিস্ময় থেকে যে যাত্রা শুরু হত মোক্ষ- লাভ বা বিশ্বকে নিজের মধ্যে অনুভব করার আধ্যাত্মিকতার পথে, সঙ্গীতের হাত ধরে, সেই সঙ্গীত এখন 'তুই আমার হিরো, আমি তোর জিরো'তে এসে পৌঁছেছে।

পন্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডে, গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভিন্ন ভিন্ন মতের ওস্তাদ, পন্ডিতদের সাথে আলাপ আলোচনা করে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের একটা মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য শ্রেণীবিন্যাস করছেন তাতে এখনকার সব কটি রাগ মূলতঃ ১০(দশ)টি ঠাট বা স্কেলের কোন একটার মধ্যে পড়ে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই রাগ সঙ্গীতই (পন্ডিত রত্নাকরের ভাষায়- গীত) বলা যায় জন- মনোরঞ্জনের পথে প্রথম যাত্রা আধ্যাত্মিকতার গান্ধর্বী পথ ছেড়ে। হিন্দুস্হানী সঙ্গীত পদ্ধতি – ক্রমিক পুস্তক মালিকা'র চতুর্থ খন্ডে ভাতখন্ডেজী লিখছেন –

> মনোরঞ্জনে সমর্থ স্বরগুচ্ছকে গীত বলা হয়। গীত গান্ধর্ব্ব সঙ্গীত থেকে ভিন্ন। গান্ধর্ব্ব সঙ্গীতে অপৌরুষেয় (মানুষের তৈরি করা স্বর নয়, প্রকৃতির সৃষ্ট) স্বরশব্দই প্রধান, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষ প্রাপ্তি।
>
> সঙ্গীতের বর্তমান পরিস্হিতি দেখেশুনে, অধুনা প্রচলিত ১২ টি মুখ্য স্বরের ওপর ভিত্তি করেই এই সঙ্গীত পদ্ধতি লেখা হল কারণ তাহলে ওই মধ্যবর্তী ১০ টি শ্রুতিস্বরের 'ঝঞ্ঝাটে' পড়তে হবে না আর তাতে করে শ্রেণীবিন্যাসও সুব্যবস্হিত হবে। (পৃ – ২৫,২৬)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শ্রুতির 'ঝঞ্ঝাট' মুক্ত হয়ে বর্তমানে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তা মূলত মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে চর্চিত ও পরিবেশিত হচ্ছে – এবং বাজারে মনোরঞ্জনের মাপকাঠির ওপরই, অন্যান্য বাজারজাত পণ্যের মতই, তার মূল্যায়ন হচ্ছে ও গ্রহণযোগ্যতা ঠিক করা হচ্ছে।

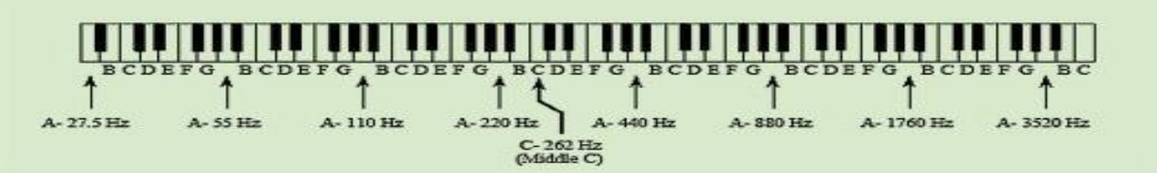

Link for the sound clip

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির ১০টি ঠাটের মত দক্ষিণ- ভারতীয় পদ্ধতিতে ৭২টি মেলকর্তা দক্ষিণ ভারতীয় রাগগুলির আধার।

উত্তর ভারতীয় রাগ- সঙ্গীতের ভাতখন্ডেজীর শ্রেণীবিন্যাস মোতাবেক ঠাটগুলি, সাথে সেই ঠাটগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষিণ- ভারতীয় মেলগুলি নিচে দেওয়া হল।

ঠাট	*মেল (দঃ ভারতীয়)*	*স্বর*
বিলাবল	ধীরশঙ্করভরণ	স র গ ম প ধ ন র্স
কল্যাণ	মেচ-কল্যাণী	স র গ **ক্ষ** প ধ ন র্স
খম্বাজ	হরিকাম্ভোজী	স র গ ম প ধ **ণ** র্স
ভৈরব	মায়ামালবগৌড়া	স **ঝ** গ ম প **দ** ন র্স
পূর্ব্বী	কামবর্দ্ধনী	স **ঝ** গ **ক্ষ** প **দ** ন র্স
মারোয়া	গমনশ্রম	স **ঝ** গ **ক্ষ** প ধ ন র্স
কাফি	খরহরপ্রিয়া	স র **জ্ঞ** ম প ধ **ণ** র্স
আশাবরী	নটভৈরবী	স র **জ্ঞ** ম প **দ** **ণ** র্স
ভৈরবী	হনুমন্তোড়ী	স **ঝ** **জ্ঞ** ম প **দ** **ণ** র্স
তোড়ি	শুভপন্তুবরালি	স **ঝ** **জ্ঞ** **ক্ষ** প ধ ন র্স

[*সিন্থেসাইজারএ মিডল- সি কে সা ধরে বিভিন্ন ঠাটের পর্দাগুলো নীচে দেখানো হল।*]

বিলাবল -সব সাদা পর্দা	স		র		গ	ম		প		ধ		ন	র্স	
কল্যাণ-একটিকালো পর্দা	স		র		গ		ক্ষ	প		ধ		ন	র্স	
খম্বাজ - ”	স		র		গ	ম		প		ধ	ণ		র্স	
ভৈরব – দুটি কালো পর্দা	স	ঝ			গ	ম		প	দ			ন	র্স	
পূর্ব্বী -তিনটি কালো পর্দা	স	ঝ			গ		ক্ষ	প				ন	র্স	
মারোয়া- দুটি কালো পর্দা	স	ঝ			গ		ক্ষ	প		ধ		ন	র্স	
কাফি - দুটি কালো পর্দা	স		র	জ্ঞ		ম		প		ধ	ণ		র্স	
আশাবরী-তিনটিকালো পর্দা	স		র	জ্ঞ		ম		প	দ		ণ		র্স	
ভৈরবী-চারটি কালো পর্দা	স	ঝ		জ্ঞ		ম		প	দ		ণ		র্স	
তোড়ি -তিনটি কালো পর্দা	স	ঝ		জ্ঞ			ক্ষ	প		ধ		ন	র্স	

FL Studio ‘DAW’ তে বাজানো ঠাটগুলোর সাউন্ড ক্লিপ ওপরের লিঙ্ক-এ দেওয়া আছে। ঠাটগুলো পর পর শুনলে স্বরের বিভিন্নতায়, শ্রুতিস্বরের ‘ঝঞ্ঝাট’ ছাড়াও, মনে কেমন আলাদ আলাদা অনুভূতি হয় সেটা বোঝার চেষ্টা করবে আশা করি।

দীন মহম্মদ

ভারত ভ্রমণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে
ঘুরে বেড়ানো এক দেশীয় কর্মচারীর ভ্রমণআলেখ্য

পর্ব-২

অনুবাদ: শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র ৩

বেকার- সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পরপর আমার আচার আচরণে পরিবর্তন দেখে আমার মায়ের বদ্ধমূল ধারণা হল যে আমি চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। মা জানতেন আমি মিস্টার বেকারের সাথে কথা বলেছি এবং তার সাথে যাবার আগ্রহও প্রকাশ করেছি। মা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যদি কোনোরকমভাবে আমায় বিরত করা যায়। মায়ের কড়া নজর এড়িয়ে আমি আমার নতুন মনিবের সঙ্গে চলে যাবার রাস্তা ঠিকই খুঁজে নিলাম। আর এক সকালে তার সঙ্গে বাঁকিপুর চলে এলাম। আমার চলে আসার কারণে মায়ের দুঃখ হয়েছিল নিশ্চিত। পাটনা শহর থেকে অল্প দূরত্বের বাঁকিপুর পৌঁছতে বিশেষ সময় লাগল না। গঙ্গার পাড়ে খোলামেলা সমতল জায়গায় সেনাশিবির। সেটা ১৭৬৯ সাল। নিকটবর্তী প্রদেশের দায়িত্ব ছিল এই শিবিরের ওপর। সৈন্যশিবির চারভাগে বিভক্ত ছিল। একটা ইউরোপিয় পদাতিক, দুটি অশ্বারোহী দল, এবং একটি ইউরোপীয় গোলন্দাজ বাহিনি। কর্ণেল লেসলি ছিলেন সর্বাধিনায়ক, সেনাবাহিনিতে তার ঠিক পরেই ছিলেন মেজর মরিসন। অশ্বারোহীর দায়িত্বে ক্যাপ্টেন ল্যান্ডেগ আর গোলন্দাজ বাহিনীর কর্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন ডাফ। এই শিবিরের দুটো মূল অংশ ছিল। একটা পাটনার দিকে, নদীর তীর বরাবর। এদিকে জলের সুবিধা থাকার দরুণ ইউরোপীয়দের বাংলোগুলি নদীর ধারে পরপর বানানো হয়েছিল। এর একপ্রান্তে ছিল কর্নেল লেসলি, অন্যপ্রান্তে মেজর মরিসনের বাংলো। দ্বিতীয় সারির বাসাগুলো এই প্রথম সারির সমান্তরাল, নদী থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে। এই বাসাগুলির সামনের দিকে ছিল অফিসারদের থাকার আর পেছনের দিকে সৈন্যদের ব্যারাক। দুয়ের মাঝে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে প্রতিদিন ঘড়ি ধরে নিয়মমাফিক বাধ্যতামূলক শারীরিক কসরৎ করা হত। আরও মাইলখানেক পেছনে দেশীয় সেপাইদের বিশ্রামাগার আর তার পেছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে ঘোড়ার আস্তাবল। এই হল গিয়ে শিবিরের মোটামুটি চিত্র।

অফিসারদের বাংলোগুলো অদ্ভূত কায়দায় তৈরি। দেশীয়দের মতো নয় মোটেও। বেড়ার দেয়াল দেয়া চৌকো বাড়ি, খুঁটির ওপর বাঁশ আর খড় দিয়ে ছাদ, অনেকটা আয়ারল্যান্ডের চাষীবাড়ির মতন। বাড়িতে ঢোকার রাস্তা বেশ খোলামেলা, ঢুকেই প্রশস্ত হলঘর যার লাগোয়া চাকরদের কামরা। ভেতরদিকে খাবার আর শোবার ঘর। মস্ত কাঠের ফ্রেম দেয়া পার্টিশন। তাতে দরজা জানালার বদলে পর্দা লাগানো।

পর্দাগুলো বেশ ভারী মসলিন কাপড়ের, তার ওপর নানান কারুকাজ ও চিত্রবিচিত্র বাহারি রঙের নকশা করা। পর্দাগুলো এতটাই ভারী ও মোটা কাপড়ের যে ঠান্ডার সময়েও বেশ গরম

থাকত ভেতরটা। মাঝে মাঝে গুটিয়েও রাখা হত যাতে হাওয়া বাতাস আসতে পারে, আবার নামিয়ে রাখা হত যাতে কড়া রোদ আড়াল করা যায়। ভেতরদিকে সরু সরু বাঁশ আর সুতো দিয়ে বানানো রঙিন জাল বা চিক টাঙানো হত। এগুলোও পর্দার মতো ওঠানো নামানো যেত। এর মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে ভেতরে দেখার উপায় ছিল না কিন্তু ভেতর থেকে বাইরেটা অনায়াসেই দেখা যেত।

কর্নেল আর মেজরদের বাংলো অফিসারদের চেয়ে বড়ো ছিল। এনাদের বাংলোর সাথে ছিল অতিথিভবন আর আস্তাবল। রাস্তার দিকে বাংলোর ঠিক বিপরীতে বাঁদিক ঘেঁষে কর্নেলের রক্ষীদের ঘর। এ দুয়ের মাঝের অংশে পাঁচিলঘেরা সবুজ গাছের সারি। চারপাশের গাছগাছালির মাঝে নবাবদের বানানো অসামান্য কিছু অট্টালিকা ছিল। নিঃসন্দেহে সেগুলো এখানকার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছিল। তার মধ্যে উল্লেখ করতেই হয় মেসার্স হারবার্ট আর হলিংবেরি- র ব্যাঙ্ক, মিস্টার বেরি ও কম্পানি- নিযুক্ত- প্রতিনিধিদের বাড়ি আর একখানা গোলাবারুদ মজুতখানা।

ইউরোপীয় সৈন্য- ব্যারাকটি বস্তুত সার সার ঘর। মাঝের দেয়ালগুলো চাটাই আর বাঁশ দিয়ে বানানো। ওপরটা খড় ছাওয়া। দেশি সৈন্যদের বিশ্রামের জায়গাটাও অমনিই ছিল। যাদের আবার সঙ্গে পরিবার ছিল তারা কাছাকাছি আলাদা কুঠরি বানিয়ে নিত।

বাঁকিপুরে সেনাবাহিনির বাইরে সাধারণের বাড়িঘরদোর অল্পই ছিল। তবু তারই মধ্যে

অনবদ্য মিস্টার গোল্ডিং- এর বাড়ি। সৈনিক শিবির থেকে মাইলটাক দূরে অনেকখানি জমির ওপর ইংলিশ স্থাপত্যে বানানো বিশাল বাড়ি। একটু উঁচু জমির ওপর থাকার জন্য বাড়ির গোলাকৃতি গম্বুজটাকে সুমুখের গঙ্গা অবধি বিস্তীর্ণ উর্বর সমতলের প্রেক্ষাপটে রাজছত্রের মতই লাগত। বাড়ির মালিক তার বিনম্র স্বভাব ও অতিথিবৎসলতার কারণে অফিসারদের কাছে সম্মাননীয় ছিলেন।

গোল্ডিং মশাইয়ের কাছাকাছি থাকতেন মিস্টার রাম্বোল্ড। কোম্পানিকে নৌকো টৌকো সরবরাহ দেবার বরাত পেতেন ভদ্রলোক। বেকার সাহেব নানান গুণাবলির জন্য এনাকে বিশেষ পছন্দ করতেন আর প্রায়শই তার বাড়িতে যেতেন। এখানে আমার দেশের একটা গৌরবের কথা না বলে পারছি না। আমার দেশের যে কোনো মানুষ ভারতে বসবাসকারি ইউরোপীয় মহিলাদের

যে সম্মান ও সৌজন্য দেখান তার চেয়ে অধিক বোধকরি সারা পৃথিবীতে আর কেউই পারবেন না।

ভালো ভালো লোকেদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণে আনার সময় স্বীকার করি বেকার- সাহেবের সংগে থাকাটা আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের সময়। উপরওয়ালার কর্তৃত্বের চেয়ে বন্ধুত্বের প্রশ্রয়ই ছিল বেশি। বাবা মায়ের অভাব সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছিল একজন স্নেহপ্রবণ, মানবিক ও দয়ালু পরদেশী।

মনে আছে সে বছরে দুর্ভিক্ষে প্রচুর মানুষ মারা যাবার ঘটনাও। দারুন খরা, অনাবৃষ্টি, মাটি শুকিয়ে কাঠ, জলের অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া।

দলে দলে লোক পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। যাদের চাষবাস কুয়োর জলের ওপর নির্ভরশীল ছিল, এসময় তাদের অবস্থাটা একটু ভালো ছিল। এদের বেশিরভাগই ছিলেন নবাব আর ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গ। যতখানি সম্ভব তারা গরীব অনাহারী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

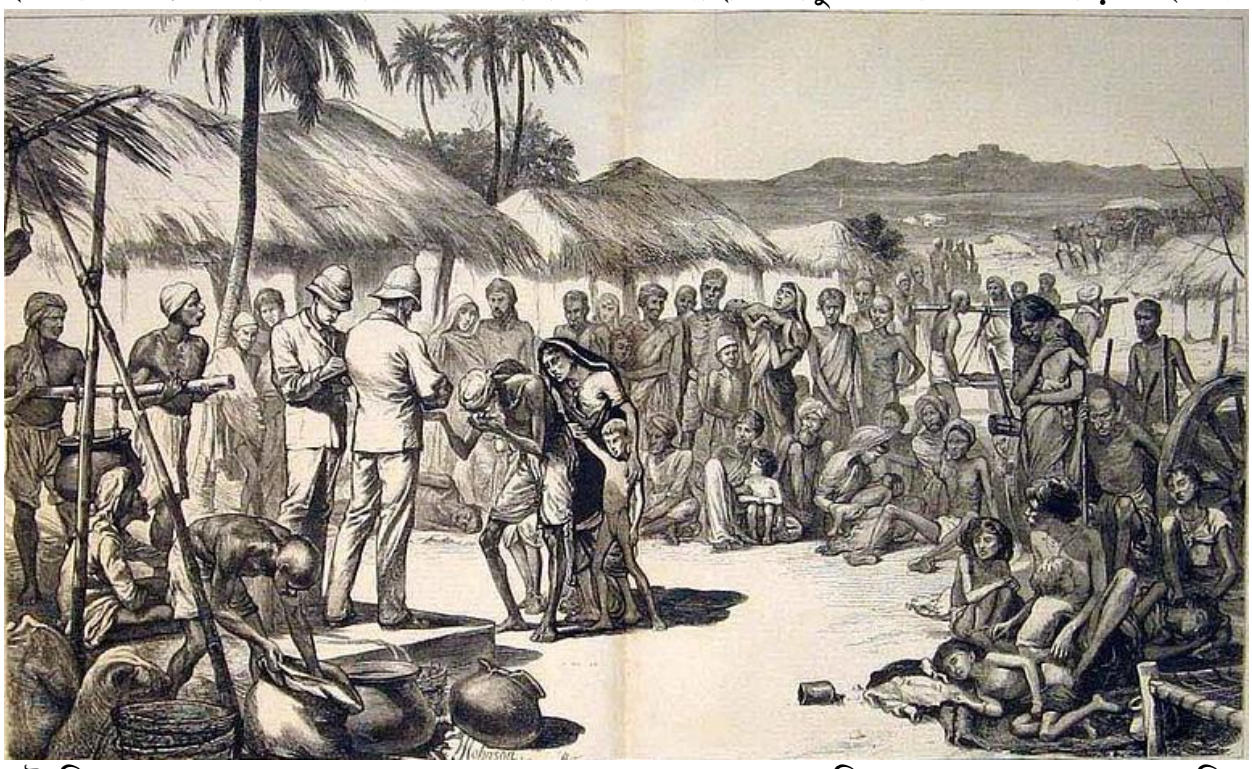

এই নিরন্ন মানুষগুলোর মধ্যে তারা চাল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করতেন। তাদের বাড়ির চারপাশে ভিড় করে আসা দরিদ্র মানুষেরা খিদের জ্বালায়, অনাহারে এমন তলানিতে এসে ঠেকেছিল যে সেখানেই মরে পড়ে থাকত। দেশের বিপুল সোনাদানা হিরে- জহরৎ কোনো কাজে আসেনি, অথচ সেসব নয় দরকার ছিল কেবলমাত্র সময়মতো দুমুঠো ভাত।

(তৃতীয় চিঠি শেষ)

।১১।

বিকেলবেলা রওনা দিয়ে তিনদিন পথ চলে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম নিরমূল শহরে। শহরে ঢুকে দেখি বদ্রীনাথ মুসলমান সাজ পরেই একটা দোকানে রাস্তার দিকে পিঠ করে বসে একজন ভদ্র চেহারার মানুষের সঙ্গে গল্প করছে। আমি গিয়ে তাকে জামাল খান বলে ডাকতেই সে ঘুরে আমায় দেখে একেবারে জড়িয়ে ধরল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "সব ঠিক আছে তো?"

সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। আমি আর দাঁড়ালাম না। তার থেকে তাদের আস্তানার খবর নিয়েই তাড়াতাড়ি ঘোড়া ঘুরিয়ে সেদিকে রওনা হয়ে গেলাম।

খানিক বাদে আমি আর জোরা তাঁবুতে বসে যখন গরম খিচুরি আর কিমার তরকারি দিয়ে খাওয়াদাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছি এমন সময় বাইরে থেকে বদ্রীনাথের গলার শব্দ পাওয়া গেল। তার সঙ্গে অন্য একজন মানুষেরও গলার আওয়াজ আসছিল। বের হয়ে এসে দেখি তার সঙ্গে দোকানে দেখা সেই ভদ্রলোক এসেছেন। আমাকে বের হয়ে আসতে দেখে বদ্রীনাথ আমায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিল, "জনাব, এই আমার নিজের ভাই। আজ এসে পৌঁছোল। ওর গোটা কাফিলাটা শহরের বাইরে ঘাঁটি গেড়েছে। ও এসেছে আমায় নিয়ে যেতে। এইবার আমরা সব একসঙ্গে পথ চলব। আপনি ওকে আপনার সব কথা বলতে পারেন। ও রাজি থাকলে--"

লোকটা আমার দিকে ফিরে বলল, "বড়ো বিপদে পড়েছি জনাব। সেসব কথা আপনার ভাই আপনাকে সব গুছিয়ে বলবে। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা আপনার কাছে। আমাকে আপনাদের দলের সঙ্গে মিশে পথ চলবার অনুমতি দিন। নইলে আমার শত্রুরা রাস্তায় চিনতে পারলে আমার জান নিয়ে নেবে।"

আমি ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজে বুঝে নিলাম। নতুন শিকার ধরা হয়েছে। বদ্রীনাথের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে নিয়ে বললাম, "আমার ভাই যখন আপনাকে সঙ্গে করে এনেছে তখন আমারে ব্যাপারে কোন আপত্তিই নেই। তবে কিনা, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমরাও তো আপনার শত্রুর বিষনজরে পড়বো, দরকারে আপনার জন্য লড়াইও করতে হতে পারে। তার জন্য তো কিছু খরচাপাতিও আছে!"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "নিজের জীবন নিয়ে দরদস্তুর আমি করব না। কত লাগবে বলুন।"

আমি বেশ একটু ভেবেচিন্তে বললাম, "তা ধরুন গিয়ে দেড়শো টাকা আপনার পক্ষে খুব বেশি হয়ে যাবে কি?"

"বেশ তাই দেবো। অর্ধেক এখন দিচ্ছি, বাকি অর্ধেক হায়দরাবাদে পৌঁছে মিটিয়ে দিলে হবে?"

"হবে," আমি বললাম, "যদি অনুমতি করেন তো পথে আপনার শত্রুর নজর এড়াবার একটা বুদ্ধি আমি দিতে পারি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন," ভদ্রলোক কৌতুহলী চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, "আমার ভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে তাঁর পরিবারের মেয়েরা যাচ্ছেন। আপনিও একটা গাড়ি কিনে নিয়ে তাতে চেপে ভাইয়ের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন চলুন।পরিবারের মেয়েদের গাড়ি দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না।"

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে বললেন, "আশ্চর্য! এ বুদ্ধিটা আমার মাথায় এতক্ষণ আসে নি কেন? কিন্তু মুশকিল হোল, আমি যদি গাড়ি কিনতে যাই তাহলে তো দুনিয়াশুদ্ধু লোক টের পেয়ে যাবে এ আমি পালাচ্ছি-"

বদ্রীনাথ হাত নেড়ে বলল, "ওসব আপনি ভাববেন না। একশোটা টাকা দেবেন, গাড়িটাড়ি যা লাগে আমিই কিনে এনে দিচ্ছি।"

মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "আরেকটা কথা। আমার সাথে গোটা দুই করে ঘোড়া আর উট আছে। তিনচারটে চাকরও আছে। সেসব সঙ্গে নেয়া যাবে তো?"

"যাবে। শহরে ফিরে গিয়ে ওদের আজই সন্ধের পর এখানে পাঠিয়ে দিন। কারো চোখে না পড়ে যেন।"

"হ্যাঁ, এই যাই। চাকরদের কী করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে টাকাপয়সা নিয়ে আসি গিয়ে," বলতে বলতে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বিদেয় হলেন।

তিনি চোখের আড়ালে যেতেই বদ্রীনাথ আমার পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল, "সাবাস। টোপ গিলেছে।"

জানা গেল ভদ্রলোক একজন সরকারী খাজনা সংগ্রাহক। অনেক শত্রু তাঁর এখানে। রইস আদমি। সঙ্গে উট, ঘোড়া চাকরবাকর নিয়ে চলেন। বাড়াবাড়িরকমের কিছু একটা গড়বড় করায় এখান তাঁর প্রাণ সংশয় হয়েছে। বদ্রীনাথ তাঁকে বুঝিয়েছে যে আমাদের দলের সঙ্গে মিশে গা ঢাকা দিয়ে হায়দরাবাদ পৌঁছোনোটা তাঁর পক্ষে নিরাপদ হবে। একে শিকার করে ভালোরকম আয়রোজগার যে হবে সেটা ভালোই বুঝতে পারছিলাম আমরা। বদ্রীনাথের আড্ডা ছেড়ে তাড়াতাড়ি আমি আমাদের দলের ঘাঁটিতে ফিরে এলাম। আমায় দেখে বাবা অবাক হয়ে বলল, "এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে? মেয়েটা ভালো আছে তো?"

বললাম, "ওসব কথা এখন থাক বাবা। জালে শিকার পড়েছে।" এই বলে বাবাকে আমি সব কথা খুলে বললাম।

সবকথা শুনে বাবা বেজায় খুশি। বললেন, "যা , তুই বদ্রীনাথের ওখানে ফিরে যা। লোকটাকে জিনিসপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি পাঠাস। আমি আজ রাতেই ঠিক জায়গা খুঁজে কবর খুঁড়ে রাখবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বদ্রীনাথের আড্ডায় গিয়ে দেখি সে শহরে গিয়েছে, জোরার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পসল্প করে কাটাবার পর অবশেষে সে ফিরল। একটা নাচিয়ের দলের থেকে একটা পর্দাঢাকা মেয়েদের গাড়ি আর একজোড়া বলদ কিনে নিয়ে এসেছে। তার গারোয়ানকে কটা পয়সা বকশিস দিয়ে বিদায় করে বদ্রীনাথ হাসিমুখে বলল, "পঁচানব্বই টাকায় হয়ে গেল। এইবারে গাড়ির সওয়ার ঠিকঠাক এসে পৌঁছুলেই হয়।"

"আসবে তো?"

বদ্রীনাথ হেসে মাথা নাড়ল, "না এসে যাবেটা কোথায়? দেখে এলাম শহরের হাকিমের কাছে গেছে কথাবার্তা বলতে। নিজের চাকরবাকর, উট, ঘোড়া সবকিছু লুকিয়ের লুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার বাবার ঘাঁটিতে। নিজেও আজ রাতের মধ্যে আমার কাছে এসে উঠবে।"

বদ্রীনাথ ভুল কিছু বলে নি। অন্ধকার হতে না হতে আমাদের বন্ধুটি এসে হাজির। পেছন পেছন একটা চাকর তার হুঁকো, বিছানাপত্র, মোম মাখানো কাপড়ে তার ধনসম্পত্তির পুঁটুলি, সব মাথায় করে আনছে। কাছে এসে সে প্রথমেই আমার হাতে পঁচাত্তর টাকা দিল। আমার অগ্রিম।

টাকাগুলো গুনে নিয়ে আমি বললাম, "মশায়ের নামটা?"

"উপস্থিত কুমল খান নামে ডাকবেন। হায়দরাবাদে গিয়ে আসল নামটা বলব।"

হেসে বললাম, "নিজের পরিচয় গোপন রাখবেন সে ঠিক আছে। তা খানসাহেব, এখন কথাবার্তা না বলে বরং খানিক বিশ্রাম নিয়ে নেয়া যাক।"

খানসাহেব বেশ ক্লান্ত ছিলেন। কথাটা বলতে না বলতেই তিনি একটা ফাঁকা জায়গা দেখে নিয়ে কার্পেট বিছিয়ে তার ওপর লম্বা হলেন। বদ্রীনাথও গিয়ে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখি দুজনেরই নাক ডাকছে।

কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। পাশাপাশি দুটো লোক শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কয়েকঘন্টার মধ্যে তাদের একজন যাবে মাটির নিচে কবরে, আর অন্যজন ফের একটা নতুন শিকারের খোঁজে বের হবে! এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আমারও চোখ জুড়ে এলো।

খানিক বাদে আমাদের লোকজনের ডাকে ঘুম ভাঙল। দেখি যাত্রার জন্য সবাই তৈরি। জোরা আর তার বুড়ি দাইকে তাদের গাড়িতে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। পাশের গাড়িতে কুমল খান। দলটাকে নিয়ে রওনা হয়ে শহরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে রাস্তায় আমরা বাবার দলের দেখা পেলাম। জোরাদের গাড়িটাকে আগে আগে রওনা করিয়ে দিলাম প্রথমে। তারপর আমি বাবার কাছে যেতে বাবা বলল, "সব তৈরি। ভুত্তোট কারা হবে, কারা সামসিয়ার (ভুত্তোট শিকারকে খুন করবার সময় যারা হাতপা ধরে রাখে) কাজ

করবে, সব ঠিক আছে। কুমল খানের কাছে কোন অস্ত্রটস্ত্র নেই তো আবার? দেখে নিয়েছিস তো?"

বললাম, "লোকটার কাছে তলোয়ার আছে একটা। তবে ভেবো না। আমি আর বদ্রীনাথ সামলে নেবো।"

"হুঁ। তোরা কিন্তু একটু পিছিয়ে থাকিস। সামনের দলটাকে মারার শব্দটব্দ পাবে না তাহলে। ঠিক সময় হলে আমি একটা লোক পাঠিয়ে দেবোখন তোর কাছে।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাবে'খন।"

বুকের ভেতর একটা তীব্র আনন্দের অনুভুতি হচ্ছিল। দারুণ একটা শিকার খেলা শুরু হতে চলেছে। বাবা আমায় তাহলে এই অনুভুতির কথাই বলেছিল! সাধারণ মানুষের জীবনে এমন উত্তেজনার সুযোগ কোথায়? এরপর একদিন আমি এই দলটার জেমাদার হবো। সারা দেশে আমার নাম ছড়িয়ে যাবে। কত মেয়ের বুক ধুকপুক করবে আমার বীরত্বের কথা শুনে! বিড়বিড় করে আমি নিজেকেই বলছিলাম, "তারপর— তারপর এমন সব কীর্তি রাখবো আমি যে তার কাছে এই ছোটখাট খুনখারাবি তুচ্ছ হয়ে যাবে- -"

"কী এত বিড়বিড় করে বকছো? চলো।" পাশ থেকে বদ্রীনাথের কথায় আমার চমক ভাঙল। তাড়াতাড়ি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আমি আমাদের ছোট দলটার দিকে এগোলাম। গাড়ির জানালা দিয়ে কুমল খান মুখ বাড়িয়ে বসেছিল। আমায় আসতে দেখে বলে, "সব ঠিক আছে তো?"

বললাম, "সব ঠিক আছে। আমার কাফিলা আগে আগে বের হয়ে গেছে। আমি, আমার ভাই আর কয়েকজন লোক আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলবো।"

"ভালো , ভালো," মাথা নাড়লো কুমল সিং, "আমি তবে একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখি। যা ঝাঁকানি!"

"বেশিক্ষণ আর ঝাঁকুনির কষ্ট হবেনা জনাব। একটু সহ্য করুন," বদ্রীনাথ গলা উঁচিয়ে আশ্বাস দিল।

আমি আর বদ্রীনাথ ঘোড়া ছুটিয়ে আগে আগে এগিয়ে চলছিলাম। খানিক বাদে দেখি জমিটা সামনের দিকে উঁচু হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল ঘন হয়ে আসছিল। বোঝা যাচ্ছিল কাছেই কোন বড় নদী থাকবে। চাঁদের আলোয় একবার আমি তার জলের চিকচিকও দেখতে পেলাম বলে মনে হল। আমাদের কাজের পক্ষে একেবারে আদর্শ জায়গা।

"এইখানটাই জায়গা ঠিক হয়েছে নিশ্চয়। একটু দঁড়িয়ে যাই। গাড়িটা আসুক," আমি বদ্রীনাথকে বললাম।

খানিক দাঁড়াবার পরই পেছন থেকে গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। ঠিক তখন বাবার কাছ থেকে পরিকল্পনামতো একজন লোক এসে পৌঁছুল আমাদের কাছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খবর কী? সব তৈরি?"

সে বলল, "হ্যাঁ। বাকিদের কাজ শেষ। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

গাড়ি ততক্ষণে আমাদের কাছে এসে পড়েছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে আমরা গাড়ির পেছন পেছন চলা শুরু করলাম। উঁচু জমিটার মাথায় উঠে রাস্তা নেমে গেছে উল্টোদিকে নদীর খাতের দিকে। তার মাঝামাঝি একটা উঁচু ঢিবিমতো ছিল। আমার ইশারায় গাড়োয়ান গাড়িটাকে তার একেবারে গায়ে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিতে সেটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উলটে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা তার পাশে পৌঁছে দেখি কুমল সিং গাড়ির নিচে চাপা পড়ে গোঙাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাকে ধরে তুলতে সে তো গারোয়ানের উদ্দেশ্যে গালাগালের বন্যা ছুটিয়ে দিল। বলে "ব্যাটা অন্ধ। এত জায়গা থাকতে ঠিক গিয়ে ঢিবির গায়েই ধাক্কা দিতে কে বলেছিল তোকে?"

বললাম, "ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। কিন্তু আগে বলুন, আপনার বেশি চোটটোট লাগেনি তো?"

"ডান হাতটায় লেগেছে একটু। উঃ এই ভয়ানক গাড়িতে না চড়ে আমি যদি একটা ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারতাম!"

"সে আর এখন হবে কী করে?" বদ্রীনাথ বলল, "বরাত ভালো যে হাড়গোড় কিছু ভাঙেনি। এরপর থেকে আমরা আপনার কাছেকাছেই থাকছি। আর কোন বিপদ হবে না দেখবেন।"

গাড়োয়ান ততক্ষণে গাড়িটাকে ফের সোজা করে নিয়ে ভেতরে কুমল সিং-এর গদি-বিছানা ঠিকঠাক করে দিয়েছে। গজগজ করতে করতে কুমল সিং গাড়ির চাকায় পায়ের চাপ দিয়ে যেই চড়তে গেছে, আমি তার পেছনে এসে গলায় রুমাল জড়িয়ে ধরে টান দিলাম।

"এ-এটা—কী—" এর বেশি আর কিছু বের হল না তার মুখ থেকে। ঘরঘর করে মৃদু শব্দ করে সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল। রুমালের একটা মোচড়েই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে।

"বাঃ। একেবারে পরিষ্কার কাজ। আমি নিজে এত ভালো করে করতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে হে," বদ্রীনাথ আমার তারিফ করে উঠল।

মৃতদেহটাকে গাড়ির ভেতর চড়িয়ে নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ছুটলাম।

আমার একটু সন্দেহ হচ্ছিল। লোকটা এত তাড়াতাড়ি এলিয়ে গেল! ঠিকঠাক মরেছে তো? নলে গাড়ির ঝাঁকুনিতে ফের যদি জেগে ওঠে? সন্দেহের কথাটা বদ্রীনাথকে বলতে সে হেসে বলে, "তাহলে আর একবার মারলেই হবে। মুশকিল কী। তবে মীরসাহেব, যে মোচড় মেরেছো, তার পর কোন মানুষ বাঁচে না। গুরুর কাছে তালিমটা তোমার ভালোই হয়েছে হে। ও নিয়ে ভেবোনা।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম "যতবার কাজটা করি আমার নিজের ওপরে ভরসাটা আরো বেড়ে যায় বদ্রীনাথ। এখন তো মনে হচ্ছে আরো গোটা দুতিন শিকার হাতের কাছে পেলে তা-ও সাবড়ে দিতে পারবো।"

“থাক থাক। এক রাতে অত কাজে কাজ নেই। আমাদের লোকজন সব সামনে অপেক্ষা করছে। চলো তাড়াতাড়ি--” বলতে বলতে জোরকদমে ঘোড়া ছোটালো বদ্রীনাথ।

কিছুদূরে কয়েকজন লোক নিয়ে বাবা অপেক্ষা করছিলো। কাছে গিয়ে পৌঁছোতে জিজ্ঞাসা করল, “মারতে পেরেছিস?”

“হুঁ। ওই তো গাড়ি করে নিয়ে এসেছি।”

বাবা বদ্রীনাথের দিকে ফিরে বলল, “আমীর নিজেহাতে মেরেছে তো?”

বদ্রীনাথ মাথা নেড়ে বলল, “এক্কেবারে একা হাতে। আমি কাছেও যাইনি।”

“আলমুদ উ ইল্লা। এই তো আমার যোগ্য ছেলে! এখন যা, এগিয়ে গিয়ে দলের নাগাল ধর। আমরা একটু বাদে শরীরটার বন্দোবস্ত করে গিয়ে তোদের নাগাল ধরে নিচ্ছি।”

লোকটার হাতের থেকে তার আঙটিটা হাতিয়ে নিয়ে কোমরবন্ধের মধ্যে রেখে বাবা আর তার লোকজনকে পেছনে রেখে আমি নদীর দিকে ঘোড়া ছোটালাম।

নদীর পাড়ে পৌঁছে দেখি ততক্ষণে আমাদের দলবল অন্যপাড়ে গিয়ে উঠেছে। সেটা ছিল গোদাবরী নদী। নদী পাড় হয়ে, ধীরেসুস্থে এগিয়ে যেতে থাকা দলটার মধ্যে দিয়ে আমি ঘোড়া ছোটালাম জোরার গাড়ির খোঁজে। তাকে কয়েকজন লোক দিয়ে আগেই রওনা করে দেয়া হয়েছিল। তবে বলেছিলাম আস্তে চালাতে। নাগাল ধরতে এখন অসুবিধে হবে না।

ভাগ্য ভালো যে আমি তার খোঁজে এগিয়ে গিয়েছিলাম। খানিক দূর এগোতে না এগোতে শুনি সামনের দিক থেকে হৈহল্লার শব্দ উঠেছে। এ জায়গায় রাস্তাটা অরূ। দুপাশে ঝোপজঙ্গলের ভিড়। চোরডাকাতের উপদ্রব হওয়া বিচিত্র নয়। অল্প লোক নিয়ে রাতের বেলা গাড়ি যাচ্ছে দেখলে আক্রমণ করা বিচিত্র নয়। তাড়াতাড়ি আর একটু এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল, যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখলাম, খোলা তলোয়ার হাতে একদল ডাকাত ঘিরে ধরেছে জোরার গাড়িটাকে। আমার লোকজন গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে লড়াই দিচ্ছে বটে, কিন্তু অতগুলো ডাকাতের সঙ্গে সেই পাঁচ-ছজন মানুষ আর বেশিক্ষণ যুঝতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। তাদের নড়াচড়ায় ক্লান্তির ছাপ। আমি এগোতে এগোতেই আমাদের একজন লোক ডাকাতের তলোয়ারের কোপে মারা পড়ল। আমি আর দেরি না করে বিসমিল্লা বলে হাঁক ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারের এক কোপে একটা ডাকাতের মুণ্ডু মাটিতে ফেলে দিলাম। হঠাৎ আমাকে আসতে দেখে আমার দলের লোকজনও নতুন উৎসাহে জিগির দিয়ে উঠল। দ্বিতীয় একটা ডাকাত তলোয়ার উঁচিয়ে আমার ইকে তেড়ে আসছিল। আমি কোমর থেকে পিস্তল বের করে তার বুকে গুলি চালিয়ে দিলাম। এইবারে ডাকাতের দল বিপদ বুঝে আর দাঁড়াল না। মুখ ঘুরিয়ে

পিঠটান দিল। তাদের তাড়া করে গিয়ে একটা কমবয়েসি ছেলেকে ধরে ফেলল আমার লোকজন। বাকিরা পালিয়ে গেল।

।১২।

গাড়ির ভেতর জোরা আর তার দাই বসে ভয়ে কাঁপছিল। তাদের শান্ত করে ঘটনাটা শোনা গেল। চোরের দল প্রথমে ঝোপের ভেতর থেকে তাদের দিকে পাথরটাথর ছুঁড়ে তারপর হঠাৎ বের হয়ে এসে আক্রমণ করে। ভেবেছিল বোধ হয় সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই।

ততক্ষণে বাবা আর বাকি দলটা এসে পৌঁছে গেছে। ধরা পড়া ছেলেটার পায়ে চোট লেগেছিল। হাঁটতে পারছিল না। তাকে আর গুলি খাওয়া চোরটাকে কুমল সিং-এর গাড়িতে চড়িয়ে দেয়া হল। ছেলেটার হাতপা বেঁধে গলায় একটা দড়ি পরিয়ে দড়ির অন্য দিকটা আমি ধরে রাখলাম। তারপর আহতদের শুশ্রূষা করবার জন্য জনাকুড়ি লোককে পেছনে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম।

ভোর ভোর আমরা এসে পৌঁছোলাম একটা বড়োসড়ো গ্রামে। সেখানে লোকজন তখন জেগে উঠেছে। গ্রামের মোড়লের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম আমরা। লোকটি হিন্দু। জাতে কায়স্থ। নাম মোহন লাল। খানিক অপেক্ষা করবার পর তার দেখা মিলল। বাবা নিজের পরিচয় দিল ব্যাপারী বলে। আমরা তার দেহরক্ষীর দল। তারপর তাকে রাতের ডাকাতির কথা সব খুলে বলতে সে চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, "হতেই পারে না। এ এলাকায় এমন উৎপাত বিশেষ নেই।"

জবাবে বাবা বলল, "দুটো ডাকাতকে ধরে সঙ্গে করে এনেছি আমরা। তাদের দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে তো?"

"তা যদি বলেন তাহলে তো ব্যাপার অন্যরকম হয়," মোহনলাল মাথা নাড়ল, "কই, নিয়ে আসেন দেখি। জিজ্ঞেসাবাদ করে দেখা যাক।"

গাড়ি থেকে প্রথমে কমবয়েসি ছেলেটাকে নামিয়ে মোড়লের কাছে আনা হল। মোড়ল তাকে অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষে হাল ছেড়ে দিল। ছেলেটা একটা কথাও বলে না। শেষে বদ্রীনাথের বুদ্ধিতে তাকে অনেকক্ষণ ধরে চাবকে পিঠে রক্ত বের করে দেয়া হোল। তাতেও কোন ফল নেই। এইবারে মোহনলাল রেগে গিয়ে বলে, "দাঁড়াও ব্যবস্থা হচ্ছে। ছাই ভরে একটা থলে আন তো! দেখি এ ব্যাটা কথা না বলে থাকে কী করে?"

ঘোড়াকে দানা খাওয়াবার একটা চামড়ার থলেতে গনগনে গরম ছাই ভরে থলেটা তার মাথায় উলটে পরিয়ে দেয়া হল। সেই সঙ্গে পিঠে গুমগুম করে কিল, যাতে সে দম টানে। একটুক্ষণ বাদেই শোনা গেল ছোকরা জড়িয়েমড়িয়ে কিছু বলছে। তখন থলে সরাতে সে খানিক কেশে টেশে তারপর আমাকে যা নয় তাই বলে গাল দিতে দিতে

বলে, "তুই আমার বাবাকে গুলি করে মেরেছিস। আমি তোদের কিচ্ছু বলব না। আমায় মার, ধর কি ফাঁসিতে চড়া, যা খুশি কর।"

শুনে মোহনলাল বলে "আরে হ্যাঁ, অন্যটার কথা তো ভুলেই গেছিলাম। নিয়ে আয় দেখি সেটাকে।"

গুলি খাওয়া লোকটাকে একটা মাচায় শুইয়ে নিয়ে আসা হল যখন তখন তার একেবারে শেষ অবস্থা। শ্বাস উঠে গেছে। একে জিজ্ঞাসাবাদ করে লাভ কিছু হবে না। কাজেই আমরা আবার তার ছেলেটাকে নিয়েই পড়লাম। তবে বারবার চাবুক আর গরম ছাইয়ের ওষুধ দিয়েও আর কোন ফল হোল না। সে শুধু আমায় গালাগাল দেয়া ছাড়া অন্য কিছুই বলল না।

খানিক বাদে অধৈর্য হয়ে মোহনলাল বলে, "এটাকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না দেখছি। এটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলেই বখেরা চুকে যায়।

"তাই দিন," বাবা বলল, "দেখুন যদি গলায় দড়ির প্যাঁচ পড়লে তখন কিছু কবুল করে।"

মোহনলাল মাথা নেড়ে বলে, "মনে তো হয় না। এই কে আছিস, মাঙ্গদের খবর দে।"

খানিকক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন মাঙ্গ এসে হাজির। এই ফাঁসুরেগুলোর মত ঘেন্নার জীব আর হয় না। ছেলেটাকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে মোহন লাল বলল, "এখনো যা জানতে চাইছি সব বল। তোকে ছেড়ে দেবো, একটা চাকরিও দেবো।"

ছেলেটা এইবার একটু ইতস্ততভাব করল, কিন্তু তার পরেই তার মরতে থাকা বাবার দিকে চোখ যেতে ফের তেড়েফুঁড়ে উঠে গালাগাল শুরু করে দিল। বলে, "বাবার যদি বাঁচার অবস্থা থাকতো তাহলে তাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য তোমরা যা বলতে করতাম, কিন্তু বাবা আর বাঁচবে না। তাহলে আর আমার বেঁচে কী হবে? "

মোহন লাল মাথা নেড়ে মাঙ্গদের বলল, "নিয়ে যা এটাকে আমার সামনে থেকে। ভালোভাবে কাজটা করিস। কোটালকে খবর পাঠিয়ে দেবো। কাজ সেরে তার কাছে যাস একটা ভেড়া আর বেশ খানিক মদ দিয়ে দেবেখন তোদের।"

লোকগুলো মোড়লকে সেলাম করে ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"ফাঁসীটা হবে কোথায়?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সেখানে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি ছোকরাকে দিয়ে কিছু বলানো যায় কি না। তাহলে এর প্রাণটা বেঁচে যেতো।"

"হবে ওই গ্রামের বাইরে কোথাও। আমি ঠিক জানিনা। তবে আমার লোকজন আপনাকে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে।তবে কেন আর ঝামেলা নেবেন? ওতে কাজ হবে না সে আমি আগেই বলে দিচ্ছি," মোহনলাল বলল।

"না মানে আমার একটু কৌতুহলও হচ্ছে। ব্যাপারটা আমি একেবারে শেষ অবধি দেখে নিতে চাইছিলাম।"

বদ্রীনাথ তখন এগিয়ে এসে বলে, "চলো আমিও যাব।"

আমরা দুজন মিলে ফাঁসুড়েদের পিছু পিছু চললাম।

গ্রামের সীমানা পেরিয়ে তীরছোঁড়া দূরত্বে দুটো পাতাঝড়া নিমগাছ। সেখানে লোকজন এসেভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়েছে ফাঁসুড়েদের ঘিরে। কাছে গিয়ে দেখি গাছের ডালে ফাঁসির দড়ি ততক্ষণে টাঙানো হয়ে গেছে। একজন মাঙ্গ, গাছের নিচে বসানো একটা পাথরের মূর্তির গায়ে একটা ছুরিতে শান দিচ্ছিল বসে বসে। আমি ছেলেটার কাছে গিয়ে বললাম, "তুমি বাঁচতে চাওনা? কতই বা বয়স তোমার? আমি আবার বলছি, সব কথা বললে আমি তোমায় বাঁচিয়ে দেবো।"

"আমার হাতের বাঁধন ঢিলে করে দিন একটু, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব। খুব ব্যথা করছে," ছেলেটা জবাব দিল।

আমি একজন মাঙ্গকে ডেকে বললাম, "ওর বাঁধনটা ঢিলে করে দিয়ে দড়ির অন্যদিকটা ধরে সাবধানে রাখো তো!"

ছেলেটা মৃদু হেসে বলল, "আজ না হোক কাল তলোয়ারের কোপে কি ফাঁসীর দড়িতে মরতে তো হতই আমায়। তাতে আমার আক্ষেপ নেই। কিন্তু নিজের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি বাঁচতে চাইনা। আমার বাবা মরেছে। কাকাও মরেছে কালকের লড়াইয়ে। কার সেবা করবার জন্য আমি বেঁচে থাকবো তাহলে? একটা রাতে আমি একেবারে অনাথ হয়েছি। সবই আমার ভাগ্য। মোহনলালকে বলবেন, সে আমার

প্রাপ্নিয়েছে। এই পাএর দাম তাকে চোকাতে হবে একদিন, ” এই বলে সে মাঙ্গদের দিকে ঘুরে বলল, “তোমরা তোমাদের কাজ সারো। আমার আর কিছু বলার নি।”

আমি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বদ্রীনাথ আমাকে থামিয়ে দিল। বলে, “লাভ কী? এ কোন কথা শুনবে না।”

মাঙ্গরা এইবার ছেলেটাকে উপুড় করে ফেলে সেই ধারালো ছুরিটা দিয়ে তার গোড়ালির ঠিক ওপরের শিরাদুটো কেটে দিল প্রথমে। তারপর তাকে তুলে ধরে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দিল। তার ছটফট করতে থাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে বদ্রীনাথ বলে, “ধুত! এর চেয়ে আমাদের কাজ অনেক ভালো। যে মরবে তার কষ্ট হওয়া দূরে থাকে সে মরবার আগের মুহূর্ত অবধি কিছু জানতেই পারে না! ”

“ঠিক, ” আমি মাথা নাড়লাম, “এখন চলো, ফেরা যাক। কুমল সিং-এর থেকে কী কী পাওয়া গেল সেই দেখি গিয়ে।”

কুমল সিং-এর কাছে দুটো বড় বাক্স আর একখানা পুঁটুলি ছিল। প্রথম বাক্সটা খুলে দেখা গেল তাতে তার সরকারী কাগজপত্র ঠাসা। কাগজগুলোকে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে ফেলা হোল। তার নিচে সোনাভর্তি থলে মিলল একখানা। দু নম্বর বাক্সটা খুলে তার থেকে প্রথমে বের হল অনেকগুলো রূপোর বাঁট। তার নিচে দশখানা বড় বড় সোনার বাঁট পাওয়া গেল। সেগুলো সব বাবার কাছে ন্যান্য লুটের মালের সঙ্গে জমা পড়ল। পুঁটুলিটা খুলে দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে নাগরি বা গুজরাটি ভাষায় লেখা বেশ কিছু হুন্ডি। গুনে দেখা গেল সাকুল্যে চার হাজার আটশো টাকার হুন্ডি রয়েছে। বাবার ইচ্ছে ছিল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে, নাহলে ভাঙাতে গেলে তাতে লোকটা র নাম দেখে আমাদের ধরে ফেলতে পারে লোকজন। আমি কাগজগুলো পোড়াতে রাজি হলাম না। বললাম, “একটু সাবধানে, নিজেদের কুমল সিং-এর লোক পরিচয় দিয়ে হুন্ডিগুলো ভাঙাবার একটা চেষ্টা করতে চাই আমি।”

কাগজগুলো আমি রেখে দিলাম। পরে এতে আমার অনেক লাভ হয়েছিল।

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

বইপড়া

জাদু মাছের গল্প

মহাশ্বেতা

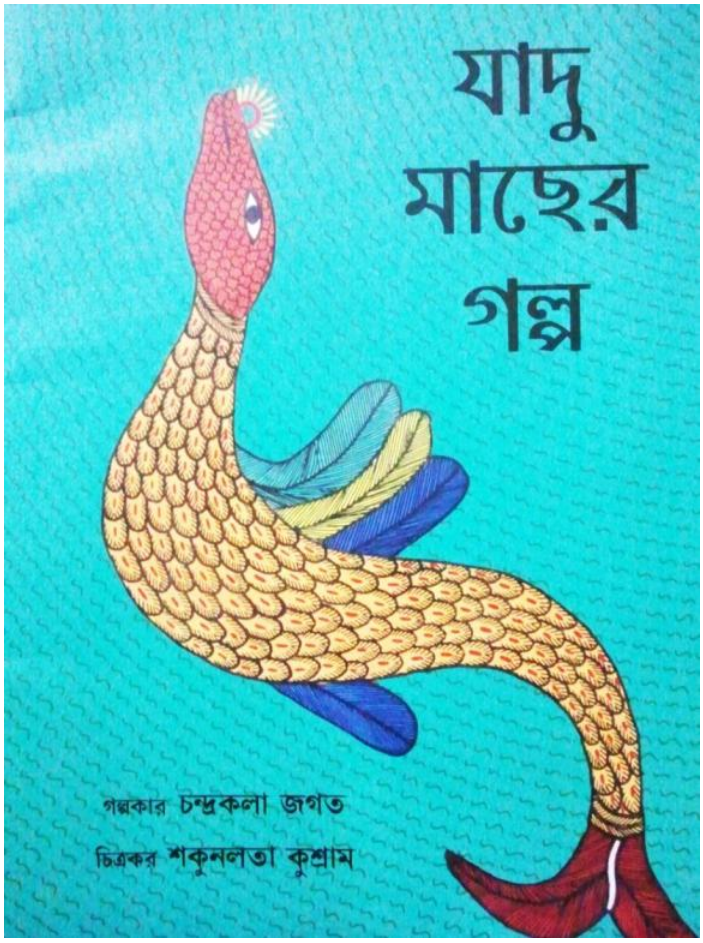

এবার শীতে একটু লোককথা পড়া যাক। মধ্যপ্রদেশের এক প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠী – গোন্ডদের উপকথা এটা। দুনিয়ায় এক সময় সব আনন্দ ফুরিয়ে গেছিল। চারিদিকে শুধু ঝগড়াঝাঁটি ও মারামারি। সবাই খালি মনের ভেতর কালো কালো দুঃখের বোঝা নিয়ে মুখ কালো করে ঘুরে বেরাতো। চারিদিকে যেন খালি সাদা আর কালো, কোন রঙ আর রইল না। সবাই যখন দুঃখ করতে ব্যস্ত তখন এক বুড়ি, যে কিনা ছিল মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, সে ঠিক করল পৃথিবীতে এত দুঃখকষ্ট আর থাকলে চলবে না। সে বসল চিন্তা করতে। এমন সময় এক দমকা হাওয়া বুড়িকে তার প্রশ্নের উত্তর বলে দিল। সে তার কানে ফিসফিস করে বলল যে, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ দূর করতে গেলে চলে যাও পাহাড় চূড়ায়, সেখানে পাবে সবজে রঙের টলটলে একটা দিঘী আর তাতেই তুমি পাবে আনন্দের সন্ধান। ঠাকরুণও কাজের মানুষ। যেই না এই কথা শোনা, সে তার তিন মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পাহাড়ের রাস্তায়। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে পাহাড়ের পথে উঠতে উঠতে তাদের পিঠে যে কুঁজের মত দুঃখ জমে উঠেছিল, সেগুলো আস্তে আস্তে খসে পড়ে গেল। মেয়েরা হয়ে উঠল চনমনে আর হাসিখুশি। তারপর? নাঃ আর বলছি না। বাকিটা জানতে পড়ে নিও ‘যাদু মাছের গল্প’। গল্পবলিয়ে চন্দ্রকলা যাদবের বলা এই গল্পটা ঝরঝরে বাংলায় অনুবাদ করেছেন অর্ণা শীল। প্রত্যেক পাতায় আছে মধ্যপ্রদেশীয় গুহাচিত্রর শৈলিতে আঁকা সুন্দর সুন্দর রঙিন সব ছবি। পড়ে ভাল লাগবে তোমাদের। পোড়ো কিন্তু!

তথ্য

নামঃ যাদু মাছের গল্প
লেখাঃ চন্দ্রকলা জগত
ছবিঃ শকুনলতা কুশ্রাম
প্রকাশকঃ তুলিকা প্রকাশনী
দামঃ ১৭৫ টাকা

বাবা ও ছেলে

মহাশ্বেতা

অনেকদিন আগে, এক গ্রামে থাকত এক বাবা ও তার ছেলে। এক পুর্ণিমার রাতে, চাঁদের আলোয় যখন চারিদিক ভেসে যাচ্ছিল, তারা ঠিক করল তারা জঙ্গলে শিকার করতে বেরোবে। পরদিন সকালে তারা তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দূরের ঘন জঙ্গলের রাস্তায় রওনা দিল। অনেক খুঁজে একটা ভাল জায়গায় তারা জঙ্গলের কাঠকুটো দিয়ে কদিন থাকবার জন্য একটা ছোটখাটো কুঁড়ে ঘর বানিয়ে নিল। তারপর বসল রান্না করতে। খাওয়ার পর ছেলের পেল রাম ঘুম। সুর্যোদয়ের সময় বাড়ি ছেড়েছিল তারা। তারপর মাইলের পর মাইল চড়া রোদে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটা। স্বাভাবিকভাবেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ছেলেটা। কিন্তু বাবার এসব করেই অভ্যেস। সে ছেলেকে ঘরের মধ্যে ঘুমোতে বলে নিজেই তীর- ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারে।

ওদিকে ছেলেটা ঘুমোবার জন্য চোখ বুজেই শুনতে পেল বাবা বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ গা শিরশির করে উঠল তার। এরকম একা একা কখনও থাকেনি সে। চারিদিক থেকে বিভিন্ন বুনো আওয়াজ কানে ভেসে এল তার – পাতার খসখসানি, হাওয়ার হু হু, জন্তু জানোয়ারের পায়ের শব্দ, প্যাঁচার ভুতুম ভুতুম, রাতপাখির ডানা ঝাপটানি। তারপর হঠাৎ মনে হল, এই অন্ধকারে এরকম

একটা জঙ্গলে সে একলা, যদি ভুত আসে? যদি ঘাড় মটকে মুখে পুরে নেয়? কিছুক্ষণ পর সে আর থাকতে না পেরে উঠে তার বাবাকে অনুসরণ করতে গেল।

বাবা অনেক এগিয়ে গেছিল । ছেলে বেশ কিছুক্ষণ জোর পায়ে হাঁটার পর তাকে দূরে দেখতে পেল। কিন্তু ছেলে বাবাকে ডাকল না আর কোনও আওয়াজ না করে গাছেদের মধ্যে দিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। এদিকে বাবাও এগোচ্ছে, ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে। কিছুক্ষণ পরে সে গাছের ডালে দেখল একটা জন্তু। অন্ধকারে বুঝতে পারলো না কি পশু, তবে ঠিক করল ওটাকে মেরেই শিকার শুরু করবে সে। সে হাতে অস্ত্র নিয়ে গাছ বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। একটা উচ্চতায় উঠে সে থামল, তারপর তীর ছুঁড়ে পশুটাকে মেরে ফেলল। তীর খেয়ে সেটা ধপাস করে মাটিতে পড়ল। ছেলে তখন আড়াল থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি মারলে এটাকে?"

এই শুনে বাবার গায়ে কাঁটা দিল। সে তো জানতো না যে ছেলে তার পিছন পিছন আসছিল। সে মনে করল কোন অপদেবতা বুঝি তার পিছু নিয়েছে। জঙ্গলের পশু মেরেছে বলে হয়তো এবার শাস্তি দেবে। সে তাই তাদের গ্রামে প্রচলিত অপদেবতার মন্ত্র আওড়াতে লাগল। গাছ থেকে এক ঝাঁপে নেমে সে বড় বড় পায়ে হাঁটা লাগালো সে তার ছেলেকে দেখতে। এদিকে ছেলে বাবাকে মন্ত্র আউড়াতে আউড়াতে চলে যেতে দেখে ভাবল বুঝি বাবাকে কোন অপদেবতা তাড়া করেছে, তাই সে ওরকম হনহন করে হেঁটে গেল। সেও এবার হাঁটা লাগালো বাবার পিছু পিছু। কিন্তু অপদেবতার ভয়ে কাছে গেল না তার।

অনেক দূর হেঁটে গেল তারা। কাঁটা ঝোপ আর বুনো ঘাসে লেগে হাত পা ছড়ে গেল দুজনের। বাবা ছেলের পায়ের শব্দ শুনে ভাবে, ওই বোধহয় ঘাড় মটকালো, সে আরও জোরে হাঁটে। ছেলে তাই দেখে ভাবে অপদেবতা বোধহয় বাবার মাথায় আরেকটু ভর করল, সেও তার গতি বাড়ায়। কিন্তু অপদেবতার ভয়ে একজনও থামে না। হাঁটতে হাঁটতে রাত ভোর হয়ে গেল। পাখিরা করতে লাগল কিচিরমিচির। তার মধ্যে বাবা দেখল দূরে গ্রামের বাড়ি দেখা যাচ্ছে আর ধোঁয়া। যেই দেখা, অমনি সে প্রাণপনে ছুট লাগাল গ্রামের দিকে। কোনরকমে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা চাইছিল সে। তাকে দেখে ছেলে ভাবল বাবার মাথায় অপদেবতা বোধহয় একেবারেই ভর করে গেছে, তাই ওরকম পাগলের মত ছুট লাগিয়েছে। সেও দৌড় লাগালো বাবার পিছু পিছু।

গ্রামে ঢুকে বাবা তো চিৎকার করে হাপিত্যেশ করতে লাগল। বিলাপ করতে করতে বলতে লাগল, "হায় ভগবান! শিকার তো করতে গেলাম, কিন্তু পড়লাম অপদেবতার পাল্লায়। ছেলেটাকে মনে হয় খেয়েই ফেলেছে। হায় হায় রে!" আর গ্রামের অন্যদিকে ছেলেও তখন একইভাবে কান্না জুড়েছে, "আমার বাবাকে ভূতে খেলো গো!"

শেষমেষ গ্রামের লোক যখন দু'জনকে একসাথে আনলো তখন তারা ভেউ ভেউ করে কেঁদে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। তাদের কথাবার্তা থেকে সব বুঝতে পেরে গ্রামের লোকে তো আর হেসে বাঁচে না। তারপর থেকে বাবা ও ছেলে কেউ শিকারে যাওয়ার নাম করলেই লোকে এমন অট্টহাসি হাসে যে তারা লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারে না।

পাপুয়া নিউ গিনির লোককথা

ছবিঃ মৌসুমী

বিশ্বের জানালা

নাউরু দ্বীপের কথা

উমা ভট্টাচার্য

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে মাত্র ২১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট দ্বীপ নাউরু। স্থানীয় ভাষায় ‘নাউরু’ কথার অর্থ “আমরা সাগরতীরে যাই”। নাউরু দ্বীপটির আগেকার নাম ছিল ‘প্লেজেন্ট আইল্যান্ড’। সুন্দর, মনোরম এই ছোট্ট দ্বীপটির এই নাম রেখেছিলেন একজন ব্রিটিশ তিমি শিকারি নাবিক জন ফার্ন।

৩০০০ বছর আগে থেকে যে দ্বীপটিতে পলিনেশিয়া আর মাইক্রোনেশিয়ার ১২টি উপজাতির মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলেছিল, সেটি প্রথম পশ্চিমী দেশের মানুষের নজরে আসে ১৭৯৮ সালে, জন ফার্নের আবিষ্কারের পর। ১৮৩০ সালের পর থেকে এখানে ইউরোপীয়রা আসতে শুরু করে। বসবাসও শুরু করে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে পথহারা নাবিক আর ব্যবসায়ীরা। এদের কাছ থেকে দ্বীপের সরল মানুষেরা ব্যবসা ক’রে খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে পেতে শুরু করে পশ্চিমী তালের রসের স্বাদু সুরা আর যুদ্ধাস্ত্র। প্লিজেন্ট আইল্যান্ডের সরল সাদাসিধে উপজাতির মানুষেরা পশ্চিমের সভ্য জগতের জটিলতার সংস্পর্শে হয়ে ওঠে জটিল, আর দ্বীপটি হয়ে ওঠে ‘আনপ্লেজেন্ট’। ১৮৭৮ সাল থেকে শুরু হয় আমদানি করা আগ্নেয়াস্ত্রের সদ্বব্যবহার। ঘটে যায় মিলেমিশে বাস করতে থাকা উপজাতিদের মধ্যে দীর্ঘ ১০ বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী জাতিদাঙ্গা। ১৮৮৮ সালে জার্মানি দখল করে বিপুল ফসফেটের ভাণ্ডার নাউরু দ্বীপ।

ইতিহাসের নানা বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে চলে,জার্মানি, ব্রিটেন,জাপান(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিনের জন্য) আর অস্ট্রেলিয়ার দখলদারি থেকে মুক্তির আকুতি জাগে নাউরুবাসীদের মধ্যে । নাউরু ১৯৬৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করে, আর জন্ম হয় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্রী দ্বীপরাষ্ট্রের- যার আয়তন মাইলের হিসাবে মাত্র আট দশমিক এক বর্গমাইল। সবচেয়ে মজার কথা, উপবৃত্তাকার এই দ্বীপরাষ্ট্রের কোনও রাজধানী শহর নেই।

সকালে প্রাতরাশের আগে সাইকেলে চড়ে দেড়ঘণ্টায় অনায়াসেই দ্বীপটির উপকূল ধরে একপাক ঘুরে আসা যায়।

উঁচু প্রবাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই দ্বীপটির সবটুকুই ফসফেট পাথরে সমৃদ্ধ। বিদেশিদের দখলে থাকার সময় এখান থেকে ফসফেট খনন করে প্রচুর লাভবান হয়েছে বিদেশী কোম্পানিগুলি। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র খননের ফলে দ্বীপের মাঝখানের সমস্ত জমিই উঁচুনিচু,এবড়ো-খেবড়ো,বসবাসের অযোগ্য। জমির ওপর দিকের সবটাই ফসফেটের চাঙরে ঢাকা। ১৯০০ সালে প্রথম এখানে ফসফেটের খোঁজ পাওয়া যায়। দ্বীপের সীমা বরাবর প্রবাল প্রাচীরের ভেতরের দিকে ১৫০ থেকে ৩০০ মিটার চওড়া একটি বৃত্তাকার অঞ্চল উর্বর আর বাসযোগ্য। উঁচু প্রবাল প্রাচীরে ঘেরা বলে এখানে কোনো সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠতে পারেনি। ছোট ছোট নৌকার সাহায্যে সমুদ্রে যায় অধিবাসীরা।

এই ছোট্ট দেশটির একজন নামকরা মানুষ হলেন 'মার্কাস স্টিফেন্স'। ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলন বিভাগে ৭ বারের সোনাজয়ী। আর এদেশেরই সোনার মেয়ে 'রেন্না সলোমন' প্রথম মহিলা অ্যাথলিট ও ভারোত্তোলক, যিনি কমনওয়েলথ গেমসে ২০০২ সালে দুটি সোনা আর একটি ব্রোঞ্জ জয় করেছিলেন।

কিছু তথ্য

অবস্থানঃ

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুবরেখা থেকে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আর অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি স্থানে।

জলবায়ুঃ

নিরক্ষীয় জলবায়ুর দেশ। গরম বেশি, বাতাসে জলীয় বাষ্পও খুব বেশি। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। সমুদ্রের জলস্তরের বেড়ে ওঠার কারণে আবহাওয়া মাঝে মাঝেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এল নিনোর প্রভাবে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের ভীষণ তারতম্য ঘটে যার ফলে বহুবার এখানে খরা হয়েছে, আবার বন্যাও হয়েছে। পৃথিবীর আবহমন্ডল ক্রমশ গরম হয়ে ওঠার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির তালিকায় পৃথিবীতে নাউরু আছে সপ্তম স্থানে। জলের অভাব মেটাতে প্রত্যেক বাড়িতে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা আছে।

জনসংখ্যা ও জাতীয় প্রতীকঃ

১৯১১ সালের জনগননা অনুযায়ী জনসংখ্যার নিরিখে ছোট্ট এই রাষ্ট্রটি বিশ্বে ছিল ২১৬ নম্বর স্থানে, লোক ছিল মাত্র ৯৩৭৮জন। ১২টি উপজাতির মানুষের বাস এখানকার মোট ১৪টি জেলার ১৬৯টি গ্রামে। আর এই ১২টি জাতির প্রতীক একটি ১২মুখী সাদা তারা আঁকা আছে নাউরুর ঘন নীল রঙের জাতীয় পতাকায়।

খাদ্যাভ্যাস ও জীবিকাঃ

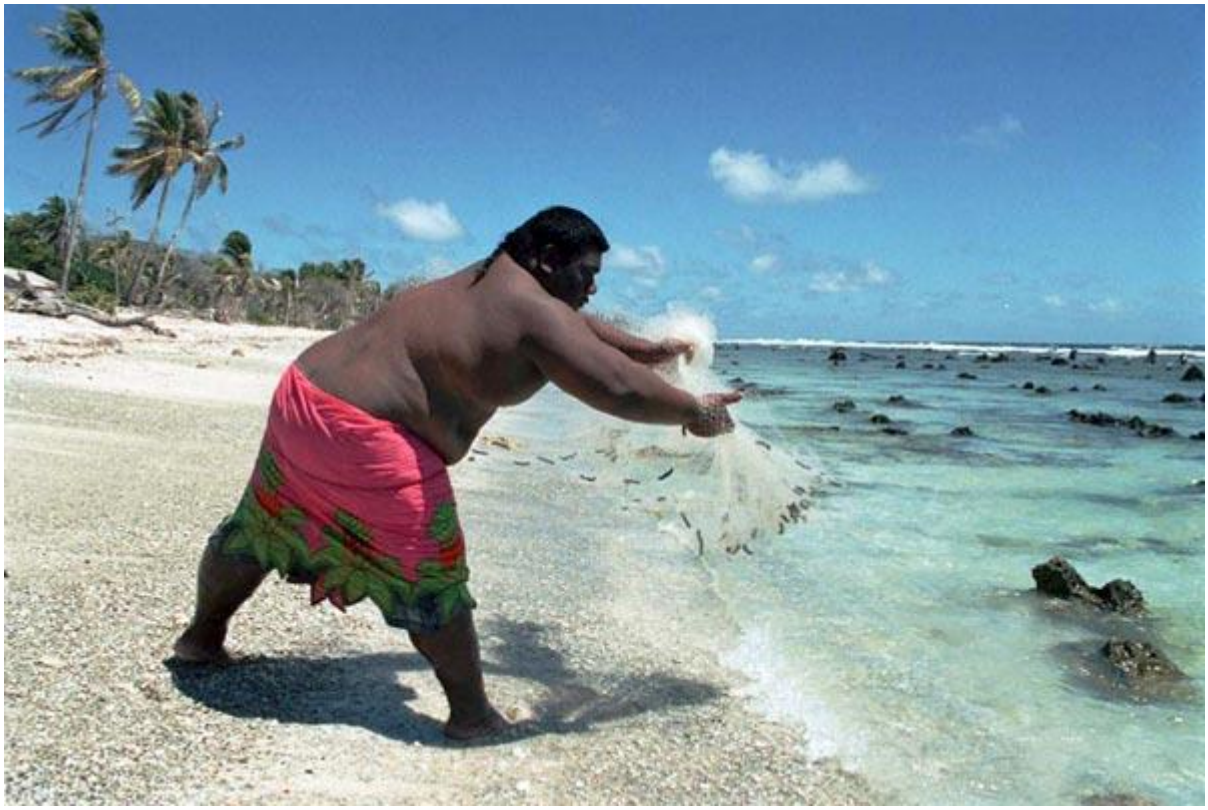

প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ। মিষ্টি জলের উৎস কম থাকায় সমুদ্রের নোনা জলের ছোট 'ইবিজা' মাছ ধরে এনে খাদ্যযোগ্য করার জন্য প্রথমে কৃত্রিম জলাধারে রেখে স্বাদুজলে অভ্যস্ত করে নিয়ে নিকটবর্তী বুয়াডা লেগুনে এদের চাষ করত। অ্যাকুয়াকালচারের মাধ্যমে খাদ্যের প্রয়োজনীয় মাছের যোগান নিশ্চিত রাখত। এছাড়া তাদের খাদ্যের মধ্যে ছিল নারকেল আর কাঁঠালের মত দেখতে "পান্ডানাস"ফল,যা এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয় স্ক্রুপাইন জাতীয় একরকম গাছ থেকে। এছাড়া আছে ব্রেডফ্রুট, আনারস আর স্থানীয় কিছু সবজি। এখন বিদেশের সংস্পর্শে এসে বিদেশী অনেক খাদ্য এদের খাদ্যাভ্যাসে ঢুকে পড়েছে। চাষের জমির অপ্রতুলতার কারণে খাদ্যদ্রব্যের যোগান বজায় রাখতে মাছ ছাড়া প্রায় সব খাদ্যবস্তুই আমদানি করতে হয়।

ষাটের দশক থেকে ফসফেট রপ্তানি করা অন্যতম আয়ের উৎস। মাথাপিছু জাতীয় আয় তখন বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল। দেশে চাকরির বিশেষ ব্যবস্থা নেই। চাকরিরত যারা তাদের ৯৫% ই সরকারী চাকুরে। ফসফেট রপ্তানি ছাড়া পর্যটনও এখন আয়ের এক অন্যতম প্রধান উৎস।

শিক্ষা, ভাষা ও ধর্মঃ

নাউরুর সর্বত্রই বিশিষ্ট নাউরুয়ান ভাষা ব্যবহৃত হয়,এই ভাষা প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু দ্বীপের একান্ত নিজস্ব ভাষা। ৯৬ শতাংশ নাউরুয়ান মানুষ এই আদি ভাষাতেই পরিবারে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। ব্যবসা –বাণিজ্য, স্কুল, ও সরকারি কাজকর্মে ইংরিজি ব্যবহার হয়।

সংবিধানে ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকৃত ,তাই এদেশের বেশির ভাগ মানুষই খ্রিস্টান হলেও,আছে বাহাই ধর্মের মানুষ, আছে চীন, ইউরোপের নানা ধর্মের মানুষ,আছে বৌদ্ধ,আছে মুসলিম ধর্মের মানুষজন মিলেমিশে পাশাপাশি।

শিক্ষিতের হার নাউরুতে শতকরা ৯৬ জন। ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এগার ও বার ক্লাসের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তবে বাধ্যতামূলক নয়। উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরেই যেতে হয় বেশি।

বিনোদন ,খেলাধূলা ও সংস্কৃতিঃ

বিভিন্ন কারণে লোকসংখ্যা কমে যাওয়ায় ,বিশেষত দুটি উপজাতি প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকে নারুয়ানরা নতুন কোন শিশুর জন্ম হলে সেদিনটিতে গোটা দেশ জুড়ে "অঙ্গম ডে" হিসাবে পালন করে। সকলে একত্র হয়ে খাওয়া দাওয়া, আর নানা আনন্দ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎযাপন করে। এরা "এইজিবং" নামে একজন দেবী আর নানা আত্মাকে আরাধনা করে থাকে।

প্রধান দুটি খেলা হল জনপ্রিয় অষ্ট্রেলিয়ান ফুটবল আর ভারোত্তলন। এই দুটিই জাতীয় খেলা। এছাড়া আছে ভলিবল,নেটবল,টেনিস,ও মাছধরা।

এদেশে কোনও দৈনিক পত্রিকা নেই,একটি পাক্ষিক পত্রিকা চালু আছে। রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন একটি টিভি চ্যানেল আছে,নিউজিল্যান্ড আর অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সেটি সম্প্রচার করে। রেডিও নাউরু বিবিসি- র অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

গাছপালা আর জীবজন্তুঃ

দ্বীপে প্রায় ৬০ রকমের দেশীয় গাছপালা আছে। ফসফেট উত্তোলনের ফলে দেশীয় গাছপালার বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। এদেশে কোনও নিজস্ব স্তন্যপায়ী স্থলচর প্রাণী নেই। কিছু কীটপতঙ্গ, স্থলকাঁকড়া, আর দেশি পাখি আছে, যাদের মধ্যে বিখ্যাত নাউরু রেড ওয়ার্বলার। বিড়াল,কুকুর,শূকর,ইঁদুর,মুরগী প্রভৃতি যেসব প্রাণী আছে তারা সবই এসেছে জাহাজে করে ভিনদেশি মানুষের সাথে।

দীর্ঘ পরাধীনতার পর ১৯৬৮ সালে স্বাধীনতা পেয়েই নাউরুর মানুষজন ফসফেট উত্তোলনকারী বিদেশী কোম্পানিগুলির মালিকানা কিনে নেয়। আর অষ্ট্রেলিয়া তাদের দেশ থেকে দীর্ঘদিন খনিজ সম্পদ তুলে ব্যবসা করে লাভবান হয়েছে আর নাউরুর মানুষের আর

প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করেছে আর কুশাসন চালিয়েছে এই অভিযোগে তারা ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক আদালতে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ করে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে। আদালতের রায়ে অষ্ট্রেলিয়া ফসফেট মাইনিংয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির লোকজনকে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছে।

এইটুকু একটি দেশ নিজের দেশের জন্য যা করে দেখাবার সাহস ও সফলতা দেখিয়েছে তা সত্যিই গর্বের। ২০০ বছর পরাধীন থাকার পর স্বাধীন হওয়া আমার দেশ "ভারত উপমহাদেশের" বৃহৎ জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র দেশ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও করতে পারেনি, ক্ষতিপূরণ আদায় তো দূরের কথা। আমাদের ১২৩ কোটি মানুষের দেশ সে কাজটা এবারে করতে পারেনা কি?

তথ্যঋণঃ

১) দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, তাহিতির কথা।
২) ইন্টারনেটের বিভিন্ন লেখা।

নিশিডাকিনি- নাদেঝাদা পোপোভার কথা

উমা ভট্টাচার্য

নিশিডাকিনি নামটা শুনে প্রথমেই মনে হবে ডাইনিদের কথা, সে সব ডাইনি যারা রাতের বেলায় বেরোয় মানুষকে জ্বালাতন করতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিশির ডাক ডেকে ঘর থেকে বের করে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এবারের গল্পের নিশিডাকিনিরা আসলে ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে গঠিত বিধ্বংসী "প্রমীলা বোমারু বিমান বাহিনী"র দুর্ধর্ষ মহিলা পাইলটরা। এঁদের মধ্যে সেরা ছিলেন যিনি তাঁর নাম নাদেঝাদা পোপোভা । যুদ্ধকালীন কর্মজীবনে অনাহত থেকে কাজ করে গেছেন আর ৮৫২বার সফল বম্বিং অপারেশান করেছেন। মাত্র কিছুদিন আগে, ২০১৩ সালের ৮ই জুলাই, ৯১বছর বয়সে এই বীরাঙ্গনার মৃত্যু হয়েছে তাঁর প্রিয় মাতৃভুমি রাশিয়ার মস্কোতে। এবারে বলব সেই দুঃসাহসী মহিলা বোমারু বৈমানিক পোপোভার কথা।

নাদেঝাদা ভাসিলিয়েভনা পোপোভার জন্ম ১৯২১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের শাবানোভকা নামে এক জায়গায়, আর বড় হয়ে ওঠা ইউক্রেনে। ছোট্টবেলা থেকেই সাহসী, উচ্ছল, প্রাণবন্ত নাদেঝাদার গতানুগতিক জীবনযাত্রা পছন্দ ছিলনা। সবসময়ই নতুন, ব্যতিক্রমী কিছু করার দিকেই ঝোঁক ছিল তাঁর। এসব কথা তিনি নিজেই গল্প করেছিলেন লেখক গোটপ্যাস্টার স্ট্রেবের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে। স্ট্রেবের লেখা ২০০৭ সালে প্রকাশিত বই "ফ্লাইং ফর হার কুম্‌ব্‌ –দ্য আমেরিকান অ্যান্ড সোভিয়েত উওম্যান মিলিটারি পাইলটস অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু" থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেছে।

একজন রেলওয়ে কর্মচারির মেয়ে নাদেঝাদার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা জাগে পাইলট হবার। একটি ছোট্ট ঘটনা থেকেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে বড় হয়ে পাইলটই হবেন তিনি, এক রোমাঞ্চকর জীবন হবে তাঁর। একবার তাঁদের বাড়ির কাছেই এক মাঠে একটি উড়োজাহাজ কোনও কারণে বাধ্য হয়ে নেমেছিল। প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন সেই উড়োজাহাজ দেখতে। সামনে বিস্ময়কর যানটি দেখে সেটির গায়ে হাত বুলিয়েও দেখেলেন আর স্বপ্ন দেখা শুরু হল আকাশে ওড়ার - একজন বিখ্যাত পাইলট হবার।

নিজেই বলেছিলেন, বুনোদের মত উদ্দাম প্রকৃতি ছিল তাঁর। ১৯৩৬ সালে ১৫ বছর বয়সেই যোগ দিলেন একটি ফ্লাইং ক্লাবে। সারা সোভিয়েত দেশে তখন ১৫০টির মত ফ্লাইং ক্লাব ছিল আর সেগুলির মোট শিক্ষার্থীদের এক- চতুর্থাংশের বেশি ছিলেন মহিলা। পোপোভার শিক্ষার প্রথম সফল পরীক্ষা হল প্যারাস্যুট জাম্পিং দিয়ে। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর । তার পরেই করলেন একক উড়াণ বা 'সোলো ফ্লাইট'। এরপরে পাইলট স্কুল থেকে স্নাতক হয়ে একজন ফ্লাইট ইন্সস্ট্রাক্টরের পদে কাজে যোগ দিলেন।

শুরু হল কর্মজীবন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনটি হল যেদিন তিনি রাশিয়ার বিখ্যাত তিনটি "মহিলা বম্বার রেজিমেন্টের" সবচেয়ে বিখ্যাত আর দুর্ধর্ষ শাখা

"৫৮৮তম নাইট বম্বার রেজিমেন্টের" পাইলট পদে নির্বাচিত হলেন। এই রেজিমেন্টের পাইলট হিসাবে কাজ করার প্রথম অভিযানের এক মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা তাঁর চরিত্রে এনে দিল

এক ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা। সেই অভিযানেই অন্য একটি সোভিয়েত বিমান ধ্বংস হয়ে যায়, মৃত্যু হয় তাঁর দুই বন্ধুর। তিনি নিরাপদে বম্বিং করে ফিরে এসেছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে যেতে হয়েছিল আরেকটি মিশনে, শোক করার বা মন খারাপ করার কোন অবসর নেই। তাঁর মতে এই ভালো হয়েছিল, কারণ একমাত্র কাজের চাপই তাঁকে সবকিছু ভুলিয়ে দিতে আর নিজের কাজে নিষ্ঠাবান হতে শিখিয়েছিল। ২০০৩ সালে রাশিয়ান লাইফ ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছিলেন পোপোভা।

১৯৪১ সালে জার্মান বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য সমৃদ্ধ তেলের খনি অঞ্চলের দখল নেওয়া। এরপর ঘটে স্ট্যালিনগ্রাদের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, যে যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ঘটা সকল যুদ্ধের মধ্যে ভয়ানকতম। জার্মান বাহিনী ইউক্রানিয়ান সোভিয়েত স্যোশালিস্ট রিপাবলিকের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণের মুখে রাশিয়ান দিনের বেলার বিমান আক্রমণ প্রতিরোধবাহিনী প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ চলেছিল ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত।

প্রথম আক্রমণের সময় থেকেই স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধফ্রন্টে এবং দূরদূরান্তরে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরা সমানভাবে গুরুত্বপুর্ণ কাজ করে গেছেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জীবনযাত্রায় মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বার্লিন পর্যন্ত রাস্তা হেঁটেছেন। মেয়েরা বিশেষত যে ৭৫০০০ মহিলা ও কমবয়সি মেয়েরা মেডিকেল আর মিলিটারি ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁরা সবাই মাতৃভূমির রক্ষায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অনেক মেয়ে বিমানধ্বংসী কামান দিয়ে শত্রুবিমান ধ্বংস করেছিলেন, কেউ তাঁদের নির্দেশ দেয়নি। নার্সেরা শুধু আহতদের সেবাই করেননি, জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাগুলির

তোয়াক্কা না করে সেখান থেকে আহত সৈনিকদের উদ্ধার করে এনে পৌঁছে দিয়েছেন হাসপাতালে। অনেক মেয়েরা মেশিনগান চালিয়েছেন,মর্টার অপারেটারের কাজ,স্কাউটের কাজ করেছেন স্বেচ্ছায়, নিজেদের জীবনের কথা একবারও ভাবেননি। অথচ তখনও রাশিয়াতে মেয়েদের সৈনিক বা বৈমানিক হিসাবে সরকারীভাবে নিয়োগ করার আইন ছিলনা। কেউ স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করতে পারত, সরকারী কোনো দায় ছিলনা তাদের জন্য।

১৯৪১ সালের জার্মান আক্রমণের সময় মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে আত্মপ্রত্যয়, দক্ষতা,আর কৃতিত্বের পরিচয় দিল রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম। তারপরই সরকার বুঝলেন এই মানবীসম্পদকে দেশের কাজে লাগানো খুবই প্রয়োজন। ১৯৪১ এর আকস্মিক আক্রমণে রাশিয়ার লালফৌজের যে বিপুল রক্তক্ষয় হল, আর সেই সময় যে ৮০০০ মহিলা স্টালিনগ্রাদের মৃত্যুপুরীতে সাহসের সঙ্গে যে ভুমিকা পালন করলেন তাতে বিভিন্ন মহল থেকেও মেয়েদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার অধিকারের পক্ষে জোরালো দাবি উঠতে লাগলো। ১৯৪১ সালের ৮ই অক্টোবর স্ট্যালিন এক আদেশে একটি "সম্পূর্ণ মহিলা বোমারু বিমান বাহিনী" গঠন করার নির্দেশ জারি করলেন।

গঠিত হল তিনটি মহিলা বিমানবাহিনী। যে বাহিনীর টেকনেশিয়ান থেকে পাইলট পর্যন্ত সকলেই মহিলা, যদিও এই বাহিনী তিনটির বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন 'টিনএজার', সাহসী আর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। বাহিনীগুলি হল ৫৮৬ ভ্যাক- ১ফাইটার, ৫৮৭ ডাইভবম্বার,আর ৫৮৮ নাইটবম্বার বাহিনী। এই শেষের বাহিনীটির ভয়ঙ্করতার আর বেপোরোয়া রাত অভিযানের সফলতাই জার্মান বাহিনীর ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিল, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জার্মান সৈন্যঘাটির সৈন্যদের রাতের ঘুমটুকুও কেড়ে নিয়েছিলো এই নাইট বম্বিং বাহিনী। রাতের অন্ধকারে

এঁদের প্রায় নিঃশব্দে উড়ে আসা আর লক্ষ্যবস্তুতে নিশ্চিত আঘাত হেনে ফিরে যাওয়ার জন্য, আর এই বাহিনীর সকলেই মহিলা বলে, 'নাৎসিরা' এই নাইট বম্বিং রেজিমেন্টের নাম দিয়েছিল "নাইট উইচেস" বাহিনী। সামরিক ইতিহাসে এই নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে এই

বাহিনীর বীরাঙ্গনারা। নাৎসিদের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল যে এই দুর্ধর্ষ পাইলটদের মানে তাদের ভাষায় 'ডাইনি'দের এক বিশেষ ধরনের ট্যাবলেট ও ইনজেকশান দেওয়া হয়, যার ফলে রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারেও টার্গেটকে তারা স্পষ্ট দেখতে পায়।

নাদেঝাদার মুখে শোনা গেছে একথা নিতান্তই গুজব। যুদ্ধের পরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন এসব কথাই। "আমাদের দেশের নিরীহ মানুষদের উপর যে অত্যাচার করেছে নাৎসিরা,যেভাবে মহিলা বৈমানিকদের গুলি করে নামিয়ে পৈচাশিক উল্লাসে হেসে উঠেছে ,সেই মুখগুলির কথা মনে রেখে আমরা জার্মান গেস্টাপো বাহিনীর উপর নির্দ্বিধায় অব্যর্থ আঘাত হানতাম। কোনো অন্য চিন্তা থাকত না তখন। শুধু থাকতো প্রতিশোধের সংকল্প। এই গেস্টাপোরা রাশিয়ার অনেক পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের উপরেও অত্যাচার করেছে, ভাই লিওনিডকে হারিয়েছি আমি। আমাদের বাড়ি দখল করে নিয়ে গেস্টাপো বাহিনী পুলিশ ক্যাম্প করেছে। আমি দেখেছি উপরে আকাশে উড়ছে জার্মান বোমারু বিমান,নিচে রাস্তায় টহল দিচ্ছে জার্মান সেনা। ভয়ে যারা প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল তাদের ধরে এনে গাড়িতে বোঝাই করছে আর মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই দেব, বোমারু বিমান থেকে বম্বিং করেই ওদের ওপর প্রতিশোধ নেব। আমি শুরু করলাম রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার চেষ্টা, সফল হলাম তিনবারের চেষ্টার পর। আমি হলাম মহিলা নাইট বম্বার বাহিনীর পাইলট। তাই আমরা লক্ষ্যে স্থির থাকতাম,পাখির চোখের মত আমাদের সামনে দেখতে পেতাম শুধু আমাদের দেশের আর দেশবাসীর শত্রুদের। আর তাদের দেখানো দরকার ছিল যে নৃশংসতায়, সাহসে আর শক্তিতে আমরা মেয়েরাই তাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী"।

এই ৫৮৮ মহিলা নাইট বম্বিং রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছিল বহু সফল উড়ানের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কলোনেল মেরিনা রাসকোভার তৎপরতার আর পরিচালনের ভার ছিল মেজর ইয়েভদোকিয়া বারস্থানস্কায়া উপর। আর বাহিনীর কাজই ছিল রাতের অন্ধকারে 'হ্যারাসমেন্ট বম্বিং' করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বম্বিংয়ের এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে সেনাছাউনির উপর, শত্রু সেনাদের রসদের ভান্ডারের উপর, আর লোকালয় থেকে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত সেনাঘাটির উপর পরপর বম্বিং করাই ছিল হ্যারাসমেন্ট বম্বিংএর উদ্দেশ্য। একধরণের 'মনস্তাত্ত্বিক রণকৌশল'এর সফল অস্ত্র হয়ে উঠেছিল এই টেকনিক। শত্রুপক্ষের বাহিনীর উপর আকস্মিক আর অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় আকছার এলোপাথারি লক্ষেও বম্বিং করত এরা। ছোট ছোট কম শক্তির বোমা দীর্ঘ সময় ধরে বারবার এসে আঘাত করতো শত্রুদের ওপর। শত্রুপক্ষ বুঝে উঠে বোমারু বিমানকে চিহ্নিত করার আগেই সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যেত, আবার পরমুহূর্তেই অন্যদিক থেকে আঘাত আসতো।

মানসিক শক্তি ভেঙে দিত সেনাদের, তারা রাতের বেলাতেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত না, বিশ্রাম নিতে পারতনা, সর্বোপরি তারা রসদের যোগান ঠিক রাখতে পারতনা,প্রচন্ড মানসিক চাপ তৈরি করা হত তাদের উপর। ফলে তাদের পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করার শক্তি বাড়ানো সম্ভব হতনা। আর এই কাজটি অদ্ভূত সাহস আর দক্ষতার সঙ্গে করেছিল '৫৮৮ নাইট বম্বার রেজিমেন্টের' মহিলা পাইলটরা।

এঁরা কোন আধুনিক প্লেন বা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র পাননি অভিযানের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য কোন বন্দুক, প্যারাস্যুট, কিছুই ছিলনা তাঁদের। ছিলনা কোন বেতার যন্ত্র, রাতের আকাশে দিকনির্ণয় করার কোন যন্ত্রও তাঁদের কাছে ছিলনা। একটি স্টপওয়াচ আর একটি ম্যাপ দিয়েই তাঁদের কাজ চালাতে হত। তাঁদের বাহনটিও ছিল পুরনো মডেলের বাইপ্লেন, যেগুলি বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে চাষের ক্ষেতে কীটনাশক ছড়াবার মত কিছু সাধারণ কাজ ছাড়া আর কোন কাজেই লাগত না। এগুলির নাম ছিল "পলিকারপভ পিও- ২ বাইপ্লেন"। সংক্ষেপে বলা হত পিও- ২।

প্লেনগুলি ছিল ক্যানভাস কাপড়ে তৈরি, উপরে ও নীচে সমান্তরাল দুটি ডানা ,খোলা ককপিট, ডানা দুটির নিচে বাধা থাকত বোমা, মোটা তারের দড়ি দিয়ে। এগুলির গতি ছিল ঘণ্টায় মাত্র ৯৪ মাইলের মত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ফাইটার প্লেনের থেকেও কম গতিবেগ। ৪৪ পাউণ্ডের দুটি ছোট 'এইচ ই' বোমা বহন করতে পারত ১১০ হর্স পাওয়ারের ছোট ইঞ্জিন চালিত এই ক্যানভাসে তৈরি প্লেনগুলি। তবে সুবিধাও ছিল। এগুলির খরচ কম ছিল, এগুলি খুব নিচু দিয়ে উড়তো। তাছাড়া এত ছোট ইঞ্জিনে চলা প্লেনগুলিতে এত কম তাপ উৎপন্ন হত, যে জার্মানদের রাডারে সেগুলি চিহ্নিত করা যেতনা।

এই সামান্য উপকরণ নিয়ে অন্যদের মত নাজেঝদাও প্রচুর সফল অভিযান করেছেন। পোপোভা একরাত্রে ১৮বার যাওয়া আসা করেছিলেন ঘাঁটি থেকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলতে, কারণ একটি প্লেনে একবারে মাত্র দুটি বোমা নেওয়া যেত। বারবার যাতায়াতের জন্য বিপদের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকতো। রাশিয়ার প্রবল শীতে,উপরে আকাশে

শৈত্যের সঙ্গে বেশি বিপদ দেখা দিত যখন প্রবল জোরে বাতাস বইত, হালকা প্লেনগুলি বাতাসে প্রচন্ড দুলত। খোলা ককপিটে মুখ, হাত,পা ঠান্ডা বাতাসে প্রায় জমে যেত। কিন্তু ভয় পেলে বা চালনক্ষমতা হারালে চলতো না।

নিচে শত্রুপক্ষের সার্চ লাইটের আলোয় ধরা পড়লে গুলি করে নামাবে প্লেন, নিজেদের প্রাণের সঙ্গে মিশনটিও ব্যর্থ হবে। তাই এই পাইলটরা এক নুতন যুদ্ধকৌশল চালু করেছিল। তিনটি প্লেন একসঙ্গে উড়ান শুরু করত, দুটি সমান্তরাল ভাবে আগে চলতো আওয়াজ তুলে, উদ্দেশ্য গ্রাউণ্ড ডিফেন্সের সার্চলাইটগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ। তাদের আওয়াজে তাদের উপর সার্চলাইটের আলো পড়তেই দুটি প্লেন চলতে শুরু করতো দুই বিপরীত দিকে, অনেকখানি বৃত্ত তৈরি করে দুটি প্লেন দুদিকে গেলে সার্চলাইটও তাদের অনুসরণ করত। এই ফাঁকে পিছনের তৃতীয় প্লেনটি ইঞ্জিন বন্ধ করে সার্চলাইটের আলোয় দেখা পথে নিঃশব্দে গ্লাইড করে এসে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে আবার ইঞ্জিন চালু করে শব্দ তুলে দ্রুত বেরিয়ে যেত সার্চলাইটের আলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে। সেই ফাঁকে দলের দুনম্বর প্লেনটা এসে একই কায়দায় বোমা ফেলত।

জার্মান বাহিনী রীতিমত নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিল এই বাহিনীর আঘাতে। কিছু বোঝার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেত তাদের ঘাঁটি, রসদ ভান্ডার। ১৯৪১ সালে এই বাহিনী তৈরি হবার পর থেকে চার বছর জানপ্রাণ লড়িয়ে এই বাহিনী দেশের জন্য ৩০,০০০ হাজারের মত অভিযানে ২৩,০০০ বম্বিং করেছিল। 'নাইট উইচ'দের কোনও একটিকেও গুলি করে নামানোর জন্য জার্মান বাহিনী "আয়রণ ক্রস" সাম্মানিক পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম কৃতিত্বের অধিকারী নাদেঝাদা পোপোভা একাই ৮৫২ টির মত বম্বিং মিশন সফল করেছিলেন।

একবার এক জায়গায় পোপোভার লক্ষ্যবস্তু ছিল একটি আগ্নেয়াস্ত্রের ভান্ডার। তিনি বোমা ফেলে পালিয়ে যেতেই পিছন দেখলেন তাঁর উপরে সার্চ লাইটের আলো, তিনি দ্রুত সেই আলোর ফোকাস থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেই দেখলেন অন্য একটি প্লেনের উপর আলো পড়েছে, আর মুহূর্তেই শত্রুপক্ষের গুলিতে সেই প্লেনটিতে আগুন ধরে গেছে,পর মুহূর্তেই আরও একটি প্লেনে

আগুন ধরে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে দুটি প্লেনই ছাই হয়ে গেল। আগের রাতেই এই দু'জন তাঁর সঙ্গে একই বাঙ্কে রাত কাটিয়েছিলেন।

এই বীভৎস ঘটনা তাঁকে মানসিক দিয়ে আরও শক্তিশালি, আরও স্থিরসঙ্কল্প, আর সতর্ক হয়ে শত্রুপক্ষের দিকে অভিযানে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি ক্রমে এই ৫৮৮ বম্বার রেজিমেন্টের ডেপুটি কমান্ডার হয়েছিলেন। ইউক্রেন, নর্থ ককেশাস,মিনস্ক,সেভাস্তোপোল, ওয়ারশ ও বার্লিনের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল তাঁর বিভিন্ন মিশনের কর্মক্ষেত্র। প্রায় প্রতিটিতেই সফল।যদিও কয়েকবার তিনি বিমানধ্বংসী কামানের নিশানা হয়েছিলেন, কিন্তু অদ্ভুত দক্ষতায় নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরেছিলেন।

একবার ১৯৪২ সালে জুলাই মাসে উত্তর ককেশাসে এক অভিযানের সময় তাঁকে প্লেনশুদ্ধ গুলি করে নামানো হলেও তিনি ধরা পরলেন না। আত্মগোপন করে চলতে চলতে ভিড়ে পড়লেন একদল পশ্চাদপসরণকারী পদাতিক সেনার সঙ্গে। তাঁদের সামরিক পোশাকগুলিও ছিল পুরুষ সেনাদের ব্যবহৃত পোশাক। পুরনো পোশাকগুলিকে ছোট করে মেয়ে পাইলটদের পরবার উপযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

এই পথেই তিনি দেখা পেলেন এক আহত সৈনিকের। চোখ দুটি ছাড়া সারা দেহ ব্যান্ডেজ করা ঐ সৈনিকটি লাইনে তাঁর পিছনেই চলছিলেন। নাম ছিল তাঁর সাইমন খারলামভ। ওই অবস্থায়ও সৈনিকটি বারবার নানা মজার মজার কথা বলে সকলকে আনন্দ দিচ্ছিলেন। এরপরেও অনেকবার তাঁর সঙ্গে পোপোভার দেখা হয়েছে বিভিন্ন রণাঙ্গনে। দুজনে বন্ধু হয়ে যান। নিজ নিজ কৃতিত্বে তাঁরা যুদ্ধের দিনের রাশিয়ায় বীরের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

জার্মানির পতন ঘটিয়ে সকলের সঙ্গে তাঁরা দুজনে যেদিন বার্লিনে পৌঁছুলেন তাঁরা নিজেদের বন্ধুত্ব আর যুদ্ধের দিনগুলির কথা অমর করে রাখতে রাইখস্টাগের দেওয়ালে দুজনের নাম লিখেছিলেন একসঙ্গে। যুদ্ধের শেষে তাঁরা বিয়ে করে একসঙ্গে সুখে কাটান ১৯৯০ সালে

সাইমনের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত। তাঁদের একমাত্র ছেলে আলেকজাণ্ডার এখন বেলারুশিয়ান বিমানবাহিনীতে জেনারেল পদে থেকে দেশকে সেবা করে যাচ্ছেন।

যুদ্ধের শেষে পোপোভা আবার কাজে ফিরে যোগ দেন একজন ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হিসাবে । তিনি সোভিয়েত দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এছাড়া 'গোল্ড স্টার', 'দ্য অর্ডার অফ লেনিন', 'দ্য অর্ডার অফ রেড স্টার' প্রভৃতি জাতীয় সম্মানে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন 'সোভিয়েত মেডাল অফ অনার', 'দ্য অর্ডার অফ ফ্রেন্ডশিপ',তিনবার পেয়েছিলেন 'অর্ডার অফ রেড বম্বার' পুরস্কার। আমৃত্যু তিনি স্মৃতিচারণে বলতেন, "আমি এখনও চোখ বুজলেই দেখি সেই তরুণী নাদিয়াকে যে তার ছোট্ট বম্বার প্লেনটিতে চড়ে উড়ে চলেছে নিজের মিশনে"। নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'নাদিয়া কীভাবে তুমি এসব করেছিলে'!

এসো আজ সেই বীরাঙ্গনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমরা।

তথ্যঋণ--

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহিলা সৈনিকদের নিয়ে রাশিয়ান পত্র- পত্রিকার প্রবন্ধ।
টাইমস অফ ইন্ডিয়ার আর্কাইভ ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৈমানিকদের ইতিহাস।
আন্তর্জাল।

ফেলে আসা কলকাতা

সুজয় রায়

পয়লা বৈশাখের কথা। জলসা হয়েছিল এক জমিদারবাড়িতে। গৃহস্বামী প্রথমেই বলে দিলেন আসরে ঘড়ি বর্জন করতে হবে। ওটাতে নাকি রসের ব্যাঘাত হয়। জলসাঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো বিরাট গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। ধ্রুপদী খেয়ালি- রাও এলেন ঘড়ি ছাড়া। শ্রোতাদের পকেটঘড়ি জমা রাখা হলো বাবুর খিদমদগারদের জিম্মায়। গান শুরু হলো , সঙ্গেই চলেছিলো প্রচুর খাওয়া আর আপ্যায়ণ। ক্রমে রাত কেটে গেল, দিন বাড়লো। অবশেষে বহুক্ষণ গান ও নাচ হওয়ার পড়ে এক ওস্তাদ শিল্পীর মনে হলো সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত, এবং ভোর হলো বুঝি। জলসাঘরের বাইরে গিয়ে সমই জানা গেলো ইতিমধ্যে সময় হয়েছে দুপুর বারোটা! সেই যুগটাই ছিলো ওইরকম। ঢিমেতালে চলাফেরার যুগ।

পয়লা বৈশাখ উৎসব শুরু করেছিলেন কবি ইশ্বরগুপ্ত। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে ইশ্বরগুপ্তর নববর্ষ উৎসবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসতেন। সেকালের নামি জমিদারদের আমন্ত্রণ করতেন সেখানে। সেদিন সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বের করা হতো। কলকাতায় প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপূজা হয়েছিল বাগবাজারে। তারপরে এলো সিমলে ব্যায়াম সমিতি, শোভাবাজার রাজবাড়ি, রাজা নবকৃষ্ণর বাড়ি, রাধাকান্ত দেবের বাড়ি। এই সমস্ত বনেদি বাড়িতে প্রতিমার বাহন সিংহের মুখ নাকি হতো ঘোড়ার মতো দেখতে। হিমালয়ের সিংহের মুখ নাকি ঘোড়ার মতো। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বিসর্জনের দিন গোরা সৈন্যরা বিউগল, ব্যাগপাইপ সহ ব্যান্ডপার্টি নিয়ে আসতো। সঙ্গে যেতো রংমশাল, কোঁচা দোলানো বাবু, একপাল মোসাহেব, এক সারি ঢাকি, পাইক বরকন্দাজ। বিডন স্ট্রিট, চিৎপুর রোডের ওপর দিয়ে। বিজয়াদশমীতে কালোয়াতি ঢং- এ গান গাওয়া হত, সত্যি নাকি যাবি উমা পাষাণপুরী শ্মশান করে", " এসো মা এসো মা উমা বোলো নাকো যাই", " রজনী জননী পোহাইও না ধরি পায়ে"। বনেদি বাড়িতে ঠাকুর বিসর্জনের সময় নীলকন্ঠ পাখি ওড়ানো হত। নীলকন্ঠ পাখি নীলকন্ঠর কাছে মায়ের পুণরাগমনের বার্তা আগেভাগে পৌঁছে দিয়ে আসে এটাই ছিলো বিশ্বাস। বিজয়ার গান ছিল এইরকম:

"ঘৃত, মধু, শিলা ধান্য
দুর্বা দিয়ে আজ
দর্পন, কাঞ্চন রৌপ্য
দিয়ে তার মাঝ
মুখে মিষ্টি দিয়া রানি
সিন্দুর দেয় মাথায়
আর প্রদীপে আরতি করি
অঝোর ঝোরে কান্দে
এসো মা এসো মা উমা
বোলো নাকো যাই যাই
মায়ের কাছে হৈমবতী
এ কথা যে বলতে নাই।"

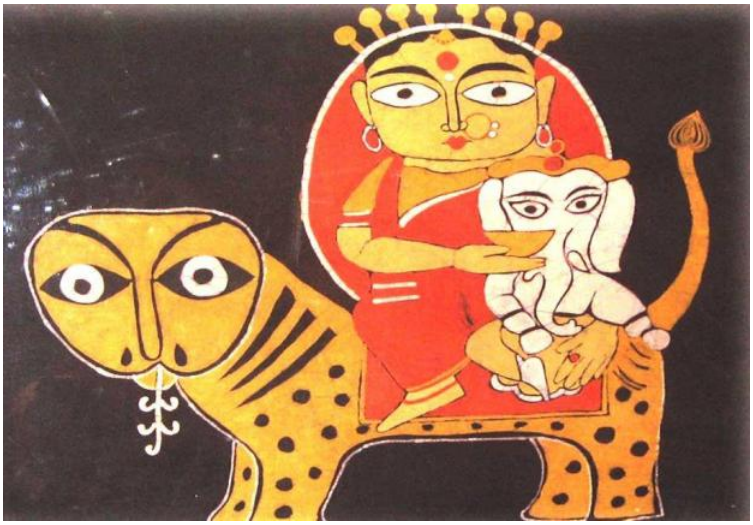

সুবিখ্যাত গায়িকা ইন্দুবালা দেবীর এক কাহিনীর স্মৃতিচারণ করেছেন কন্ঠশিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইন্দুবালা ছিলেন গহরজান বাঈ এর শিষ্যা। গৌরীশংকর মিশ্রজি সেইসময় গহরজানের গানে সারেঙ্গি বাজাতেন। একবার গণেশ পুজোতে মিশ্রজি তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রাতভোর সারেঙ্গি বাজানোর অনুষ্ঠান করেছিলেন। অনেক বিশিষ্ট শিল্পী এসেছিলেন বাজনা শুনতে। এসেছিলেন গহরজান। এক কিশোরী এসেছিল তার মায়ের সঙ্গে সেই আসরে। আসরের পরে বাড়ি ফিরে কিশোরী তার মাকে বলেছিল, গহরজানের রূপ ও গুণের সামনে সে নিজে লজ্জিত আয়নায় নিজেকে দেখে।

পরবর্তীকালে এই মেয়ে পরিণত শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। ইনিই স্বনামধন্য ইন্দুবালা দেবী। গহরজানের শিষ্যা। তাঁর গান শুনে শ্রোতারা তাঁর চেহারা ভুলে যেত। তিনি দেশেবিদেশে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। অনেক বছর পরে, গহরজানের স্মৃতি তখন ঝাপসা হয়ে আসছে। একদিন

পেনেটির এক বাগানবাড়িতে গঙ্গার ধারে আমন্ত্রিত হয়ে গাইতে এসেছিলেন ইন্দুবালা দেবী। অনেক গান গাইবার পরে গাইলেন তাঁর গুরু গহরজানের কাছে শেখা ইমন রাগ-এ পাঞ্জাবী টপ্পা। ঠিক যেমন গহরজান এটি গাইতেন। বহু শিল্পীর মাঝখানে এই গান আসর কেড়ে নিয়েছিলো। গানের শেষে ইন্দুবালা ফিরে গেলেন কলকাতায়। কিন্তু মাইফেল অনেক রাত পর্যন্ত চলেছিলো।

রাতের আহারের ঢালাও আয়োজন ছিল। কিন্তু খাওয়ার পাতে মাংস কম পড়ে গেলো। তখন গৃহস্বামী সেই রাতেই আরো মাংস জোগাড় করে রান্না করাবার বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু শেষ রাতের সেই মাংস কেউ দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়তে পারলো না। পরের দিন সকালবেলা,

অতিথিরা সকলে বিদায় নিলেন। এবার বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার কারণটা বলে ফেললো। অতো রাতে পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়নি, তাই নাকি বাঁদর মেরে খাওয়ানো হয়েছিল।

ইন্দুবালা দেবী শেষ জীবনে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বাসনা ছিল একটি টপ্পা গানের পংক্তি শ্মশানে পাথরের ফলকে লেখা থাকবে। ইন্দুবালা মারা যাওয়ার পরে নিমতলা ঘাটের শ্মশানে পাথরের ফলকে লেখা হল,

"কে বলে কদর্য শ্মশান
পরম পবিত্র মহাযোগের স্থান
পাপী, পুণ্যবান, মূর্খ, বিদ্বান.
সমানভাবে হেথা সকলে শয়ান..."

এই তথ্য রামকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন। রামকুমার এই গান রেকর্ড করেছিলেন ইন্দুবালা- র ঢং- এ।

ক্রমশ

জয়ঢাকের কিচেন

ঋকবাবুর রান্নাখেলা

তনুশ্রী মুস্তাফি

ঋক যখন ছোট্ট এইটুকুনি ভুতুম ছিল তখন ও দুগ্গা ঠাকুরের থেকে বেশি চিনতো সান্তা ক্লস খুড়োকে। ঘোর গরমকালেও মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে একটাই গান গাইতে পারতো 'জিঙ্গল জিঙ্গল বেল-- ' রাস্তায় থাকুক বা বাড়িতে, কচি গলায় সুর সপ্তমে তুলে ঋক গাইতো সান্তা খুড়োর শহরে আসার গান। সান্তা খুড়ো যে একা আসে না, ঋকের জন্য নিয়ে আসে কত চকোলেট, লজেন্স আর খেলনা! উফফ কত কত্তো গিফট রে বাবা! ঋক একবার এটা খোলে আর একবার ওটা। এখন ঋক আর একটু বড় হয়েছে বটে, দোল- দুর্গাপূজা- দেওয়ালি সব চিনেছে কিন্তু এখনো সারা বছর ঋক অপেক্ষা করে থাকে ক্রিসমাসের জন্য। দুর্গাপূজা শেষ হয়ে দেওয়ালি আসতে যা দেরি, তার মধ্যেই মা শুরু করে দেন ক্রিসমাসের প্রস্তুতি। আগের বছর শীতকালে মা কমলালেবু আর পাতিলেবুর খোসা ছাড়িয়ে লম্বা সরু টুকরো করে চিনিতে সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। দুর্গাপুজোর পরেই ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে আসে সেই সব মিষ্টি মিষ্টি কমলালেবু আর পাতিলেবুর খোসা। মা ছুরি দিয়ে কুচোতে থাকেন খোসাগুলি আর ঋক ঝুঁকে পড়ে নাক টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। এই গন্ধটা পেলেই ওর মনে হয় শীত এসে গেছে, দূরে কোথাও সান্তা খুড়োর স্লেজের ঘন্টা বাজছে টিং লিং লিং।

ক্রিসমাসের কম করে দু'মাস আগে মা কেকের জন্য ফল ভেজান। এই দিনটা খুব মজার ঋকের কাছে। মা একদিকে ফল, বাদাম, লেবুর খোসা কুচাতে থাকেন আর পাশেই একটা বড় পাত্রে দুহাত ডুবিয়ে ঋক সেগুলো ভালো করে ওলটপালট করে মাখতে থাকে। মাঝে মা তাতে ঢেলে দেন মশলার গুঁড়ো, ফলের রস আর অল্প ব্র্যান্ডি। দুপুরবেলা রোদে বসে মাখতে মাখতে যেন নেশা ধরে যায়। মা এই সময় কত গল্প শোনায়। মাঝে ঋকও টিপ্পনি কাটে। যেমন ধর ঋকের মা হয়তো গাজরের গল্প বলতে বলতে বাগস বানির গল্প বলতে শুরু করলেন আর ঋকেরও মনে পড়ে গেলো খরগোশের দাঁতগুলো কিরকম বেরিয়ে থাকে আর কানগুলো কি রকম লম্বা, লম্বা।।। নাড়ানো যায়। ঋকের কানগুলো ভারি পচা, একটুও নাড়ানো যায় না। বলতে বলতে চোখ ফেটে জল চলে আসে প্রায়। এবছর অবশ্য অবস্থা একটু আলাদা। 'লাইফ অফ পাই' দেখে থেকে ঋক এখন ভয়ানক হাঙর আর তিমি ভক্ত। ঋকের মা যে গল্পই শুরু করেন না কেন, ঋক ঠিক টেনেটুনে নিয়ে যায় হাঙরের গর্ভে। আঁকার খাতা ভর্তি খালি সমুদ্রের আর হাঙর- তিমির ছবি। সেইগুলোকে কেটে কেটে দড়ি বেঁধে রেখে দিয়েছেন ঋকের মা। এ বছর ক্রিসমাসে গাছ সাজানোর সময় তারা, মিছরির লাঠি, রিবন, বল এসবের সাথে হাঙর- তিমিও ঝুলবে না হয় ফার গাছের ডালে ডালে।

ঋকের কেক তো প্রায় তৈরি। আর একটু বাদেই আমরা বসে পড়ব ক্রিসমাসের খাবারের টেবিলে। তোমরাও শুরু করবে নাকি? তাহলে চলো আগে উপকরণগুলো যোগাড় করে নিয়ে আসি। সব হাতের কাছে গুছিয়ে নিয়ে বসতে হবে তো।

উপকরণ:

<u>আদা, কমলালেবু ও পাতিলেবুর খোসা জারানোর জন্য:</u>

কমলালেবু – ৩

পাতিলেবু – ৬

আদা – ১০০ গ্রাম

চিনি – আধ কাপ

জল – আধ কাপ

<u>ক্যারামেল তৈরির জন্য:</u>

চিনি – আধ কাপ

জল – এক চামচ

<u>জারানোর জন্য ফল ও বাদাম:</u>

প্লাম/ শুকনো এপ্রিকট – কুচোনো, আধ কাপ

টুটি ফ্রুটি – আধ কাপ

কাজু বাদাম – কুচোনো, আধ কাপ
আখরোট – কুচোনো, আধ কাপ
কিশমিশ, ছোট – কুচোনো, আধ কাপ
কিশমিশ, বড় – কুচোনো, আধ কাপ
খেজুর – কুচোনো, আধ কাপ
আনজির(f i g) – কুচোনো, আধ কাপ
শুকনো ব্লু বেরি – কুচোনো, আধ কাপ
মিষ্টি রসে জারানো আদা, পাতিলেবুর খোসা ও কমলালেবুর খোসা – দেড় কাপ
ব্রাউন সুগার – এক কাপ

জারানোর জন্য মশলা ও অন্যান্য:
এলাচ গুঁড়ো – ১/৪ চামচ
লবঙ্গ গুঁড়ো – ১/৪ চামচ
দারচিনি গুঁড়ো – ১/৪ চামচ
জায়ফল – ১/৪ চামচ
কাবাবচিনি - ১/৪ চামচ
শুকনো আদর গুঁড়ো/ সুঁঠ – ১/৪ চামচ
কমলালেবু বা আঙ্গুরের রস – প্রায় এক লিটার, খেয়াল রাখবে সমস্ত ফল যেনো রসে ডুবে থাকে
ব্র্যান্ডি(না দিলেও চলে) – এক কাপ

কেকের জন্য:
ময়দা – এক কাপ+ এক চামচ
বাটার – ৩/৪ কাপ, ঘরের তাপমাত্রায়
ডার্ক চকোলেট – ৮০ গ্রাম
চিনি – এক কাপ
বেকিং পাউডার – এক চামচ
ভ্যানিলা এসেন্স – এক চামচ
ফাইভ স্টার – কুচোনো, তিনটে
বাটারস্কচ চিপস – এক কাপ

পদ্ধতি:
১। আদাগুলি ছাল ছাড়িয়ে খুব পাতলা করে কেটে নিতে হবে। একইভাবে কমলালেবু আর পাতিলেবুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে তা থেকে সাদা অংশটুকু চেঁছে বাদ দিতে হবে। এবারে খোসাগুলো লম্বা এবং সরু করে কেটে নিতে হবে। ভালো হয় এই পর্যায়ে বড়রা কেউ সাহায্য করলে।

২। আধ কাপ জল আর আধ কাপ চিনি মিশিয়ে আগুনে গরম করতে দাও। খানিক বাদে রং পাল্টে সোনালী হয়ে গেলে ওতে লেবুর খোসাগুলি দিয়ে সেদ্ধ করতে দাও। জলটা যেন টগবগ করে না ফোটে। খানিক বাদে দেখবে খোসাগুলো কেমন স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। বুঝবে তৈরি হয়ে গেছে। সাবধানে খোসাগুলি রস ঝরিয়ে ছেঁকে তুলে নাও। এবারে আদা দিয়ে দাও ওই রসেই। একইভাবে আদা সেদ্ধ হলে দেখবে স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তখন রস ঝরিয়ে তুলে নাও। এগুলি কাগজের উপর রেখে শুকিয়ে নিয়ে কোনো মুখ ঢাকা পাত্রে করে ফ্রিজে বরফ জমানোর জায়গায় রেখে দাও। একসাথে অনেকটা করে করলে সারা বছরের

মতো করে রাখা যায়। যে চিনির রসটা রয়ে গেলো ওটা ফেলো না। দেখবে ক্যারামেল তৈরির সময় কাজে লাগবে।

৩। ক্রিসমাসের কম করে দুমাস আগে ফল, বাদাম এগুলো জারিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে ভালো হয়। যত বেশিদিন জারানো হবে কেকের গন্ধ আর স্বাদ ততই ভালো হবে। মাঝে মাঝে

শিশিটা একবার ঝাঁকিয়ে নেবে বা একটু ফলের রস দিয়ে মিশিয়ে নেবে শুধু। যদি একান্তই না পারো তাহলে কেক বানানোর আগের দিন বানিয়ে রেখো। একটা বাটিতে সব ফল, বাদাম, লেবুর খোসা, মশলা, ফলের রস আর ব্র্যান্ডি মিশিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নাও অনেকক্ষণ ধরে। এবারে এই মিশ্রণটা একটা শিশিতে ভরে ফ্রিজে রেখে দাও।

৪। এইবার ক্যারামেল তৈরি করো। একটা ভারী পাত্রে চিনি আর জল মিশিয়ে আঁচে বসিয়ে দাও। যখন ঘন সোনালী বাদামি রং হয়ে যাবে তখন আঁচ বন্ধ করে দিয়ে বড়দের কাউকে বোলো ওতে এক কাপ জল ঢেলে দিতে। একটু দূরে সাবধানে দাড়াও কেননা জল ঢালার সময় কিন্তু গরম চিনির রস ছিটকে উঠবে। ঠান্ডা জল দিলেই দেখবে চিনি শক্ত হয়ে গেছে। ওটাকে আবার আঁচে বসিয়ে চিনিটা গলিয়ে নাও। ক্যারামেল তৈরি। ক্যারামেল যত সুন্দর বাদামি হবে, কেকের রংও ততো সুন্দর হবে। জারানোর সময় যে চিনির রসটা বেঁচে গেছিলো সেটা এই ক্যারামেলের সাথে মিশিয়ে দিতে পারো। বেশ সুন্দর গন্ধ হবে।

৫। এবারে বাটার আর চকোলেট একটা বাটিতে নিয়ে মাইক্রোওয়েভে গলিয়ে নাও।

৬। ফাইভ স্টার কুচিয়ে নাও।

৭। রস থেকে ফল আর বাদামের কুচি ছেঁকে তুলে নাও। ওতে এক চামচ ময়দা মাখিয়ে নাও যাতে কেক তৈরির সময় ফলের কুঁচিগুলো কেকের নিচে থিতিয়ে না যায়।

৮। একটা বড় বাটিতে কেকের সব উপকরণ আর জারানো ফল আর বাদাম কুচি মিশিয়ে নাও ভালো করে। ওতে চকোলেট আর বাটারের মিশ্রণটাও মেশাও।

৯। এবারে একটা কেক প্যান এ ভালো করে তেল মাখিয়ে বাটার পেপার বা বেকিং পেপার কেটে মুড়ে দাও। কেকের মিশ্রণটা ঢেলে দাও ওতে। উপর থেকে ফাইভ স্টার আর বাটারস্কচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দাও। ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অন্তত ৫০ মিনিট লাগবে কেক বেক হতে। বের করে ঠান্ডা করতে দাও। ঠান্ডা হলেই

দেখবে কেক আগের থেকে খানিক শক্ত হয়ে গেছে। এতে মাঝে মাঝে একটু ফলের রস বা জারানোর রসটা এক চামচ করে দিলে কেক অনেকদিন নরম থাকবে আর ভালো থাকবে।
কেক তৈরি, ক্রিসমাস তো এসে পড়লো প্রায়। রাতে শোয়ার আগে সান্তা খুড়োর জন্য এক গ্লাস দুধ আর কেক রাখতে ভুলো না কিন্তু। সেই নর্থ পোল হাঁপাতে হাঁপাতে গিফট নিয়ে আসছে সে তোমাদের জন্য, কেক দেখলে হয়তো দু- চারটে গিফট বেড়েও যেতে পারে, তাই নয় কি?

ছবিঃ লেখক

কিষাণী লীলাবাঈ কথা

উমা ভট্টাচার্য

মহাভারতে আছে বিদর্ভ দেশের কথা, পরে সে অঞ্চলের নাম হয় বেরার। এখন মহারাষ্ট্রের পুর্বাঞ্চলের নাগপুর ও অমরাবতী ডিভিশন নিয়ে গঠিত এই অঞ্চল এখন বিদর্ভ নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্রের মোট আয়তনের ৩১. ৬% অংশ নিয়ে এই বিদর্ভ, আর রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২১. ৩% মানুষের বাস এখানে। বিদর্ভের প্রধান শহরগুলির মধ্যে নাগপুর আর অমরাবতীর পরেই তৃতীয় স্থানে আছে শহর যবতমল । এই যবতমল শহর আবার যবতমল জেলাতে অবস্থিত। এখানকার বিখ্যাত তুলো বিপণন কেন্দ্র পান্ডেরকোন্ডা শহরের কাছেই

আছে পিমপ্রি গ্রাম। এই গ্রামেরই সফল এক কিষাণী লীলাবাঈ । এবারের দেশ ও মানুষের পর্বে থাকবে তাঁর কৃতিত্বের কথা।

বিদর্ভ সাংস্কৃতিক আর ঐতিহাসিক দিক থেকে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চল থেকে একেবারে আলাদা। 'কৃষ্ণ কাপাস মৃত্তিকা' –যাকে বলে 'ব্ল্যাক কটন সয়েল', তাতে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল তুলো চাষের জন্য উপযোগী ও বিখ্যাত। এছাড়া কমলালেবুর উৎপাদনও বেশি। মহারাষ্ট্রের খনিজ সম্পদের ভান্ডারের ২/৩ ভাগ,আর বনজ সম্পদের ৩ ভাগই পাওয়া যায় এই অঞ্চল থেকে। এছাড়া এখানের বিস্তৃত বনাঞ্চলে আছে প্রায় সবগুলি ব্যাঘ্রপ্রকল্প, আছে বোরী অভয়ারণ্য, আছে আরো দুটি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। যবতমলের চারদিকই নদী দিয়ে ঘেরা। বিদ্যুতশক্তির উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। এককথায় অতি সমৃদ্ধ এক অঞ্চল। কিন্তু এত সম্পদে সম্পন্ন এই অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এখানকার মানুষেরেয়া খুব গরিব।

দারিদ্র্য আর অপুষ্টির সঙ্গে যোগ হয়েছে এই অঞ্চলের আরেক বিপদ- কৃষকদের আত্মহত্যা। গত এক দশকে মহারাষ্ট্রের যে ২,০০,০০০ বেশি কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন দেনার দায়ে, আর উৎপন্ন ফসলের সঠিক বাজারদর না পাওয়ায় তাঁদের ৭০ ভাগই হচ্ছেন বিদর্ভের ১১টি জেলার অভাবী কৃষক।

এইরকম পরিস্থিতিতে নিজের কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়িয়ে, যথেষ্ট রোজগার করে আশার আলো দেখিয়েছেন লীলাবাঈ নামে যবতমলের এক গ্রাম্য চাষির বউ। যখন এই অঞ্চলটির চাষিরা এত দুর্দশায় সেই সময়ও চাষের কাজে সফল লীলাবাঈ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে নিজের চেষ্টা, বুদ্ধিমত্তা আর ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে, নিজের কাজ নিজে করলে কীভাবে প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের অনুকূলে আনা যায়,ভালোভাবে বেঁচে থাকা যায়।

স্বামী আশান্না একটি পেট্রল পাম্পে ৭০টাকা মাস মাইনের চাকরি করেছেন সারা জীবন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন গরীব চাষির পরিবারের ছেলেমেয়ে। বিয়ে হয়েছিলো ১৯৬৫ সালে। বিয়ে হওয়ার সময় তাঁদের কোন জমিই ছিলনা, টাকাপয়সাও ছিলোনা।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী লীলাকে বিয়ের আগেই স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। বিয়ের পর আশান্না পেট্রল পাম্পের কাজে। অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে উদয়াস্ত অক্লান্ত খাটতে শুরু করলেন লীলাবাঈ।

মাঠে খাটতে খাটতেই লীলা চিনতে শিখলেন জমির চরিত্র, কোন ফসল এর সময় কোনটা, জমিতে কখন ও কী রকম সার দেওয়া দরকার, কোন ফসল বেশি লাভজনক, চাষের খরচ কীভাবে কম করা যায়, কোন জায়গায় জমি কেনা লাভজনক। আর শিখলেন কষ্ট করে উৎপাদিত ফসল কীভাবে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়, উচ্চ বাজার দরে সেই ফসল বিক্রি করে লাভজনক দর পাওয়া যায়।

প্রতিদিনের আয় থেকে খরচ কম করে কিছু কিছু টাকা জমাতে লাগলেন। আর চার বছরের মধ্যেই, ১৯৬৯ সালে সে টাকায় প্রথমে কিনে ফেললেন তুলো উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট কৃষ্ণকাপাস মৃত্তিকা সমৃদ্ধ ৪ একর জমি, প্রতি একর ১০০০টাকা দরে।

এরপর লাভের টাকা থেকে ১৯৭১ সালে আবার ৯০০০টাকায় কিনলেন পছন্দসই ২০ একর জমি। একটি সম্পন্ন ফার্ম তৈরি করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে দুবারে কিনলেন ১৫ একর জমি আর ৪ একর জমি যথাক্রমে ২৫০০০ টাকা আর ৩৫০০০ টাকায়। তাঁর জমির কাছ দিয়ে জাতীয় সড়ক তৈরি হয়ে গেছে ততদিনে আর কাছেই তুলা বেচাকেনার লাভজনক কেন্দ্র 'পাণ্ডেরকোণ্ডা'শহর।তাঁর লাভ বাড়তে লাগল দ্রুত । ১৯৯১ সালে আবার কিনলেন ৭০,০০০

টাকায় ১০ একর জমি। পরে অবশ্য এই জমির খানিকটা বেশি দামে বিক্রি করে সেই টাকায় পিমপ্রি গ্রামেই একটি সুন্দর বাড়ি করেছেন, আর একটি বিরাট কৃষিফার্ম গড়ে তুলেছেন ।

এখন ৪০ একর জমিতে চাষ আবাদ করেন । দিনের বেশির ভাগ সময়ই লীলাবাঈয়ের কাটে জমির কাজে ,তিনি নিজেই মাঠে নেমে কাজ ও তদারকি করেন । ফার্মের কাজ ও পরিকল্পনা সবই তিনি নিজে ঠিক করেন।

সব কাজেই আলোচনা করেন স্বামীর সঙ্গে। তবে বাস্তবায়নের সবটাই লীলাবাঈয়ের হিসাব মত হয় আর সার্থক হয়। তাই আশান্না বলেন,কখন যে তাঁর স্ত্রী কীভাবে যে এতসব করে ফেললেন তা ভাবলেই অবাক লাগে, আর পুরো কৃতিত্বটাই তিনি দেন লীলাবাঈকে। তিনি শুধু চাষের কাজে লাগে,আর বাড়ির দুধের প্রয়োজন মেটায় যে গৃহপালিত প্রাণীগুলি,সেগুলির যত্ন করেন সারাদিন। এভাবেই তিনি সহযোগিতা করেন স্ত্রীকে।

নিজেদের সারা বছরের প্রয়োজনের খাদ্যশস্যের (ধান) সবটাই ১ একর জমি থেকে পাওয়া যায়,আর দেশীয় ফসল জোয়ারের চাষ করেন করেন ১০ একর জমিতে। বাকি জমিকে সমান ভাগে ভাগ করে চাষ করেন কার্পাস তুলা আর সয়াবিন ,যে দুটি এই অঞ্চলের সবচেয়ে অর্থকরী ফসল। তাঁর লক্ষ্য প্রতি বছর একর প্রতি ১০ কুইণ্টাল সয়াবিন আর ১০ কুইন্টাল তুলা উৎপাদন করা ,যে লক্ষ্য তিনি প্রতি বছরই পূরণ করে চলেছেন।

অভিজ্ঞ লীলাবাঈ ও আশান্না জানেন যে যথেষ্ট পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসল ঠিকমত সংরক্ষণের প্রয়োজন। বেশির ভাগ চাষিই ঋণের দায় মেটাতে উৎপন্ন সবটা ফসলই চলতি বাজার দরে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। প্রায় বছরই ফসল ঘরে ওঠার সময় লাভজনক বিক্রয়মূল্য পায়না। ফলে অভাব, অপুষ্টি আর দেনার দায় হাত ধরাধরি করে অবস্থান করে বিদর্ভের চাষিদের জীবনে। লীলাবাঈ এসব বাধাগুলিই দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন আপন অভিজ্ঞতা থেকে।

বাসগৃহ তৈরি করার সঙ্গে তিনি বাড়িতেই তিনি তৈরি করেছেন অনেকগুলি বড় বড় গোলা বা শস্যাগার। আর তাই কোনো প্রাকৃতিক কারণে তাঁদের উৎপন্ন ফসল নষ্ট হয়না। আবার উৎপন্ন ফসলের যথোপযুক্ত লাভজনক দাম পাওয়ার জন্য ফসলকে সঞ্চয় করে রাখতে পারেন দীর্ঘদিন আর তার মানও খুব ভালো থাকে। ভালো বিক্রয়মূল্য পাওয়াতে তাঁর লাভও হয় প্রচুর, ফলে পরের বছরের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে পারেন। প্রতিকূল আবহাওয়াতেও তাঁর ক্ষেতে ঠিকমত ফসল ফলে। এইসব কারণেই ২০১২ সালে যেখানে ওই অঞ্চলের চাষিরা নিজেদের ফসল ৩৮০০ টাকা কুইন্টাল দরে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানে লীলাবাঈ তাঁর ফসল খুব ভালো অবস্থায় জমিয়ে রেখে ফেব্রুয়ারি মাসে অনেক বেশি দরে- ৪২০০টাকা কুইণ্টাল দরে বিক্রি করে লাভবান হয়েছেন। তাঁর বাড়িতে আছে ৬টি বলদ,৩টি মোষ আর ৫টি দুধেল গরু । তাঁরা বাজারের জিনিস খান না, ক্ষেতের জিনিস তাঁরা খান ,ঘরের দুধ খান। আজ পর্যন্ত তাঁদের কখনও কোনও ডাক্তার দেখাতে হয়নি, কখনও অসুখ করেনি তাঁদের।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও লীলাবাঈ বিদর্ভের মাটিতেই ফলিয়েছেন সোনার ফসল,পরিবর্তন করেছেন নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার। তুলা গাছে ক্ষতিকারী পতঙ্গের আর রোগপোকার আক্রমন হয় খুব , তাই লীলাবাঈ এখন ব্যবহার করেন রোগপ্রতিরোধী তুলাবীজ। এছাড়া তুলাচাষের পর আবার চাষ করেন সয়াবিন ও অন্য ফসলের যাতে রোগ সৃষ্টিকারী পতঙ্গের আক্রমন কিছুটা হলেও কমানো যায়। দামী সার নাইট্রোজেনের প্রয়োজন মেটাতে পারে মটর, বিন, চিনেবাদাম প্রভৃতি জমিতে নাইট্রোজেনের জোগান বৃদ্ধিকারী ফসল।তাই তুলো ওঠার পরই করেন এইসবের চাষ। এমনি করেই বিদর্ভে চাষীদের

নতুন পথের দিশা দেখাচ্ছেন যিনি তিনি আসলে কিন্তু একজন সাধারণ গৃহবধূমাত্র। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তিনি একজন ভীষণ শক্তিশালী মানুষ। জয়ঢাক তাঁকে সেলাম জানায়। লীলাবাঈ আমাদের ভারতীয় হিসেবে গর্বিত করেছেন।

তথ্যঋণ—

- দি হিন্দু পত্রিকা।
- মহারাষ্ট্রের চাষবাসের বিষয়ে বিভিন্ন লেখা।
- ইন্টারনেট।

সিনেমা হল

রাক্ষসদের রাজ্যে

মহাশ্বেতা

চিহিরোর মন একেবারে ভাল ছিল না সেদিন। বাড়ি বদলাচ্ছিল ওরা। মালপত্র আগেই চলে গেছে, এবার খালি গাড়ি করে নিজেরা নতুন বাড়িতে যাচ্ছিল। সামনের সিটে বাবা মা

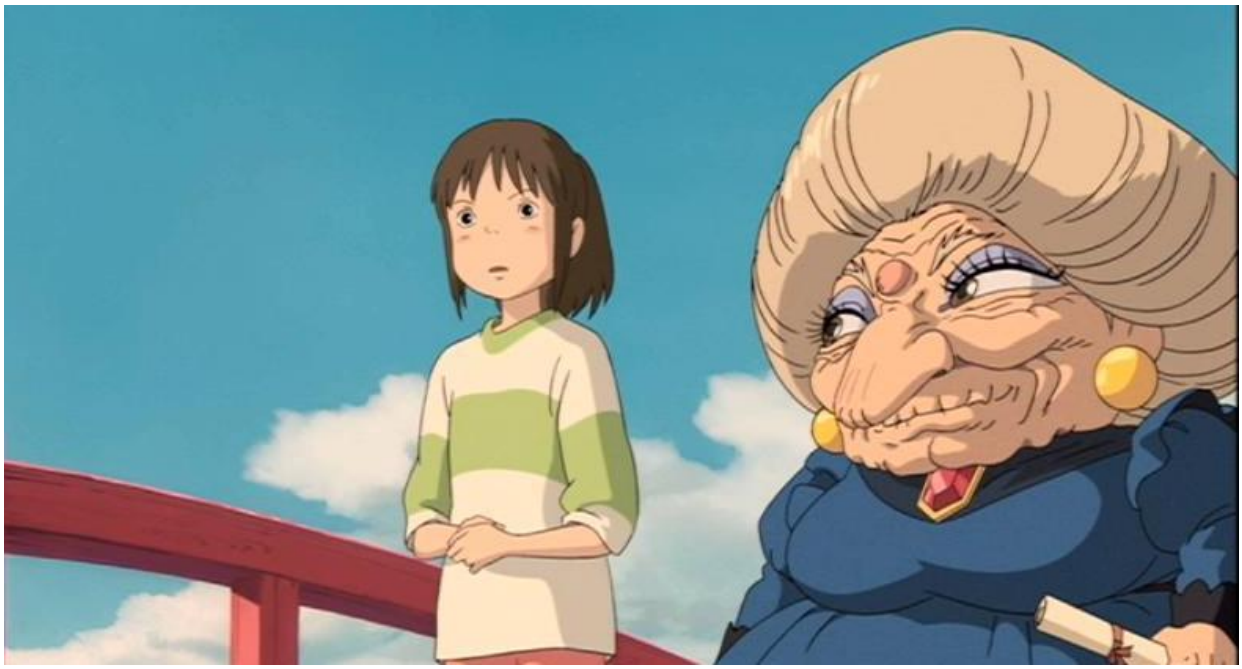

নিজেদের মত , আর পেছনে চিহিরো শুয়ে শুয়ে পুরোনো স্কুল আর বন্ধুদের কথা ভেবে চলেছে। কিন্তু গোল বাধল যখন বাবা লম্বা রাস্তা ধরে যাওয়ার বদলে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের ভেতর সরু রাস্তায় গাড়ি নিয়ে উঠে গেল। আশপাশে তাকিয়েই চিহিরো বুঝল গতিক সুবিধের নয়। ঝোপেঝাড়ে অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তি, গাছের তলায় ছোট ছোট পুতুলের বাড়ির মত বাড়ি । মা বলল ওগুলো আত্মাদের উৎসর্গ করা হয়েছে। তারপর একসময় গাড়ি গিয়ে থামল একটা সুড়ঙ্গের সামনে। চারপাশে ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে একটা সন্দেহজনক সুরঙ্গ, আর আশ্চর্য সব মূর্তি – এরকম একটা জায়গা থেকে মানে মানে কেটে পড়াটাই ভাল, চিহিরোও সেটাই চাইছিল, কিন্তু মা বাবা সুড়ঙ্গতে ঢুকবেই। চিহিরো বাইরে থেকে যেতে চাইছিল, কিন্তু একা থাকতে তার সাহসে কুলোচ্ছিল না। লম্বা, অন্ধকার সুড়ঙ্গ, তার ওইপাশে একটা ফাঁকা ওয়েটিং রুমের মত ঘর, পাশ থেকে ট্রেন যাওয়ার শব্দ, তার দরজার বাইরে নীল আকাশ আর ঘাসে ঢাকা প্রান্তর, একটা টলটলে ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। মা বাবা তো খুব খুশি, কিন্তু চিহিরোর মনে তখনও একটা খুঁতখুতানি রয়ে গেল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দূরে ঘরবাড়ি দেখা গেল। কাছে গিয়ে দেখল একটাই উঁচুনিচু রাস্তা, তার দু পাশে সারসার খাবার দোকান। দোকানে কোন লোক নেই অবশ্য, খালি বড় বড় পাত্রে স্তূপাকৃতি গরম- গরম সুস্বাদু খাবার। বাবা মা দেখেই বসে গেল। চিহিরো খেতে ভালবাসে না, তাছাড়া এরকম জনহীন একটা জায়গায় রহস্যময় খাবার খাওয়ারও তার কোন ইচ্ছে নেই, তাই

সে ঘুরতে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সূর্যাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ যেন জেগে উঠল সব কিছু, চারিদিকে ছায়া ছায়া অশরীরিরা চলাফেরা করতে লাগল। চিহিরো তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কোন রকম মা বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে যখন সেই দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালো তখন দেখে ওমা! মা বাবা কোথায়? তার বদলে দুটো মোটা মোটা শুয়োর তাদের জামাকাপড় পরে গদ গদ করে খেয়ে যাচ্ছে! কোত্থেকে একটা ভূতুরে অশরীরি আবার তাদেরকে লাঠি দিয়ে মেরে মেরে নিয়ে গেল। এরপর শুরু হল তার অ্যাডভেঞ্চার। জাদু- জানা রহস্যময় ছেলে হাকু, রাক্ষসদের স্নানাগার আর তার ডাইনীবুড়ি মালকিন য়ুবাবা, তার রাক্ষুসে বাচ্চা, স্নানাগারের বিভিন্ন অদ্ভূত অদ্ভূত কর্মচারী, আর বিষণ্ন 'নো ফেস' রাক্ষস, যে খালি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে – তাদের মধ্যে চিহিরো কি টিঁকে থাকতে পারবে? বাঁচাতে পারবে তার মা বাবাকে? জানতে হলে দেখে ফেল 'স্পিরটেড অ্যাওয়ে'।

হায়াও মিয়াজাকির পরিচালনায়, বিশ্ববিখ্যাত ছবিটা ২০০১ সালে সেরা কার্টুন সিনেমার অস্কার পেয়েছিল। দুর্দান্ত অ্যানিমেশন। আর গল্পটা কিছুটা জটিল হলেও বাচ্চা- বুড়ো- বড়ো – সবার মন জয় করে নেয়। এবার শীতে এই ছবিটার কথা বললাম তোমাদের। দেখে জয়ঢাককে জানিয়ো যেন কেমন লাগল।

<u>তথ্য</u>

সিনেমা- স্পিরিটেড আওয়ে (সেন তো চিহিরো নো কামিকাকুশি)
ভাষা – জাপানি (ইংরিজি সাবটাইটেল পাওয়া যায়)
পরিচালনা- হায়াও মিয়াজাকি
প্রযোজনা – স্টুডিও ঝিবলি
সাল- ২০০১
রেটিং- পি জি (বাবা মায়ের সঙ্গে দেখতে হবে)